الله . محمد

সুফীদের সিদ্ধিলাভের চরম স্তরে পবিত্র দুটি নাম—আল্লাহ্ ও মোহাম্মদ। শিল্পীর চিত্রাঙ্কণে তা সুশোভিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

BHARATER SUFI (Vol—1)

By

MUBARAK KARIM JAWHAR

Rs. 20·00

ভারতের সূফী

প্রথম খণ্ড

মোবারক করীম জওহর

করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭১

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ টেমার লেন, কলকাতা ৯

মুদ্রক

শ্রীঅবনীমোহন রায়

তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১২ বিনোদ সাহা লেন

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ

খালেদ চৌধুরী

মূল্য কুড়ি টাকা

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ সূফী খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী

ও

বাংলার গৌরব সূফী ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকে—

প্রকাশকের নিবেদন

ভারতবর্ষের মুসলমান সূফীদের জীবনী সাধনা ও কর্মধারার উপর গ্রন্থখানি রচিত। বহু মুসলমান সাধক আমাদের দেশের পটভূমিতে সাধনা করে সিদ্ধিতে পৌছেছিলেন এবং তাবৎ ভক্ত শিষ্যবৃন্দকে অমেয় উত্তরণে পৌছবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বহুজন ছিলেন বহিরাগত। তাঁরা এদেশকে ভালবেসে, এখানের জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁদেরই জীবন বৃত্তান্ত কর্মকাণ্ড প্রভৃতি নিয়ে ভারতের সূফী (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হল।

মুসলমান সাধু সন্তদের জীবনী বাংলা ভাষায় নেই বললেই চলে। অথচ বহু ধর্মপিপাসু পাঠক পাঠিকা তাঁদের জীবনী, কর্মধারা জানতে আগ্রহী। আমরা সেইসব পাঠকের কথা স্মরণ করেই এ-গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। আশা করি সকল শ্রেণীর ধর্মানুরাগীদের কাছে গ্রন্থখানি আদরণীয় হবে। নমস্কার—

প্রকাশক

সূচীপত্র

হজরত মহম্মদ-এর মাজার শরিফের প্রবেশদ্বার।

শাহ আবদুল লতিফ

বড় অদ্ভুতভাবে তাঁর জীবনের শুরু। কই এমন তো আর পাঁচজন শিশুর ভেতর দেখা যায় না। অবাক শিক্ষক, অবাক শিশুর পিতা। শিক্ষক কিছুটা রুষ্টও। তাঁর কথা না শোনা মানেই তো তাঁর অবমাননা। অথচ চার বছরের শিশু পাঠে এগোয় না নির্দেশ মতো। শিক্ষক পড়ালেন আলিফ, শিশু ছাত্র পড়ল আলিফ। কিন্তু তারপর আর না। শিক্ষক বললেন, এবার পড় বে। ছাত্রর মুখে বারংবার সেই আলিফ।

পিতা বোধ হয় বুঝতে পারলেন। এবার তিনি প্রসন্ন। তাই শিক্ষককে বললেন, 'ও ঠিকই পড়ছে। ঐ একটি বর্ণের মধ্যেই তো নিহিত আল্লাহ্‌র মধুনাম। এ ছেলে তার সমস্ত জীবন ও দেহমন আল্লাহ্‌র নামেই সমর্পণ করবে। শিক্ষক চুপ করে গেলেন ছোট্ট ছাত্রের পিতার কথা শুনে।

এভাবে পুস্তকের কারা থেকে শিশু বয়েসেই শাহ লতিফ মুক্তি পেয়ে গেলেন। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুর ভিটাই নগরে লতিফের জন্ম। শিশু বয়সেই পিতার প্রগাঢ় স্নেহ পেয়েছিলেন লতিফ। ছেলেকে সেই উপলব্ধির দিনেই বলেছিলেন, 'তোমার হৃদয়ে চিরকালীন এই আলিফের খেলাই চলুক।' তা থেকেই দিনের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল লতিফের কাছে পুঁথিগত বিদ্যার মিথ্যা অহঙ্কার।

আবদুল লতিফের অধ্যয়ন চলল অন্য বিদ্যালয়ে। খোদাতালার বিরাট বিচিত্র জগতে তিনি নিজেই নিজের পাঠ নিতে লাগলেন স্বাধীনভাবে। অবারিত খোলা প্রান্তরে, নির্জন অরণ্যে, নদীর প্রবাহিত কলতানে। আলিফ অর্থে আল্লাহ্‌র মহিমাময় নামের মধ্যে থেকেই তিনি জীবনের ভাষা শিখলেন। যার পরবর্তী প্রকাশ ঘটল তাঁর লেখাতেই। এক জায়গায় এই অনুভূতি তিনি চিত্রায়িত করেছেন :

দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নির্জন শান্তির
অতল গভীরে করো বাস।

যেদিকে আমি চোখ চেয়ে দেখি—
শুধুই তাকে দেখি আমি।
সব কিছুই তাঁকে ঘোষণা করে।
সবাই হয়েছে এক একজন মনস্থুর
কত জনকে আর ফাঁকি দেব।

পিতার কাছেই পুঁথির বিদ্যা আয়ত্ত করলেন। শিখে ফেললেন আরবী আর ফারসী। তাঁর পিতা ছিলেন সিন্ধুর কুলহোরা রাজবংশের দীক্ষাগুরু মুর্শিদ। তিনি পীর হিসেবেও খ্যাত হয়েছিলেন। এই কুলগুরুর আচার-আচরণ ধারাপ্রবাহেই বড় হয়ে উঠতে লাগলেন আবহুল লতিফ। কিন্তু তাঁর মনের গতি অন্য সুরে ঝঙ্কারিত হয়ে উঠছে। সে যেন বলছে :

নামাজ্ রোজা—হ্যাঁ
নিশ্চয় তারও মূল্য আছে।
কিন্তু অন্য বর্তিকাও যে আছে
তার আলোতে আমি প্রিয়তমকে দেখি—
সে আলো, প্রেমের আলো।

এইভাবে দেখা ও অন্তর্সের মধুস্রাবীতে তাঁর সূফী জীবনের সূত্রপাত। এ এক অন্য দেখা, অনন্য দেখা।

'বাবা আপনার বয়স কত?' শুভ্রকেশ সূফীকে তাঁর এক শিষ্য হঠাৎ প্রশ্ন করেন।

সূফী নিরুত্তর। চুপচাপ থাকেন। যেন শুনতে পাননি। পাশ থেকেই অন্য একজন বললে, 'তা সত্তর হবে'।

এ কথায়ও তাঁর মুখে বাণী নেই। শিষ্য জানবার জন্য ব্যাকুল। তাই পুনবায় বললে, 'তাহলে আপনার উত্তর পাব না?'

এবার সূফীর ধ্যান ভাঙে। অদ্ভুত এক গলায় উত্তর দেন, 'আমার বয়স মাত্র ন'মাস।'

চমকে ওঠে সকলে। শিষ্য সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'কি যা তা বলছেন, এ তো ডাহা মিথ্যে!'

সূফীর বিকার নেই। পরিবর্তন নেই মানসিকতার। ধীরে ধীরে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বললেন, 'যা বলছি তাই ঠিক। যেদিন থেকে আমি আমার প্রিয়তমের মুখের জ্যোতি দেখেছি। সেদিন থেকেই তো বয়স গণনা করছি। সেই থেকে আমার সাধক জীবনের যাত্রা শুরু। আজকের এই আকাশ সেদিনের মতোই ঘন নীল, সবুজ তৃণতরু, তেমন নিস্তব্ধ রুক্ষ প্রান্তর—সমস্ত বর্ণ সমারোহ আর নিস্তব্ধতা সেই প্রিয়তমের মহিমাকে প্রকাশ করে চলেছে। তারপর তো মাত্র কদিন আমার চেতনায় বিকশিত হয়েছে মুগ্ধতা, যার নাম জীবন। তাই নিয়েই তো বয়স।'

উত্তর শুনে সব কজন মানুষই অবাক। এ যে এক নতুন আবির্ভাব। সূফী আবদুল লতিফের আবির্ভাব এমনই। প্রেম নিবেদন ও উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে তাঁর মহৎ আত্মপ্রকাশ।

সেদিনের সেই দৃশ্য যেন প্রাণ পেয়ে আমার চোখে আলো ফেলে। ইতিহাসের সেই ঘটনা। কালজোরা রাজকন্যা অসুস্থ। তাঁর রোগমুক্তির জন্য তরুণ এক পীর এলেন। আগুনের মতো রূপ রাজকন্যার। পীর রোগ নিরাময়ের পথ বাৎলে নিজেই রোগের হাতে পড়লেন। ঘুম ভাঙল যেন তাঁর। হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য রাজার কাছে যাচ্ঞা করলেন রাজকন্যাকে।

তাঁর প্রার্থনাকে না-মঞ্জুর করলেন রাজা। সেই থেকেই লতিফের অন্তর উপলব্ধির শুরু। মর্ত্যপ্রেম থেকে অমর্ত্যপ্রেমের প্রতি আকর্ষণ। এক দুঃখের দহন জ্বালাকে অতিক্রম করবার জন্য আনন্দলোকে পথ পরিক্রমণ। পথে বেরিয়ে পড়লেন লতিফ। পরিব্রাজক হলেন। দেশী-বিদেশী সাধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন। চলতে চলতেই তাঁর কান্নারা বাণী পায়। তিনি গেয়ে উঠলেন :

কোথায় তুমি পরম বিস্ময়কর
সুন্দরতম প্রিয় ?'

আত্মানুসন্ধান চলল। স্বপ্নে দেখলেন এক পদ্ম ফুটে আছে আর স্থির দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে এক রাজহংস। বিরহ আরো মধুর ও তীব্র হল। জন্ম নিল কবিতা।

পদ্মের মূল গভীরে মগ্ন।
মৌমাছিরা যে আকাশের চারণ—
ধন্য সেই প্রেম, যা তাদের যুক্ত করে।
সুদূর হিংলাজের তীর্থে আর গিরনারের সানিভূমিতে—
অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয়তমকে
তাকে আজ আমি প্রত্যক্ষ করলাম।

গভীর বেদনাকে সংহত করে তিনি সেই পরমকে উপলব্ধি করতে পারলেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলে গেল। জন্ম নিল মানুষের জন্য শান্তি ও মমতাবোধের। যে জন সর্বাধিক দুঃখকে ধৈর্য দিয়ে জয় করেন তিনিই সবচেয়ে মহৎ। আবদুল লতিফ সেই মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হলেন। সৃষ্টি করলেন তাঁর অমর সৃষ্টি 'রিসালো'। শাহ্ আবদুল লতিফের জীবনবোধ সিন্ধুর গভীরতা নিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করল। তাঁর সাধনা কাব্য-সাহিত্যে এক অতীন্দ্রিয় জগৎকে তুলে ধরল সাধারণ মানুষের সামনে।

ভিটশায় মাজার শরীফে সেই সাধকের সাধনাস্থল দেখতে চলেছি। এও এক পরম সৌভাগ্য। দূর দূরান্ত থেকে এক সময় পায়ে হেঁটে তীর্থযাত্রীদের এখানে যেতে হত। আজ অবশ্য আধুনিক যানেই যাওয়া যায়। আজমীর থেকে প্রায় সাতাশ মাইল পায়ে হেঁটে আগে ভিটশায় আসতে হত। বহুদিন আগের কথা। মরুভূমির শুকনো পথ, দীর্ঘ কাঁটা বন। দস্যু তস্করের ভয় উপেক্ষা করে আবদুল লতিফ এখানে পৌঁছেছিলেন একদিন সুপ্রভাতে। দরিদ্র সাধারণ গ্রামবাসীরা তাঁকে হৃদয়ের আতিথ্য দিয়েছিল অযাচিতে। এই আতিথ্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ। একদিন সারারাত অভুক্ত থেকে সকালে যখন তিনি আবার পথে বেরিয়ে পড়েছেন, তখন গ্রামবাসীদের একজন তাঁকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। হঠাৎ একজনের ঘরে এক হাঁড়ি খেজুর পাওয়া যায়। সেই খেজুর তাঁকে পরম তৃপ্তির সঙ্গে গ্রামবাসীরা পরিবেশন করেন।

ভিটশায় শাহ্ আবদুল লতিফ বেদনাভরা বিরহক্ষুব্ধ চিত্তের ভাব সঙ্গীত দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে মুগ্ধ করেন। এই সঙ্গীতে ছিল নিবেদন

আর দর্শনের উপলব্ধি। সেই গানের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত ঔদার্য প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার বাউল সঙ্গীতের সঙ্গেও তুলনীয় সেই অপূর্ব গান।

আমি চলেছি সেই সাধককে হৃদয়ে লাভ করতে। তাঁর সাধনাকে ছুঁয়ে তাঁকে অন্তরে পেতে। যাত্রাপথে সিন্ধুনদের কৃপা ছাড়া বাকি চারদিকই বালুকাময় নিষ্ফল জমি। রুক্ষ ধূসরতা। অসহ্য সূর্যকরে ঝলসানো প্রান্তর। সেই তাপের প্রখরতায় আবদুল লতিফের বিরহ-তাপিত হৃদয় যেন প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। অন্তরীক্ষে তিনি যেন তাঁর কাফিয়ার অংশ গুনগুন করছেন আমার শ্রবণে :

আমি কি তোমার সন্ধানই করব
শুধু সন্ধান ?
কিন্তু তোমার দেখা কি আমি
কোনোদিনও পাব না ?

বিরহের দহনে আশিকের আনন্দ। মিলনে নয়। শান্তিও তাঁর কাম্য নয়। শান্তি মানেই তো মৃত্যু। মৃত্যু মানে জীবনের শেষ। যতক্ষণ বিরহের জ্বলন ততক্ষণই তো জীবন। সাধকের প্রধান সাধনা প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষাকে অন্তহীন করে ধরে রাখা। তিনি একটি পাখির মতো ডানায় ভর করে প্রিয়তমের বাতায়নে অলিন্দে গান করে গেছেন। এতেই তাঁর আনন্দ। পরমপ্রাপ্তি। সাধকের সাধনা যুগে যুগে এভাবেই উচ্চারিত হয়ে চিরায়ত হয়েছে।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি সমাধি সৌধের চূড়া। প্রেমের নিবেদনে যা সকল তীর্থযাত্রীকে দূর থেকে কাছে টেনে নেয়। সামনেই কাড়ার হ্রদ। নির্মল হ্রদের জল চতুর্দিকে বিস্তৃত রুক্ষতার মধ্যে এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। নেমে পড়লাম বাস থেকে। আল্লাহ্র করুণাকে যেন হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত হতে দেখলাম। হ্রদের পূর্বতীর বরাবর ক্রমশ পশ্চিমের উঁচু স্থান জুড়ে সিন্ধুর কলাকৃষ্টির মিউজিয়াম। সুন্দর সাজানো আধুনিক গেস্ট হাউস। তারপরই মেলা বসেছে। সমতল-ভূমি অতিক্রম করে পশ্চিমদিকে পথ ছড়ানো। সেই পথের শেষে

সুন্দর সৌধাবলী ও রেওয়ার রম্য উপবন। সমস্ত সিন্ধুর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট ও জীবন্ত করে দেখতে চাইলে এই একটি মাত্র স্থান দর্শন ও পরিক্রমণ করেই তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাবে।

সঙ্গ ছেড়ে একা হয়ে গেছি। পরম উপলব্ধি নিঃসঙ্গ না হলে করা যায় না। দৃষ্টি মন আর আবেগকে একত্রিত করে কাড়ার হ্রদের দক্ষিণ দিকে ফাঁকা জায়গায় বসে পড়েছি। একনজরে ভিটশা দেখে মনের মধ্যে সপ্ত ও অষ্টাদশ শতক মূর্ত হয়ে উঠেছে। কাকচক্ষু জলে অতীতের প্রতিফলন।

কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি, হয়তো যেখানে আমি বসে আছি তারই পাশে কোনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে শাহ আবদুল লতিফ তাঁর সমস্ত পুঁথিপত্র এই জলে বিসর্জন দিয়েছেন। গোপনে এ কাজ তিনি করেছিলেন কোনো একদিন। তাঁর মনে হয়েছিল পাণ্ডিত্যের আত্মাভিমান, লেখকরূপে আত্মপ্রকাশের আনন্দগর্ব আশিকের ব্যাকুলতা প্রকাশের ও পরবর্তী শুদ্ধ জীবনের যাত্রাপথের বাধাস্বরূপ। তাই নিজেকে ভারমুক্ত করেছিলেন আত্মাকে আকাশে বাতাসে আরো ছড়িয়ে দেবার জন্য। প্রকৃত সাধক নিজেকে সমস্ত কিছু থেকে নির্মোহ করে—তিনিও তাই চেয়েছিলেন। পরে বহু কষ্টে নানা ভাবে তাঁর রচনাসমূহকে উদ্ধার করা হয়। লোকালয় থেকে বহুদূরে এই নির্জন ভিটশাকেই তিনি আপনার সাধনস্থানরূপে নির্বাচন করেন। লোকচক্ষুর আড়ালেই নির্বাসিত হতে চেয়েছিলেন এই সাধক—কিন্তু ছাই দিয়ে যেমন আগুন চাপা যায় না, তেমনি তাঁর প্রতিভার আগুনও চাপা পড়েনি। তা ছড়িয়ে পড়েছিল ধীরে ধীরে চারপাশে। দেখতে দেখতে ভিটশা এক আনন্দময় পবিত্র তীর্থভূমিরূপে পরিচিত হয় তাঁকে কেন্দ্র করে।

আমার সঙ্গী ভূপালী আমাকে খুঁজে বার করলেন। ততক্ষণে সুসজ্জিত এক মঞ্চে শাহ আবদুলের ভাব সঙ্গীত শুরু হয়ে গেছে। সেই সুর যেন প্রাণকে শীতল এক প্রলেপে সম্মোহিত করল। মনে হল এ যেন খুবই পরিচিত। হারিয়ে গেল মরজগতের দুঃখকষ্ট ক্ষুধা-

তৃষ্ণা। বিশুদ্ধ এক আনন্দ আবেগে কোথায় যেন ভেসে চললাম। শব্দের বাধা পেরিয়ে সুরের ভেতর দিয়েই গানের আবেদন ও অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

নবীজীর দরজা ছাড়া অন্য কারো দ্বারে যেওনা তুমি।
যে সাহায্য চায় সে সমস্ত বোঝা তিনিই যে বহন করেন—
দুঃস্থদের তিনিই যে অবলম্বন।
আমার প্রিয়তমও বিমুখ করেন না।
যারা চায় তাঁর করুণা।
মূক ও নিঃসম্বল, আমরা যে তাঁরই ভিখারী।

কোরান শরীফের আয়তে 'আনতুমুল ফুকারাও ইলাল্লাহ্' আমরা যে তাঁর ভিখারী। সাধকের কাছে আবার তিনিও যে ভিখারী। ভক্ত কবির ভাষায়:

ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই।
ওগো মোর সখি আমি যে বিরহী
কী কাতর গান গাই।

সাধকরা না চাইতেই তাঁদের সমস্ত জীবন নিবেদন করে বসে থাকেন। আর সাধারণ মানুষ চাইলেও কিছু দিতে পারে না পূর্ণ নিবেদিত জীবনের প্রতি আকর্ষণও আমাদের আছে, তাই সাধকদের সান্নিধ্যে আসি। কিন্তু দরগায় যাই শুধু চাহিদা নিয়ে, কিছু দিতে নয়। শাহ্ আবদুল লতিফের সমাধিভূমির কাঠের জাফরি ধরে অশ্রু বইয়ে দিলাম বেশ কিছুটা। মনে মনে উচ্চারণ করলাম, (আমার উচ্চারিত বাণীই যেন সমবেত কণ্ঠে সমাধিমন্দিরের ভেতরে ধ্বনিত হচ্ছিল) আমি কোনো প্রার্থনা নিয়ে আসিনি, তুমি আমার প্রিয়তমের মুখ দেখেছিলে—সেইজন্য আমি তোমার লীলাভূমি দেখতে এসেছি। আমার সঞ্চিত শ্রদ্ধা তুমি গ্রহণ করো। পেছন ফিরে দেখতে পেলাম, সঙ্গী মুহাসিন ভূপালীও আমার মতো কাঁদছেন। এ এক সমবেত আর্তি—ভক্তমনের বহুকালের রুদ্ধ আবেগ স্থান মাহাত্ম্যে বেরিয়ে আসছে।

১৭২০ সাল। শাহ্ আবদুল লতিফ তাঁর সাধনার পথে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। সত্যের আনন্দসত্তা তাঁর দেহমনকে বারংবার অভিভূত করছে—প্রিয়তমের উপলব্ধি নিবিড় হয়ে ঘিরে ধরেছে। তার ভেতর দিয়েই প্রতীক্ষায় দীর্ঘদিন রাত্রিগুলি অতিবাহিত হয়ে চলেছে। বিরাট এক বৃক্ষের কোটরে আশ্রয় নিয়েছেন শাহ্ আবদুল। জনজীবন থেকে নির্জনে প্রিয়তমের নাম জপ করবার জন্য চলে এসেছেন। বাইরের প্রকৃতিতে ঝড়-ঝঞ্ঝা ও অশান্ত বর্ষণ-মনের ভেতরও তারই প্রতিচ্ছবি। আশা নিরাশার দোলা, অনন্ত জীবন জিজ্ঞাসা, সাধন প্রস্তুতি, বিরহের উচ্ছ্বসিত আবেগ, ব্যথাভরা অশ্রুর সঙ্গে হৃদয়ের হাহাকার এইসব নিয়ে দিন কাটছে। হাতে তসবীহ্ নাম—জপনাম স্মীরণ—আলিফ আলিফ, আল্লাহ্ আল্লাহ্। এমন বিরহভরা বর্ষণ মুখর এক দিনে বৃক্ষের পল্লবঘন ছায়ায় দুজন গোয়ালিনী আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বাক্যালাপ ক্রমশ রসালাপে পরিণত হয়েছে। সাধক লতিফ আড়াল থেকে সব শুনছেন।

প্রথমজন বলছে : হ্যাঁ রে, তোর নাগর তোকে কত ভালবাসে রে ?

দ্বিতীয়জন : খুব ভালবাসে। আমার ভাই ওকে দেখলেই কেমন লজ্জা করে।

প্রথমা : আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি না, মুখপুড়ি দিনে ক হাজার বার নাগরের নাম জপ করিস্ বলতো সত্যি করে।

দ্বিতীয়া : বহুবার।

প্রথমা : অনেকবার বুঝলাম, কিন্তু গুনে গুনে ঠিক করে বলতো কতবার। আমি তো আমার নাগরের নাম দিনেরাতে হাজার একবার জপ করি।

দ্বিতীয়া : সেকি! তুই যে অবাক করলি! প্রাণের দোসর যে, রসের নাগর যে তার নাম নেব আঙুল গুনে গুনে ? যতবার খুশি তার নাম স্মরণ করব—অগুনতিবার, পাঁচ আঙুল দিয়ে সে নাম আর কতবার গোনা যায়।

শাহ্ আবদুলের যেন এক সত্য উপলব্ধি হল এই বাক্যালাপে।

শাহ্ লতিফের উপাসনালয়।

তিনি ভাবলেন, তাইতো প্রিয়তমের নাম জপ গুনে গুনে কেন? তার নাম স্মরণ যে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে চলছে। তসবীহ্ ফেলে দিয়ে তখন থেকে লতিফ আল্লাহ্‌র নাম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন। বহুদিন বাদে সাধক চিত্তের উদ্বেগ অশান্তির ঝড় থেমে গেছে, সংযমিত হয়েছে আবেগ উচ্ছ্বাস। হৃদয়ে নেমে এসেছে অপার প্রশান্তি। প্রিয়তম বহুদূরে —তবু তাঁর রাগ অনুরাগে অন্তর রাঙিয়ে উঠছে—জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব লগ্ন আসন্ন; এমন অবস্থায় একদিন শাহ আবদুল লতিফ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসে আছেন, এক শিষ্য এসে হাজির। সে এসেই বলল, বাবা আপনিই এর বিচার করুন—আমাদের গাঁয়ের একটি মেয়ে কুলে কালি দিয়ে এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। কি লজ্জার কথা! এবার আপনার কাছে এর বিচার চাই, বলুন মেয়েটির কি শাস্তি হওয়া উচিত?

শাহ আবদুল লতিফ মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু যেন ভুলে আত্মবিস্মৃতির অতল গভীরে ডুব দিলেন। আত্মমগ্ন সাধকের ভাব নিমগ্নতায় ছেদ পড়ল হঠাৎ। একটু পরেই তিনি যেন জেগে উঠলেন। এবার সকলের দিকে চোখ মেলে বললেন, 'কি আশ্চর্য! মেয়েটির কি অদ্ভুত সাহস! সব কিছু ভুলে, নিশ্চিন্ত আরাম আয়াস ত্যাগ করে সে চলে গেল তার সঙ্গে; ধন্য তার আকুলতা, প্রিয়তমের সান্নিধ্য কামনা! সে ফিরে এলে তাকে আমার আশিস দিও।

শিষ্যটি তো হতবাক। আমতা আমতা করে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, এ কি বলছেন বাবা! একটা মেয়ের নির্লজ্জতায় দুঃসাহসিকতায় আপনি মুগ্ধ হয়েছেন, এ ভারী আশ্চর্য হওয়ার কথা।

ঠিক বলেছ, শাহ লতিফ উত্তর দিলেন, আশ্চর্য হবারই কথা। সাধারণ একটা মেয়ে, যার শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই—সে কিনা এতটা সাহস সঞ্চয় করে প্রেমের দায়ে তার প্রিয়তমের সঙ্গে অন্ধকার পথে এসে দাঁড়াল। অনিশ্চিতকে বরণ করে নিল। আর আমরা পুরুষ হয়েও সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌কে লাভ করার পথে অভিসারে বেরবার মতো শক্তি সাহস সঞ্চয় করতে পারলাম না। কোনটা বেশি আশ্চর্যের কথা বলতে পার!

উপস্থিত ভক্ত ও শিষ্যরা বাকরহিত হয়ে পড়ল। শাহ্ আবদুল লতিফ সূফীতত্ত্বের মর্মকথা উদ্ঘাটন করে তাই বলেছেন :

হৃদয়ে তোমার চলে যেন
আলিফের (আল্লাহ্‌র) খেলা
তবেই জানবে তুমি
কেতাবী জ্ঞানের অসারতা।
পবিত্র দৃষ্টি দিয়ে যদি তুমি
জীবনকে দেখতে শেখ—
তুমি জানবে : আল্লাহ্‌র নামই যথেষ্ট ·
হৃদয়ে যাদের প্রত্যাশা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা
তারা শুধু সেই পৃষ্ঠাই পড়ে
যার বুকে তারা দেখে তাদের প্রিয়তমকে।

সূফীবাদের এর চেয়ে সহজ ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? সূফীদের ভক্ত জীবন নিবেদনের মধ্যে দিয়েই সূফীতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটিত। কথা দিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করতে যাওয়া অর্থহীন। তবু সাধারণের বোঝবার জন্য কিছুটা প্রয়োজন বুঝিয়ে বলার। যাদের হৃদয় সমস্ত জীবন জুড়ে পাথরের মতো নীরস, যারা আল্লাহ্‌র করুণা এখনো পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি, তাদের জন্য সূফীবাদের মূল কথার সুন্দর একটা ইঙ্গিত রয়েছে কোরান শরীফ-এর একটা আয়তে :

ওয়াল্লাহু অনযালা মিনাস সামায়ি মা আন্
ফা আহ্‌ইয়া বিহিল আরদা বাদা মওতিহা।
ইননা ফি যালিকাল আয়াতাল লিকওমিন ইয়াসমাউন।

আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি নামান এবং পৃথিবীকে মৃত্যুর পর সজীব করে তোলেন। অবশ্যই এর ভেতর যারা মন দিয়ে শোনে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। মৃত-তাপিত পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি মধুর প্রাণ সঞ্চারিণী, তেমনি আল্লাহ্ প্রেম সাধকচিত্তের ব্যাকুলতাকে দূর করে শান্তির প্রলেপ স্বরূপ—বর্ষা এখানে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতীক। কবির ভাষায় : জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এস···।

সূফী সাধক প্রেমের জন্য দেহ মনকে শুকনো ও শূন্য করে রাখে। তার চাতকের মতো তখন আল্লাহ্‌র প্রেম বর্ষণের আশায়, তাঁর করুণা স্পর্শের প্রতীক্ষায় কাতর হয়ে রাতের পর রাত কাটায়। সূফীবাদের মূলকথা প্রেম আর মরমী সাধকদের হৃদয়ই তাদের নির্দিষ্ট পথ। এই পথের অগোচরে নিভৃতে প্রিয়তমের সঙ্গে তাদের হয় মিলন, এই প্রেমের আনন্দঘন রূপরস পৃথিবীর সর্বত্র প্রচ্ছন্ন আবার প্রতিফলিত। তাই এই পৃথিবী সাধনপথের প্রতিকূল মোটেই নয় বরং অনুকূল। সৃষ্টিময় এই ধরণী প্রেমস্বরূপের লীলাক্ষেত্র। কোরান শরীফে অন্যত্র তাই বলা হয়েছে :

ইউসাব বিহু লাহু মা ফিস্
সামাওয়াতি ওয়াল আরদ।

সমস্ত পৃথিবী ও নক্ষত্রলোকের যাবতীয় বিষয়বস্তু আল্লাহ্‌র প্রশংসা গান করে।

লাহুল হামহুফিল উলা ওয়াল আখীরা।

আদি ও অন্তে শুধু সেই পরমেশ্বরের প্রশংসা। সেই ধ্বনিত গানের ঐকতানে সূফীর ভক্ত চিত্তের আবেদন ও মর্ম সুর নিবেদিত হয়। এই জন্য সূফী সাধক জীবনকে নীরস তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখেন না। তাঁরা রসপিপাসু মন ও সৌন্দর্যের বিস্ময়ভরা চোখে হুনিয়াকে অনুভব করেন। বৃষ্টির পর বিশ্বসংসার যেমন নতুন করে জেগে ওঠে তেমনি প্রেম সাধকের হৃদয় সত্য জ্ঞানে পূর্ণ হয়ে জীবনের উপলব্ধিকে সহজ ও সার্থক করে। সূফী মুরাদ আলীর কথায় বক্তব্যটি স্পষ্ট, প্রেমের পথেই আমার উপলব্ধি হয়েছে। সহজ প্রেম চোখের পলকে আমার জীবনকে আলোকিত করেছে। প্রেমের পথই সূফীদের পথ।

নীতিবিদ দার্শনিকদের নীরস তত্ত্বজ্ঞান ও দর্শন ব্যাখ্যার জটিলতায় ভরা পথকে তাঁরা সযত্নে এড়িয়ে যান। গভীর নীরবতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে সূফীরা প্রেমের দীক্ষা নেন। আধ্যাত্মিক জীবনে এই নীরবতা একান্ত কাম্য। নীরবতার অতল গভীরে প্রেমের রস নিবিড়তর হতে থাকে। এবং তারই প্রান্তদেশে সূফী শুনতে পান প্রিয়তমের

অতুলনীয় কণ্ঠস্বর ও প্রেমসিক্ত বাণী। সিন্ধী সূফী দরিয়া খানের উক্তি: নীরবতার মধ্যে থেকেই ভেসে আসে সেই স্বর। তাই সূফীদের য প্রিয়তম, তাঁর প্রাসাদ সৌন্দর্যের রাজসুষমায় গড়া। প্রশান্তি তার প্রবেশ কক্ষ, নীরবতা তার প্রবেশ পথ। সূফী সাধু তাই তারায় ভরা আকাশের মতো নীরবতা কামনা করেন।

সূফীবাদের ক্রম-বিবর্তন জানতে হলে বেশ কিছু অতীতে পেছিয়ে যেতে হবে। ১৩৫০ সালে বাগদাদের খলিফার দরবারের এক আমীর হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন আজকের পাক-ভারত অঞ্চলে হিজরত করবার জন্য। আমীরের নাম ওসমান শাহ্। তাঁর এই ব্যাকুলতার কোনো কারণ বোঝা গেল না। তিনি ধনী প্রতিপত্তিশালী সুতরাং দেশত্যাগের এই বাসনা অহেতুক না ঐশাচালিত কে বলবে! খলিফার নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি যাত্রার জন্য তৈরি হলেন। সঙ্গে বন্ধুরা— শেখ বাহাউদ্দীন, ফরীদগঞ্জ ও মখদুম জালালুদ্দীন। সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন পার্থিব আরাম হয় এমন কোনো জিনিস তারা সঙ্গে নেবেন না।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যে জাহাজ ভাসল। আরব সাগরের মাঝামাঝি এসে জাহাজ ডুবতে শুরু করল। ওসমান শাহ্ বিপদ থেকে উদ্ধারলাভের জন্য সকলকে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনার জন্য বললেন। প্রার্থনার সময়ই ওসমান শাহ্ বুঝতে পারলেন, সঙ্গীদের মধ্যে কেউ একজন কোনো পার্থিব জিনিস গোপনে সঙ্গে নিয়েছেন। অনুসন্ধান করতেই সঙ্গীদের একজন স্বীকার করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি স্বর্ণথালা। দুঃসময়ে প্রয়োজনে লাগতে পারে ভেবেই তিনি নিয়েছেন। ওসমান শাহ্ থালাটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সমুদ্রের জলে। জাহাজ পুনরায় ভেসে উঠল। নিরাপদ হল যাত্রা।

যারা সত্যের প্রতি আদিষ্ট তারা আত্মবিলোপ কামনা করেন। মরজগতের শক্তির সঙ্গে তাদের আপস হয় না। এক কথায় সাধক-চিত্তে বিষয়বুদ্ধির স্থান অসম্ভব। অবশেষে চার বন্ধু সিন্ধুদেশে এসে পৌঁছলেন। সেহওয়ান নামক জায়গায় তাঁরা তাঁদের আস্তানা

বানালেন। দেখতে দেখতে তাঁদের রসসিক্ত প্রাণবন্যার ধারা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। গতানুগতিক একঘেয়ে জীবনের মধ্যে তারা প্রেমের প্লাবন আনলেন। সেই প্লাবনের তোড়ে ভেসে গেল অন্ধবিশ্বাস, ও কুসংস্কার। বহুযুগের নিষ্ক্রিয়তা ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ল। প্রেমের আবেগে ও রসসিঞ্চনে শুরু হল নতুন প্রাণচাঞ্চল্য। আল্লাহ্‌র করুণাধারা তৃষিত মানুষদের জীবনে নেমে এল, সিন্ধুর মানবসমাজ শান্ত হল সত্য দৃষ্টির ছোঁয়ায়।

কিছুদিন একসঙ্গে বসবাসের পর বাহাউদ্দীন পাঞ্জাব মুলতানের নিকটবর্তী উশেতে গেলেন—অন্য দু বন্ধুও অন্য দু জায়গায় হিজরত করলেন। এই চার বন্ধুর এই উপমহাদেশে আগমনের কিছুকাল পরে খাজা হাসান নিজামী নামে এক ব্যক্তি বাগদাদ থেকে দিল্লী এসে বসতি স্থাপন করলেন। এদের মাধ্যমে সিন্ধুর তীর ছুঁয়ে সূফী ভাবধারা সমগ্র উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। ইতিহাসে অধ্যাত্ম সাধনার জগতে সিন্ধু এক বিচিত্র সমন্বয়কে ধারণ করল ও সূফীবাদের আশ্রয়স্থল রূপে পরিগণিত হল।

সিন্ধুর সূফীরা প্রচার করেছেন প্রেমের জগৎ বহু পুরনো হলেও প্রেমের বিচিত্র ধারা নতুন নতুন প্রাণরসে সিঞ্চিত ও পুষ্ট হয়ে নতুনভাবে তরুণ সাধকদের আকর্ষণ করে। একই পুরনো মদকে তাঁরা নতুন বোতলে পরিবেশন করেছেন। যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র চিরন্তন প্রেমের কথাই প্রকাশিত হয়েছে। সত্যের অভিসারে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদই শুধু একান্ত নির্জনে একে অন্যের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ লাভ করবে। এর ভেতর তৃতীয় কোনো জনের স্থান নেই। প্রত্যক্ষ সংযোগ ও আকর্ষণের মধ্য দিয়েই হবে অপ্রত্যাশিত মিলন। যারা এই পথের অভিযাত্রী তাঁদের পথচলা চালচলনের ভঙ্গী সাধারণ থেকে পৃথক। শাহ্ আবদুল লতিফ তাই বলেছেন: পৃথিবী যদি ভাঁটায় চলে, তুমি যাবে স্রোতের উজানে। সাচাল বলেন: পাপপুণ্যের পথে আল্লাহ্‌কে কেউ জানে না, অর্থাৎ তাঁকে জানবার পথই আলাদা। বেদিল বলেছেন: পুঁথি পাঠের কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু আত্ম-

বিলোপের গূঢ় তত্ত্ব শেখ। একটি কাহিনী এখানে বললে বিষয়টি সহজ হবে।

বহু শতাব্দী আগে আফগানিস্থানের এক বিখ্যাত সাধক মনীষী একদিন তাঁর শিষ্যদের ডেকে নদীর তীরে নিয়ে গেলেন। সারা জীবন ধরে যে গ্রন্থরাজি তিনি রচনা করেছেন সেগুলি শিষ্যদের সঙ্গে নিতে অনুরোধ করলেন। শিষ্যরা আদেশমতো বিরাট পুঁথির পাহাড় নদীতীরে নিয়ে এল। এবার তিনি স্বহস্তে স্বরচিত সেই গ্রন্থগুলি ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন নদীর জলে। সমস্ত নিক্ষেপের পর তিনি বললেন এবার পাণ্ডিত্যের সব অহঙ্কার ও অভিমান শেষ হল এখন আমি সত্যকে জানতে সক্ষম হব। সিন্ধুর সূফী শ্রেষ্ঠ শাহ্ আবদুল লতিফও একদিন কাড়ার হ্রদের জলে তাঁর মনীষার অবদান বিসর্জন দিয়েছিলেন। সত্য সহজেই ধরা দেয়। কিন্তু সত্যকে ধরতে হলে চারপাশের অসংখ্য আবিলতা ও আচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকতে হবে। সত্য সহজেই প্রাণের মধ্যে উদ্ভাসিত হয় না। কষ্ট করে তাকে অর্জন করতে হয়। আবদুল লতিফ তাই বলেছেন :

প্রিয়তমের পথ দিনের মতো স্বচ্ছ
যদিও তা আবৃত হয়ে আছে অগুনতি কামনা-বাসনায়।

প্রিয়তমের প্রেমের স্বাদ যিনি পেয়েছেন তিনি নির্বাক হয়ে গেছেন। তিনি সেই চিরন্তন সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। সেই অতীন্দ্রিয় জ্যোতির স্পর্শ যিনি পেয়েছেন, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করবার মতো ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। জামি বলেছেন :

বোবা যখন মিষ্টির স্বাদ পায় তখন কি সে কথা বলে তা জানাতে পারে? আল্লাহ্‌র প্রকৃত সত্তা যাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা বিস্ময়ের আনন্দে বোবা হয়ে গেছেন। সেই অনাঘ্রাত প্রেম শুধু উপলব্ধিতেই সম্ভব, মানুষের ভাষায় তার ব্যাখ্যা করা ভাবনার বাইরে। রুমী এক জায়গায় বলেছেন :

প্রেমিক কামনা করে এই প্রেম, অন্য প্রেম আর
অবশেষে দ্বারে আসে একমনে প্রেমের রাজার।

যতই করি না মনে, এ প্রেমের যত বিবরণ
শব্দে তার, কথা তার প্রেমমগ্ন লজ্জিত এমন।
রসনার ব্যাখ্যা দ্বারা স্বচ্ছ মুক্ত বহু ভাব ভাষা,
তার চেয়ে অব্যাখ্যাত এই ভাল। ব্যাখ্যা তার নিছক দুরাশা।

এই দুরাশা কোনো সাধকের নেই। সিন্ধুর সূফীবাদ তাই মর্মধারায় যেন আমাদের অনুভূতিময় প্রাণ আপনা থেকেই প্রেমের নির্ঝর হয়ে বয়ে চলে। এই প্রবাহকে পাবার জন্য আমাদের প্রতীক্ষায় থাকা উচিত। তৈরি করা উচিত দেহমনকে শুদ্ধতায়, পবিত্রতায়। শুচিতা না হলে যে প্রেমের পথ রচিত হয় না। আবদুল লতিফের মতে সিন্ধুর দরিয়া গান, মুরাদ আলী, বেদিল, সাচাল সরমস্ত মরুচারী পথিক প্রেমিক ছিলেন। মরুর মতো ওদের আকণ্ঠ তৃষ্ণা ছিল তাই বিরহের অন্ধকারে গোপনে প্রিয়তমের সঙ্গসুধার রস তাঁরা প্রাণভরে পান করেছেন।

কেন তাঁরা সার্থক হলেন সাধনায়? প্রথম ও প্রধান কারণ হল সহিষ্ণুতা। এ ব্যাপারে সূফীদের মুখে প্রায়ই একটি কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। একদিন হজরত মুসা এক রাখালের মুখে প্রার্থনা করতে শুনলেন। রাখাল বলছে, 'প্রভু আমি তোমার পোশাক ধুয়ে দেব। চুল আঁচড়ে দেব ইত্যাদি।' হজরত মুসা আর রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। কী! ঈশ্বরকে এইভাবে ব্যক্তিরূপে কল্পনা! তিনি রাখালকে সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড তিরস্কার করলেন। মর্মান্তিকভাবে ব্যথা পেয়ে চিরকালের জন্য রাখাল নীরব হয়ে গেল। তাই দেখে আল্লাহ্ হজরত মুসাকে দেখা দিয়ে এর জন্য ভর্ৎসনা করলেন। তিনি বললেন: মুসা সমস্ত শব্দ বাক্য আমার কাছে অর্থহীন আমি শুধু ভক্তের হৃদয় দেখি। এই শিক্ষা থেকে সূফীরা পরম সহ্যশক্তি নিয়ে হৃদয়কে পবিত্র ও শুদ্ধ করে তোলেন। হৃদয়কে একবার ছুঁতে পারলে জীবনের সব ছবি সৌন্দর্য মহিমা আলোকিত ও সংহত হবে। কিন্তু এই স্পর্শ হবে কি করে? মুরাদ আলী বলেছেন: প্রেমের ভেতর দিয়েই আমার জীবনে তা সম্ভবপর হয়েছে। মহৎ এই প্রেম আমার

জীবনকে শতদলের মতো বিকশিত করেছে এক লহমায়। তারপর প্রেমের প্রশান্তিতে দেহমন জুড়ে নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা। দরিয়া খান একই ব্যাপারে তাঁর উপলব্ধি জানিয়েছেন: নিস্তব্ধতার ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসে তাঁর বাণী। নিবিড় প্রশান্তিপূর্ণ এই নীরবতাকে সূফীরা বর্ণনা করেছেন, প্রিয়তমের প্রাসাদের প্রথম কক্ষ রূপে। পাষাণ দিয়ে তৈরি নয় এই কক্ষ, চাঁদের চুইয়ে পড়া কোমলতা দিয়ে এর সুষমা কল্পিত হয়েছে। সেই জন্য তারাভরা আকাশের নিচে সূফীদের আকাঙ্ক্ষিত নীরবতা সবচেয়ে সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়। সেইরূপ গভীর ও মর্মময় হয়ে ওঠে বেদনার দহনে। সত্য সূফীদের সামনে একটি পথস্বরূপ—সিন্ধুর সূফীরা ব্যক্ত করেছেন, দয়িতকে চাওয়ার তীব্র বেদনা সেই পথের সঙ্গী বা পাথেয়। এই পথ দীর্ঘ ও চিরন্তন হোক অর্থাৎ সাধকের কাজে তার যেন শেষ না থাকে। শেষ থাকলে তো তাঁকে পাওয়ার পর সব ফুরিয়ে যাবে। এই বেদনাবোধ যতক্ষণ ততক্ষণ সমগ্র সত্তা আলোড়িত হয়। পথ ফুরোলেই শেষ হবে বেদনার—বেদনা না থাকলে আবেগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সূফী তাই বলছেন: প্রিয়তমের সঙ্গে তাঁর যেন কোনোদিনই মিলন না হয়। শাহ আবদুল লতিফের ভাষায়:

> তুমি একজন সূফী? তবে
> মনে পোষণ করো না কোনো কামনা-বাসনা।
> মস্তিষ্ক ত্যাগ করো, তাকে আগুনে ফেলে দাও ছুঁড়ে—
> কারণ এই মাথাই খাজাঞ্চির মতো দিনরাত
> লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ করে প্রবৃত্তিকে ঘিরে।

আবদুল লতিফের মতে তিনিই সূফী, যিনি পরম প্রিয়তমকে তাঁর পরমতম করে গড়েছেন। আজ বস্তুবাদী জগতে আমরা ক্রমাগত জীবনযাত্রায় জটিলভাবে আসক্তির দাস হয়ে পড়ছি নিরন্তর অভাববোধ আমাদের আয়োজনকে প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে তুলছে। অতি উদ্বেগে ও উদ্বেলতায় আমাদের মন সংশয়িত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। ক্রমাগত এভাবে এক সময় মানুষ নিজেই যান্ত্রিক হয়ে উঠবে, তখন জিও প্রিও

শাহ্ সুফী আঃ লতিফ ভিটাই-এর মুরাকিবাহ্ বা ধ্যানের স্থল।

কি শাস' ধরে রাখতে সক্ষম হবে না মনুষ্য সমাজ। এটাও যেমন সম্ভব তেমনি যুগধর্মকেও ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। শুধু শাহ্ আবদুল লতিফের আবেগ রসে সিক্ত হয়ে অন্তত হৃদয়কে যদি সামান্যতম জাগ্রত করা যায়, রসের মধ্যে জারিত করা যায় সেইটুকু আনন্দই কম বিস্তারলাভ করবে না।

আবদুল লতিফের জীবনকালের শুরুতে সিন্ধুর শাসনভার মুঘলদের হাত থেকে কালহোরাদের হাতে এসেছিল। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময়ে আবদুল লতিফের বয়স ছিল আঠারো। যখন পঞ্চাশ বছর বয়স তখন নাদির শাহ্ দিল্লী আক্রমণ করে সিন্ধুকে পারস্যের সামন্ত রাজ্যে পরিণত করে। আটান্ন বছর বয়সে তাঁর চোখের সামনে আরো বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটল। দিল্লীর মৃতপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্যকে লণ্ডভণ্ড করে আহ্মদ শাহ্ আধুনিক আফগানিস্থান সৃষ্টি করে। সিন্ধু তারই একটি প্রদেশে রূপান্তরিত হল।

শাহ্ আবদুল লতিফ লোকান্তরিত হন এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে তেষট্টি বছর বয়সে। তাঁর পরলোকগমনের ছয় বছর বাদে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম কুঠি নির্মাণ করে। রাজনৈতিক এই টাল-মাটাল অবস্থার জন্য নানা বিক্ষোভ অরাজকতা সেই সময়ে সমাজ জীবনে নেমে আসে। মানুষের জীবন অস্থির ও অনিশ্চয়তায় ভরে যায়। তাই দেখে সূফী আবদুল লতিফ বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাধকজীবনের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এই সময় তিনি প্রচুর গান কবিতা লিখে মঙ্গলময় আল্লাহ্‌র আরতি করেছেন অচঞ্চল চিত্তে। পরম সুন্দর আল্লাহ্‌র প্রেমের করুণায় তিনি ছিলেন নির্বিকার। বাইরের পরিবর্তনশীল ঘটনা তাঁর মনকে বিচলিত করলেও সেই ঘটনাকে তিনি বড় করে দেখেন নি।

খণ্ড ছোট্ট জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। যে ভাবধারা অখণ্ড অমেয়, যা শাশ্বত তারই সাধনায় তিনি অন্তর্মুখী মন নিয়ে সত্যানুসন্ধান করে গেছেন। নিজস্ব এক নিভৃত রচনা করে তারই মধ্যে তিনি বাস করেন। কালহোরা বংশের আত্মকলহ, অভিজাত শ্রেণীর

বিলাসী জীবন, রাজনীতির জগতে নানা বিদ্বেষ তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর কবিতা বা গানে এ সবের ছায়া নেই। সেখানে শুধু ধ্রুবতারকার মতো পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের জয়গান।

আড়ম্বর ও বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করে আবদুল লতিফ নিমগ্ন থেকেছেন আল্লাহ্‌র আরাধনায়। ক্রমশ তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য বিচিত্র ভাবমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে অমরত্বের দিকে অগ্রসর হয়। সাধারণ একটি মানুষ তাঁর সাধনার মধ্যে দিয়ে অসাধারণত্বকে প্রতিফলিত করেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত হালা-হাবেলি, কোত্রী এবং ভিটশাহ্‌ এই তিনটি গ্রামে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি গ্রামের গভীর নির্জনে জীবন কাটিয়েছেন। রাজনীতি বা সামাজিক আন্দোলনে যোগ দেন নি। তাই বলে এর মধ্যে দিয়ে তাঁর পলায়নী মনোভাব প্রকাশ পায় নি। কিংবা তিনি মনে কোনো তিক্ততাকে পোষণ করেন নি। তিনি গভীর জীবনের সন্ধানলাভ করে জীবনের অতলদেশ স্পর্শ করেছিলেন তাই বস্তু জগতের চঞ্চলতা পরিবর্তন থেকে তিনি অনেক উঁচুতে বিরাজ করেছিলেন। যাঁরা স্থায়ী জীবনের সন্ধানে ব্যস্ত, চঞ্চল সঞ্চারশীল জীবনের আনন্দবেদনা তাঁদের মনে বিকার ঘটায় না বাল্যে ও যৌবনেই তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় রাখেন। জীবনের শুরু থেকেই পীর দরবেশ কিংবা সাধক ফকিররা তাঁকে আকর্ষণ করত। তিনি তাঁদের সঙ্গসুখ লাভ করতেন। তাঁর জীবনের পরম আনন্দ ছিল নির্জনে চিন্তায় ডুবে থাকা, বাইরের কলরব আর জীবনের গ্লানি থেকে দূরে বসে সকলের দৃষ্টির আড়ালে আল্লাহ্‌র ধ্যান করাতেই তিনি তৃপ্ত হতেন। অধিকাংশ মুসলমান সাধকদের মতো তিনি একদিন দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। পথের আকর্ষণে পথে নামলেন তিনি। একটা ব্যাকুলতা তাঁকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলে। পথ চলতে চলতে তিনি গেয়ে উঠলেন :

পালন তুমি পালনজনের সখা হে
পথে চলা সেই তো তোমার পাওয়া,

যাত্রা পথের আনন্দ গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

সেখ শাদীও এমনি করেই একদা পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। অজানাকে জানবার জন্য আবুল ফজলও নেমে এসেছিলেন রাস্তায়। অস্থিরতা বহু সময় মনীষীদের পথের সঙ্গী করে। পথ ধরে তাঁরা তাদের অস্থিরতার ব্যাকুলতাকে প্রশান্ত করতে চান। তারপর পথ-চলা বন্ধ করে আবার তাঁরা কোথাও ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েন।

শাহ্ আবদুল লতিফ ছিলেন হিরাটের মানুষ। এক ধর্মপ্রাণ সৈয়দ সাধকের বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এই বংশের মহাজনরা সিন্ধু অঞ্চলে ধর্মগুরু বা পীরের সম্মান পেয়ে এসেছেন। শাহ্ আবদুল লতিফের বাবার নাম ছিল সৈয়দ হাবির শাহ্। প্রাচুর্যের মধ্যেই মানুষ হয়েছেন আবদুল লতিফ; কিন্তু কোনোদিনই তিনি জীবনের আরাম আয়েস চাইতেন না, বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। অল্প বয়স থেকেই যত্রতত্র জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। স্বভাবে ছিলেন শান্ত, পরিমিতবাক, শাহ্ আবদুল লতিফের অন্তর ছিল কোমল। সৌজন্য দিয়ে আবৃত ছিল তাঁর চরিত্র। তিনি প্রাণী মাত্রেরই দুঃখ কষ্ট দেখলে বিচলিত হয়ে পড়তেন। তখনকার দিনের অভিজাত শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খলতা, ভোগ-বাসনা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি, ওই রকম পরিবেশের মধ্যে থেকেও সকলকে বিস্মিত করে তিনি সংযমী হয়েছিলেন।

তাঁর এই সংযত সহজ সাধক জীবনের প্রতি তাই অনেকেই শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে। সামান্য একজন যুবকের এই জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুরুদের মনে জ্বালা ধরাল। তাঁরা চেষ্টা করলেন শাহ্ লতিফের অনিষ্ট করার। নানাভাবে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। কালহোরা বংশের ওপর সৈয়দদের অপরিসীম প্রভাব ছিল। তৎ সত্ত্বেও নুর মহম্মদ কালহোরা শাহ্ লতিফের পেছনে লাগলেন। তাঁকে উত্যক্ত করতে লাগলেন। যে মানুষ ঈশ্বরপ্রেমে নির্দিষ্ট সাধারণ মানুষ তার ক্ষতি করার চেষ্টা করে কি করবে? নুর মহম্মদের ব্যাপারে শাহ্ লতিফ

বিচলিত হলেন না। শেষ পর্যন্ত মহম্মদ নিজের ভুল বুঝতে পেরে এই তরুণ সাধকের বন্ধু হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে তিনি আধ্যাত্মিক কবিতা গান রচনা শুরু করেন। জনসাধারণ তাঁর প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকে। এই জনপ্রিয়তায় তাঁর মন পীড়িত হয়ে পড়ে। লোকালয়ে থাকলে প্রশস্তির হাত থেকে মুক্তি নেই বুঝতে পেরে তিনি নির্জন বালির পাহাড়ের মাঝে একটি কুটির বানিয়ে বসবাস শুরু করেন। কুটিরের পাশেই স্বচ্ছ হ্রদ কাড়ার। চারপাশে মরু অঞ্চলের মধ্যেও শ্যামলিমা। রুক্ষ প্রান্তর, মাঝে উন্নত তরুশ্রেণী। এ এক ব্যতিক্রম সিন্ধুর এই অঞ্চলে। শাহ্ আবদুল লতিফের সাধনার উপযুক্ত স্থান বটে এই ভিট শরীফ। দেখতে দেখতে এই ভিট ঘিরে গড়ে উঠল একটি গ্রাম। গ্রামের অধিবাসীদের ঘরবাড়ি গড়ে তুলবার কাজে শাহ্ লতিফ নিজে সাহায্য করলেন সবাইকে।

নির্জনতা খুঁজেছেন তিনি। চলে এসেছেন জনহীন স্থানে। তাতে কি নিস্তার আছে। সবাই যে চিনেছে তাঁকে। অধ্যাত্ম সম্পদকে হাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছেন তিনি। দলে দলে জনতা তাই ছুটে এসেছে তাঁর সঙ্গ পেতে, কৃপা পেতে। সূফী কবি পারস্যের সাধক শ্রেষ্ঠ জালালউদ্দীন রুমী ছিলেন লতিফের খুবই প্রিয়। তাঁর এক প্রিয় ভক্ত নূর মহম্মদ কালহোরা তাঁকে রুমীর এক খণ্ড মসনভী কাব্য গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন। লতিফ গ্রন্থটি পেয়ে ভক্তের প্রতি খুবই প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিল পবিত্র কোরান, একখণ্ড মসনভী আর অমর সিন্দ্ধী কবি শাহ্ করীমের একটি কবিতা গ্রন্থ। আল্লাহ্‌র ধ্যান সাধনায় বসে দীর্ঘ দিন তিনি এক বৃক্ষ কোটরে বাস করেন। বহির্জগতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। এই সময়ে জগৎ ভুলে তিনি সুন্দরের আরাধনায় এক পরম প্রাপ্তিকে করায়ত্ত করেছিলেন। তাঁর সেই মহান উপলব্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায় সমস্ত রচনা জুড়ে। সাধক মনের বেদনা ও অনুসন্ধান প্রবৃত্তি তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ছড়ানো বলেই তা মানুষের চিরকালীন সম্পদ হয়ে আছে। সেই সব রচনা ধ্রুপদী সাহিত্য হয়ে বেঁচে আছে শতাব্দীর

ভাঙাগড়া উপেক্ষা করে। ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে তিনি সাধনলোকে যাত্রা করেন। ভিট শরীফে তাঁর কবরের ওপর গুলাম শাহ্ কালহোরা বহু অর্থব্যয়ে একটি সুন্দর সমাধি সৌধ তৈরি করে দেন। সেই সমাধি মন্দির সূফীদের কাছে এক পবিত্র তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। সেখানে আজও প্রতি শুক্রবার শাহ্ আবদুল লতিফের কবিতা আবৃত্তি করা হয়। সেই কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে চারিদিকের গাম্ভীর্য ভেদ করে আল্লাহ্র পবিত্র নাম প্রতিধ্বনিত হয়। সূফী কবি আবদুল লতিফের কবিতা সঞ্চয়ন রিসালেমুনতাখাব সিন্দ্ধী ভাষার এক মহামূল্য সম্পদ। আজ পর্যন্ত এই সাধক কবির সমকক্ষ কোনো কবি সিন্দ্ধী সাহিত্যে আবির্ভূত হয়নি। প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত সিন্দ্ধী ভাষাকে আরবি ফারসি ও উর্দু প্রভাব থেকে মুক্ত করে শাহ্ আবদুল লতিফই পূর্ণ প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম এই আঞ্চলিক ভাষায় স্ফূর্তির জোয়ার বইয়ে দেন। সিন্ধু প্রদেশের নদী পাহাড় পর্বতশ্রেণী, রাখাল বালক, উদাত্ত আকাশ প্রাকৃতিক বর্ণময়তা ও সর্বোপরি আল্লাহ্র স্তুতিগান তাঁর রচনায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। ফলে ভাষা পায় অবাধ গতি, হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। জনগণের মুখে মুখে প্রাদেশিকতা ছাড়িয়ে এই ভাষায় সার্বজনীনতা পরিস্ফুট হতে থাকে। শাহ্ আবদুল লতিফ একা একটি ভাষাকে প্রাণময়তায় রঙিন করে তোলেন। তাঁর সাধনায় ও কবিমানসের প্রতিভার ছোঁয়ায় সমগ্র সিন্ধু পূর্ণ গৌরব নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সেই অসামান্য কাব্য থেকে বেছে এখানে কিছু অনুবাদ তুলে ধরছি। যদিও অনুবাদ কখনোই মূলের কোমলতা স্পর্শ করতে পারে না। তবু তাঁর অনুভূতি, হৃদয়ের আর্তির কিছুটা স্বাদ হয়তো এর মধ্যে দিয়েই প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

আমার দুর্বলতা আমাকে দেয় আনন্দ······আল্লাহ্র কানে কানে ধ্বনিত হয় আমার প্রেমের বেদনার্ত আর্তনাদ······

ফাঁসির মঞ্চবৃক্ষে করেছি আস্বাদ (প্রেমের)।

দুঃখ আমার জন্য নিয়ে এসেছে কি অপূর্ব এক মহত্ত্ব!

ফাঁসির মঞ্চ হাতছানি দিয়ে ডাকে—ওগো আমার বন্ধুরা তোমরা কেউ কি যাবে আমার সাথে?

প্রেমের নাম যারা জানে, আসবে শুধু তারাই প্রেমের দায়ে।

ফাঁসির কাঠ প্রলোভনকে দেয় বিছিয়ে।

ডাকে প্রেমিকদের, বলে; পেয়েছ কি সন্ধান……

প্রেম কি ও কেন? যাত্রা করো না (সেই দুর্গম রহস্যের পথে)

(তোমার গর্বিত) শিরের মূল্য দিও না কিছু……

বরং করো জিজ্ঞাসা, প্রেমের অর্থ কি—তারপর বলো কথা।

ফাঁসির ফাঁস (বস্তুর আবর্তন জালে তার অস্তিত্ব!)

অলংকৃত করে প্রেমিকদের! সৈয়দ করে গান……

তারা দেখেছিল প্রেমের দর্শন……কম্পিত হয়নি তাতে স্থিরপদে দাঁড়িয়েছিল তারা।

প্রেম তাদের দিয়েছিল ডাক…… তারা আপনাকে করেনি আবৃত প্রেমই তাঁদের সেখানে গেছে নিয়ে……প্রেমের আবেশ।

নির্মম হাতে প্রেম তুলে ধরে ছুরি……

তাই প্রেমাস্পদের হাত অনেকক্ষণ ধরে চলবে তোমার ওপর দিয়ে।

প্রেম কেন আসে? কি করে আসে জান কি তা?

ছুরি খসে পড়ে……মুখে শব্দ নেই একটুও আহা কিংবা উহু—অথচ কি এক ক্ষতে ও যন্ত্রণায় তোমার বুক জ্বলে যায় অন্যজনকে বলো না সে কথা, মনের বেদনাকে মনেই রাখ ধরে।

সারি সারি দাঁড়িয়েছে প্রেমিকের দল—
মস্তক প্রস্তুত করে, স্থির অচঞ্চল।
ছিন্ন করো শির যেন না হয় অন্যথা,
হয়তো নিমেষে পাবে তাঁর প্রসন্নতা
ভূমিতে লুটিয়ে পড়ো রক্তমাখা শির
ব্যর্থতায় প্রকাশ পাবে না তোমার অন্তর অধীর
প্রেমের শরাবপানে হত্য অগণন,
বন্ধহীন বন্যাস্রোতে চলে অনুক্ষণ।

প্রেমের মদিরায় যদি শুধু এতটুকু
পানের আশায় তুমি একান্ত উৎসুক
পানশালা হবে তবে একমাত্র নীড় ;
পানপাত্র পাশে শুধু পড়ে আছে শির।
মূল্য দিয়ে করো লাভ আস্বাদ মদির।

'লীলাঁ' ও চানেসার সিন্ধুর একটি বিখ্যাত লোকগাথা। সিন্ধুনদ বিধৌত উর্বর সরস সবুজ অঞ্চলের সজীবতার মতো এই গাথাটি লোকজীবনে প্রাণের প্রবাহ নিয়ে এসেছে। বহুযুগ ধরে এই কাব্য মানুষকে যোগাচ্ছে মনের আবেগ ও প্রেরণা। এর ভেতর থেকে তাই তারা তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করছে একই সঙ্গে।

সিন্ধুর শাহ্ আব্দুল লতিফ এ গাথাটিকে তাঁর সাধক জীবনের ভাব প্রেরণার উপাদানরূপে ব্যবহার করেছেন। যে রহস্যময় উপলব্ধিকে এমনি বোঝানো যায় না, তাঁকে তিনি এই সহজ সরল কাহিনীর ভেতর দিয়ে সাধারণের সামনে হাজির করেছেন। মুগ্ধ হয়ে সকলে দেখতে পায় তিনি পাঁক থেকে শতদল পঙ্কজকে বিকশিত করে তুলেছেন। সেই আশ্চর্যমধুর কাহিনীটি হল : এক হিন্দু রাজকন্যা কাঁউরু ছিল অত্যন্ত অহঙ্কারী ও প্রভুত্ববিলাসী। একদিন তার সখীরা তাকে জানাল, পরম সম্ভ্রান্ত ও গুণবান চানেসার দাসরোর হৃদয়কে সে কিছুতেই জয় করতে পারবে না। এ কাজ অসম্ভব রাজকন্যার পক্ষে। সখীদের এই কথায় কাঁউরু উত্তেজিত ও আহত হল। সে তখন প্রতিজ্ঞা করল, সখীরা যা বলেছে তা কত অযৌক্তিক তা সে প্রমাণ করিয়ে ছাড়বে।

কাঁউরু তার কথা প্রমাণ করবার জন্য কাজে নেমে পড়ল। সে চানেসারের প্রাসাদে ঢুকে তাঁর উজীরের সহায়তা পেল। উজীর কাঁউরুকে সহানুভূতি জানালেও গোপনে চানেসারকে তার আগমনের কারণ জানিয়ে দিল। কাঁউরুর উদ্দেশ্য জেনে চানেসার তার সব প্রস্তাব ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দিল। কাঁউরু তাতে দমল না। অনমনীয় প্রতিজ্ঞায় সে স্থির তাই তার প্রয়াস অদম্য হয়ে উঠল। প্রত্যাখ্যাত

হয়ে ধৈর্য হারাল না। এবার গোপনে সে এক দাসীর ছদ্মবেশে প্রাসাদের কাজে বহাল হল। অল্প সময়েই চানেসারের পত্নী লীলাঁর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল। তাদের বন্ধুত্ব নিবিড় হল দেখতে দেখতে। একদিন সময় ও সুযোগ বুঝে সে লীলাঁর কাছে প্রস্তাব করল, যদি একটি রাত সে তার স্বামীর সঙ্গে কাঁউরুর রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে দেয় পরিবর্তে লীলাঁকে ন লক্ষ টাকার একটা হীরের হার উপহার স্বরূপ দেবে। লীলাঁ লোভে পড়ে রাজি হয়ে গেল। সেই রাতেই কৌশলে সে তার স্বামীকে কাঁউরুর ঘরে পাঠিয়ে দিল। মদিরার নেশায় প্রমত্ত হয়ে চানেসার কাঁউরুর রূপ যৌবনের কাছে আত্মসমর্পণ করল। একটা রাত কেটে গেল উন্মাদনায় ও মত্ততায়। পরদিন কাঁউরুর মা এসে দাবী জানাল, এখন থেকে কাঁউরুকে স্ত্রীরূপে চানেসারের গ্রহণ করতে হবে। কারণ ন লক্ষ টাকার হীরার হারের পরিবর্তে লীলাঁ কাঁউরুর কাছে তাকে বিক্রি করেছে। লীলাঁর লোভের ঘটনা শুনে প্রতারিত হয়ে চানেসার রাগে দুঃখে তাকে তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে দূর করে দিলেন। লীলাঁ বহু মিনতি করল, কেঁদে বুক ভাসাল তবুও চানেসার তাতে কান দিলেন না। লীলাঁ ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে দেখল, সে নিজের দোষেই তার স্বামীর বিশ্বাস ও প্রেম হারিয়েছে। সেই থেকে লীলাঁর সঙ্গী হল ক্রন্দন, (সেই সঙ্গে আবদুল লতিফেরও) হে প্রভু, প্রিয়তম, অসহায় আমি, আমাকে এভাবে পায়ে ঠেল না। শাহ্ লতিফের ভাষায় সেই ক্রন্দন :

লীলাঁ। কি করে ঠেললে পায়ে—দূর করে দিলে
এই চিন্তা মন থেকে? বিদ্ধ করো তুমি
প্রাণের গভীর দেশ। সান্ত্বনার বাণী, কথা বলো
প্রিয়, কথা বলো তুমি—তুমিই একমাত্র প্রভু,
কামনার ধন, তুমি বড় প্রয়োজন আমার জীবনে,
বন্ধু, লোকচক্ষে আর অনাবৃত করো নাকো আমাকে
ঘৃণায়। স্বামী, প্রিয়তম, আহা আমি দীনহীন
দূর করে দিও নাকো, প্রাণ প্রিয়তম তোমার প্রেমের
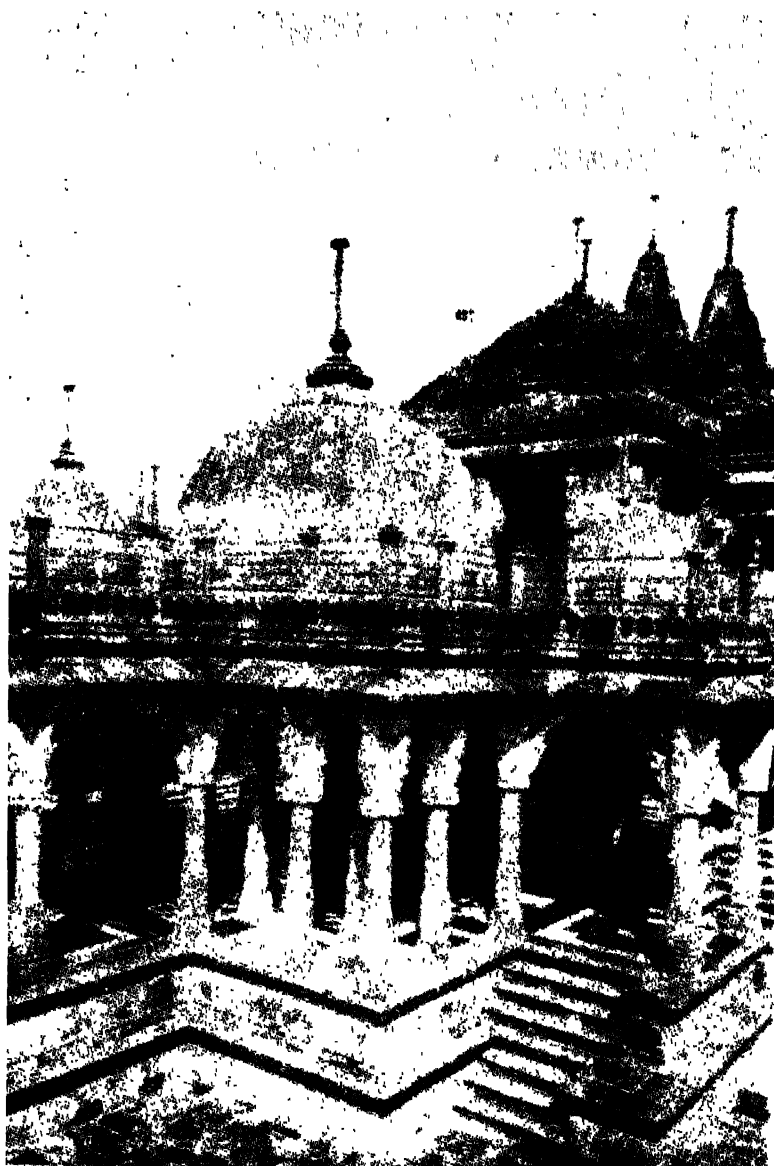
শাহ্ লতিফের আহমদাবাদ-এ আগমন ও হিন্দু-মুসলিমের সংযুক্ত উপাসনালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ-নিদর্শন।

আঘাত কী ভীষণ, আমাকে ভূলুণ্ঠিত করে ফেলে
তবুও আমার স্বামী তুমি একমাত্র। বহুজন তোমার পিয়াসী।
প্রিয় যবে কথা বলো আমাকে বলাও,
এত ঘৃণা কেন তবে? চরণের তলে আমি বসে—
অপরাধ অসীম আমার, দ্বারপ্রান্তে প্রার্থী ;
একান্তে, আমাকে ফিরালে বলো কোথা পাব স্থান?
প্রভু মুছে দাও, আমার কলঙ্ক যত, ধুলো ভেজা দিন।
সখীরা দেখেছে পাপ—দুর্নীতি আমার বিদ্রূপ
তাদের মুখে শুধু পরিহাস ঘৃণা আর দূরে সরে থাকা।
বাহুতে পরিনি বাজু, কণ্ঠে মুক্তাহার নেই কোনো আভরণ ;
কোনো প্রসাধন, চোখে নেই কাজলের সুগন্ধি প্রলেপ।
অভিনব রূপসজ্জা, প্রিয়তম হৃদয়ের অধীশ্বর তুমি,
খুঁজেছে একান্তে শুধু আমাকে তখন, যখন নানা রঙে
সেজেগুজে পরিপাটি কেশে, শৃঙ্গারের ইঙ্গিত নিয়ে
ছিলাম কাছেতে। তাই বুঝি প্রিয় ত্যাগ করে চলে
যায় ভাবনার ভার। প্রিয়তম বন্ধু বড় অসহ্য নির্মম
তোমার বিদ্রূপ ব্যথা বেদনার তীব্র কশাঘাত।
তোমার অনেক আছে, অযুত প্রেয়সী, প্রেমাকাঙ্ক্ষী
নারী ; কিন্তু শুধুই তুমি একমাত্র স্বামী বন্ধু মোর!
ফিরে এস, আর একবার দয়া দিয়ে ফিরে এসে
করুণা দেখাও পীড়িত ও আর্তজনে। জানি অসংখ্য
রূপসী তোমার সেবায় রত! তবুও ছেড়ো না তুমি
এই দীনহীনারে। অসহায় আমি বন্ধু বড় একা।
একা এই ভ্রান্তি নিয়ে। একা একা ফিরব বিপথে।
গলবস্ত্র অনুরোধটুকু শোনো বন্ধু চানেসার,
সঁপেছি তোমার হাতে সৌভাগ্য আমার।

শাহ্ আবদুল লতিফ লীলাঁ ও চানেসার লোকগাথাটিকে একটি অলৌকিক তাৎপর্যে রূপায়িত করেছিলেন অপূর্ব সরলতায়। একটি

লোকমুখে পল্লবিত গল্পকে তিনি অবলম্বন করে তার ভেতর দিয়ে চিরকালের প্রিয়তম ও প্রেমের কথাকেই জনমানসে তুলে ধরেছেন। এ ভাবেই তিনি মানুষের মনে জীবনকে বিবেচনা করবার এক অসামান্য সিদ্ধান্তকে নির্দিষ্ট করেছেন। চানেসার হল আল্লাহ্‌র শক্তির প্রতীক, আর রানী হল ব্যক্তি মানসের প্রতীক। পার্থিব চাকচিক্যের মোহে ও লোভে পড়ে ব্যক্তি মানস বেহস্তী নেয়ামতকে দূরে ঠেলে দেয়। যে পর্যন্ত ব্যক্তি-মানস উচ্চতর ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসী থাকে এবং ধ্যানে জ্ঞানে সব সময় তাকেই স্মরণ করে ততক্ষণ সে সমস্ত প্রলোভন থেকে দূরে নিরাপদে থাকে। এই অবস্থা আল্লাহ্‌র করুণা ছাড়াও পার্থিব সব সুখ সমৃদ্ধি তার করায়ত্ত হয়। কিন্তু যখনি একবার আল্লাহ্‌র আনুগত্য ত্যাগ করে হস্তগত পার্থিব সুখ ও সমৃদ্ধির চমৎকারিত্বের মোহে ঢলে পড়ে তখনি আল্লাহ্‌র প্রতি অবহেলা তাকে পরমেশ্বরের বিরাগভাজন করে তোলে। এই হল আল্লাহ্‌র বিধান। কোরান শরীফে এর উল্লেখ আছে : লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম

ওয়া লা আওলাদকুম আন যি করিল্লাহ্।

অর্থাৎ আল্লার ফিকর বা সর্বক্ষণের স্মরণ থেকে ধনসম্পদ ও পুত্র পরিজন যেন তোমাদের বিভ্রান্ত কিংবা দিকভুল করিয়ে সরিয়ে না নিয়ে যায়। বিভ্রান্ত মানুষ সেই অবস্থায় শুধু আল্লাহ্‌র রহমতের অধিকারই হারায় না পার্থিব সব ক্ষমতাও সে নষ্ট করে ফেলে। এই ঘটনা যেমন ব্যক্তি জীবনে তেমনি জাতির জীবনেও দেখা দেয়। যেসব জাতি নৈতিক মূল্যবোধ মেনে চলে এবং মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আত্মনিয়োগ করতে তৈরি থাকে তারা ইতিহাসে দীর্ঘদিন সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকে, এবং অন্য জাতির ওপর নিজেদের প্রভাবকে বিস্তার করে, মুসলমানদের ইতিহাসেই এর নজির রয়েছে। কার্লাইল এক জায়গায় বলেছেন : মুসলমানেরা যতদিন শুধু আল্লাহ্ নির্দেশিত পথেই জীবনযাপন করত, ততদিন মাত্র আশি বছরে গ্রানাডা থেকে দিল্লী পর্যন্ত সাম্রাজ্য অধিকার করে দুনিয়ার রূপ পাল্টে দিয়েছিল। এই পৃথিবী তখন নতুন শক্তি ও জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

তারা আল্লাহ্‌র পথে চলেছিল এবং তাঁরই গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য অদম্য সাধনা করেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে নবজীবনের জোয়ার এনেছিল। কিন্তু বেশিদিন নির্মোহ থাকতে তারা পারেনি ; ধনসম্পত্তি পার্থিব মোহ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। আল্লাহ্‌র পথ তারা ভুলে যায়, তখন এই গল্পের রানীর মতোই তারা বিতাড়িত হয় লব্ধ সাম্রাজ্য থেকে। গৌরবের শিখরে আরোহণ যেমন সত্য ছিল তেমনি নিদারুণ সত্য তাদের অবরোহণ। তাই আজকের মুসলমানেরা চিন্তা করে আল্লাহ্‌র করুণা থেকে তারা বঞ্চিত হল কেন ? অথচ সহজ সত্য তারা বুঝতে পারছে না সার্বিক অধঃপতনের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।

গল্পের প্রতীক হল, রানী প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত। রাজা তাকে পরিত্যাগ করেছে। এখন তার উপায় কি ? রানী কেমন করে পূর্বগৌরব ফিরে পেয়ে আবার চানেসারের কাছে পৌঁছবে—অন্যভাবে রানী একটি জাতির প্রতীক ; সেই জাতি কেমন করে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করবে ? শাহ্ আবদুল লতিফের ধারণায় তা সম্ভব, যদি সেই জাতি আল্লাহ্‌র পথে ফিরে গিয়ে তওবা বা আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করে। শাহ্ আবদুল লতিফ লীলাঁকে এই উপদেশই দিয়েছেন। তার সেই অজেয় উপদেশ অমর হয়ে আছে সিন্ধ্রী ভাষায় ও সাহিত্যে। প্রার্থনা করেও যদি তুমি আল্লাহ্‌র কাছে না পৌঁছতে পার তাহলেও নিরাশ হয়ো না। অনন্তর প্রার্থনা নিবেদন করতে থাক, আশা ছেড় না, কারণ সর্বমঙ্গলময় আল্লাহ্ সব সময়েই দয়ালু ও ক্ষমাশীল। কোরান শরীফের এক অমর বাণী এই উপদেশে প্রতিধ্বনিত :

> লা তাকনাতু মির রহমাতিল্লাহ্
> ইননাল লাহা ইয়াগ্ ফারুয্ যুনুবা
> জামীয়ান ইননাহু হুয়াল গফুরুর রহীম।

লীলাঁর কণ্ঠে শাহ্ আবদুল লতিফের যে ভাবাবেগ বাণীরূপ লাভ করেছে, তার মধ্যে সাধারণ মানুষেরও ব্যাকুল আর্তনাদ উচ্চারিত। এই ক্রন্দন প্রাণের গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত হয়ে আত্মার

চিরন্তন বিরহ ব্যথার মর্মবেদনা নিবেদন করে চলেছে। ধুলায় অবলুণ্ঠিত মানবাত্মার শাশ্বত ক্রন্দন পাঁকের মধ্যে থেকে পঙ্কজের স্বপ্ন রচনা করে চলেছে। সেই ক্রন্দন ও স্বপ্ন কবে সার্থক হবে? সাধকরা যুগ যুগ সাধনায় এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে এসেছেন। নানাভাবে ও ভাষায়। আমরা তার যতটুকু বুঝেছি! সাধক মনের বেদনার শুরু কবে থেকে? প্রিয়তমের প্রসন্নতা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে কত শতাব্দীকাল আগে? কক্ষচ্যুত মনের গ্রহ কত মহাশূন্য ঘুরে মাটির বুকে আশ্রয় নিয়েছে? সাধক মনের উত্তাপ ও তার নিরসন ঘটে কখন? তখন ঘটে যখন প্রিয়তম আসে। তার আগমনের আশ্বাস যখন ছন্দে ও সঙ্গীতে ঝংকৃত হয় তখন সাধক নিজেকে সমর্পণ করে। নিমেষে তাঁর আমিত্বর মৃত্যু হয়—নিষ্কলুষ ভক্ত হৃদয় সুন্দরের প্রেম নিষিক্ত ভাববন্যায় ডুবে যায়। সমুদ্রের নীল জলরাশি যেন সূর্যের আলোয় ধন্য হয়ে ওঠে।

গিরনারের রাজা রায় দিয়াচ। তাঁর বোনের এক ছেলে। বিজল যার নাম। এর সম্পর্কে একজন ফকির দিয়াচের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কালে এই ছেলে হত্যাকারী হবে। এই অলক্ষুণে শিশু-পুত্রের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তার ভীত সন্ত্রস্ত মা তাকে একটি বাক্সে বন্ধ করে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। সিন্ধুনদের স্রোতে বাক্স ভেসে চলল। শেষ পর্যন্ত এক চারণ কবির ঘাটে এসে বাক্সটি থেমে গেল। চারণকবি বিস্মিত হয়ে বাক্সটি খুলে শিশুটিকে নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন। তাকে গড়ে তুলতে লাগলেন এক সঙ্গীতবিদ্‌রূপে। বিজল জানে না তার জন্ম অভিজাত রাজবংশে। দেখতে দেখতে সে বড় হয়ে বিখ্যাত হল সুরকাররূপে। দেশজোড়া তার নাম। তার গান শুনে মুগ্ধ আকাশের পাখিরা, নদীর স্রোত, বনের গাছপালা, সর্বোপরি সমস্ত মানুষ। অব্যক্ত এক আনন্দকে সে মূর্ত করে সঙ্গীতের ঝঙ্কারে।

অন্যদিকে রাজা অহন রায়ের কন্যা সুন্দরী সোরাথকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা দিয়াচ তাকে বিয়ে করলেন। এই বিয়ের কিছুদিন

বাদে দুই রাজার মধ্যে শত্রুতা দেখা দেয়। শত্রুতা যুদ্ধে পরিণত হল। অহন রায় গিরনার অবরোধ করলেন কিন্তু দখল করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, যে দিয়াচের ছিন্নমুণ্ড এনে দেবে তাঁকে তিনি প্রচুর পুরস্কার দেবেন। এই ঘোষণা সঙ্গীতজ্ঞ বিজলের কানেও পৌঁছল। হঠাৎ তার মনে পরিবর্তন দেখা দিল। সে গিরনারে দিয়াচের দরবারে গিয়ে হাজির হল। প্রাসাদে প্রবেশ করেরাজাকে বলল বিজল, রাজা সঙ্গীত শুনুন, আমি এক সুরকার।

রাজা অবাক হলেন। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। এই অসময়ে সঙ্গীত?

সঙ্গীতের সময় অসময় নেই রাজা সব সময়ই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সুরের প্রবাহ চলেছে। সুর বইছে শোকে দুঃখে আনন্দে উল্লাসে। তোমাকে সেই অনাদি সুরের প্রবাহ থেকে অংশ গেয়ে শোনাব।

তোমার পরিচয়? দিয়াচ জানতে চাইলেন বিজলের পরিচয়।

আমার আলাদা কোনো পরিচয় নেই—সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই আমার পরিচয় পাবেন।

তার আগে চোখ ভরে তোমাকে দেখেনি চারণ! কী অপূর্ব তোমার চেহারা। কী অনবদ্য সুষমা। সমস্ত সুন্দরের একত্র সমারোহে বুঝি তোমার পরিপূর্ণতা। গাও, গাও হে কবি, শোনাও তোমার সুরলহরী।

বিজল গান শুরু করল। সুরের ঢেউ আছড়ে পড়ল প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে। গান্ধার পঞ্চম ধৈবতে কোমল ও কড়িতে সুরস্রোত প্রবাহিত হল। কখনো উদাত্ত কখনো লঘু। রাজা ভেসে চললেন সেই সুরমায়ায়। ভেসে যায় সোরাথ। ভেসে চলল রাজ্যপাট, মান অভিমান, অহঙ্কার আভিজাত্য, হিংসা দ্বেষ। মন মুক্ত হয়ে বলাকার মতো অনন্ত অসীমে ডানা মেলে। এক সুরের পর আরেক সুর। সুরের মায়াজাল, এক জগতের পর অন্য জগৎ। আনন্দের জগৎ, সুখের জগৎ। বিজলের গান সকলকে আত্মবিস্মৃত করে দিল। হঠাৎ

সমে এসে গান যেই থামল রাজা দিয়াচ তখন নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছেন বিজলের কাছে। তিনি বললেন, বিজল আমার সকল সম্পদ তোমাকে দিলাম। বিজল এই কথার উত্তরে বলে উঠল, রাজা তোমার ধন ঐশ্বর্যে আমার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার শির চাই। আত্মবিস্মৃত দিয়াচ সেই মুহূর্তে তাতেই রাজী। বলে উঠলেন এই আমার শির, তুমি ছিন্ন করে নিয়ে যাও। সাথাথ স্তব্ধ। একি করল রাজা! এক কথায় বিকিয়ে দিল শির? সুরের সম্মোহন কি এতই প্রবল? সে সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে বললে, একি করলে তুমি? আমার কি হবে একবার ভেবেছ? রাজা তখন সমস্ত পার্থিব বিচার-বিবেচনার উর্ধ্বে। সোরাথের হাত নিজের হাত থেকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, যে ভাবসত্তার পরিচয় আমি এই সঙ্গীতের মাধ্যমে পেয়েছি তার কাছে শিরদান অতি সামান্য ব্যাপার। সোরাথ, আমি অনন্ত-লোকের সুরধ্বনি শুনেছি, তুমি আমাকে বাধা দিও না।

রাজাকে বাধা দেবে কে? যে সেই সুর শুনবে সেই তো তার ভেতর ডুবে যাবে। রাজা কি গানের ভেতর দিয়ে আনন্দের আহ্বান-গীত শুনেছিলেন? মূল গাথায় তার ইঙ্গিত নেই। কিন্তু শাহ্ আবদুল লতিফের হাতে এই গাথার সার্থক পরিণতি ঘটেছে। কাহিনী এখানে গৌণ, সুরের জাদুতে সম্মোহিত দিয়াচ শির দিলেন এই কাহিনীটুকু কেন্দ্র করে লতিফ যে সুন্দর রসভোগ কাব্য সৃষ্টি করলেন তা সহস্র দল পদ্মর মতো বিকশিত হয়ে আজও অনন্য এক সাহিত্যে রূপে বিরাজিত, সেটাই আমাদের কাছে মুখ্য বা প্রধান বিষয়। লতিফের সেই কবিতার কিছু অংশ :-

প্রথম রজনী আসে পথে পথে নিঃশব্দ গভীর
দুর্গের প্রান্তর প্রান্তে আগন্তুক চারণ কবির
ধ্বনিল একটি তারে, আহ্ তার কণ্ঠে সে কি সুর—
গিরনারে উঠিল রব কোন সাধু কোন যে সুদূর
পথিক বীণায় বাজে সৃষ্টি করে আশ্চর্য বিস্ময়!
রাজা, চাই শির তব—সে চারণ কবি কণ্ঠ কয়।

দ্বিতীয় রজনী আসে অন্ধকার পূর্বের মতন
ধীরে ধীরে প্রাসাদের স্তব্ধ বুক, শান্ত দূর বন।
রাজার আহ্বানে আসে শান্ত পদে চারণ বিজল
এক তারা, বাঁশি হাতে। মুগ্ধ চিত্ত আনন্দে চঞ্চল।
রাজা বলে, আসে নাই পূর্বে আর তোমার মতন।
এমন গায়ক, দক্ষ সুরকার প্রাসাদে কখন।
তোমার বাঁশির সুরে দেহ থেকে আত্ম দূরে যায়—
আমার সম্পদ সব আজ তব তুষ্টি-কামনায়,
তোমাকে প্রচুর দেব, এস শিল্পী, এস গীতিকার—
তোমার মন্ত্রের তারে তুলে দাও সুমিষ্ট ঝঙ্কার।

তৃতীয় রজনী আসে—অলক্ষিতে এসেছে যেমন
বহু মাস বর্ষে বর্ষে—শান্তিপূর্ণ নীড়, গৃহকোণ।
অনেক মানুষ আছে সুমহান হাজার হাজার
কি জানি কি মনে হল অকস্মাৎ খেয়াল আমার
তাঁদের ছাড়িয়া আমি এইখানে হয়েছি হাজির—
প্রত্যাশা—অতীত কণ্ঠে বহু রাগ-রাগিণীর ভিড়।

চতুর্থ রজনী আসে—স্বাগতম হে কহি চারণ!
একাকার সুখ দুঃখ—দ্বেষ প্রীতি জীবের মরণ
সুরে সুরে একি সৃষ্টি! মায়াময় একি স্বর্ণজাল
সুরের মোহিনী মায়া! অবলুপ্ত স্থান-পাত্র কাল
আমার দুঃসহ সত্তা, অবারিত এই ধনাগার
তোমার পায়ের তলে—নিবেদিত তুচ্ছ উপহার।
পঞ্চম রজনী আসে—সম্মোহিত আচ্ছন্ন যেমন
মদিরায় পানাসক্ত অচেতন নির্বিকার জন।
লক্ষ লক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা, কৌচ ও কুশা অবিরত
আসে আর আসে শুধু তার পদপ্রান্তে শত শত।
বিমুখ বিজল বলে, এ নহে আমার উপহার

নিয়ে যাও, হে মহান, এই সব ঐশ্বর্যের ভার।
আমি চাই শির শুধু সমুন্নত মস্তক তোমার
যেন তুমি সুখী হও—লাভ করো প্রশান্তি অপার।
রাজা। একদিকে সঙ্গীত তোমার
অন্যদিক এক শত মস্তকের ভার
সঙ্গীত ওজনে বেশি। আর এই শির, চাও জানি
একটি হাড়ের খুলি—শূন্যগর্ভ পঙ্গু বলে মানি।
চারণ। আমার পোশাক পরো সঙ্গীতের তারে তারে বাঁধা
এর তন্তু প্রতি সূত্র শত রাগ-রাগিণীতে সাধা।
কত ব্যথা বিরহের বেহাগের করুণ ঝংকারে
অনুরাগ প্রতিমাত্রা তালে তালে সুরের বিস্তারে
সূক্ষ্মকাজ—সূক্ষ্মতম সমাবেশ অনুভূতি আর
তার সঙ্গে জীবনের কারুকাজ কত সুখ দুঃখ বেদনার।
রাজা। স্বাগতম শোনো গীতকার।
বুঝেছি কি বলো তুমি—আর কিছু নাহি বলিবার
পরিষ্কার সব অর্থ—পরিচ্ছন্ন আকাশের মতো
তবে পরিতুষ্ট হও এই শিরে তুমি আপাতত।
কবি (শাহ্ লতিফ)—এই তিন গাথা বারংবার
এক সুরে ছুরি গ্রীবা এই সুর সঙ্গীতের তার।

তীক্ষ্ণ ছুরি বের করে বিজল গায়ক সুরকার
রাজার মাথায় হানে বারবার নির্মম আঘাত।
গিরনারের ফুল তোলা শেষ হল—কাঁদে পথিজন
শোকাচ্ছন্ন মহিলারা সোরাথের মতো শত শত
প্রলাপে ও শোকে মত্ত। সুসজ্জিত দিয়াচের শির
নিবেদিত হয় পাথর বিজলের, শোকের মাতন
নারী কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে, কালরাতে রাজা মারা গেছে।
দিল্লীর সাধক শারমুদ একদিন স্বেচ্ছায় হাসিমুখে শির পেতে
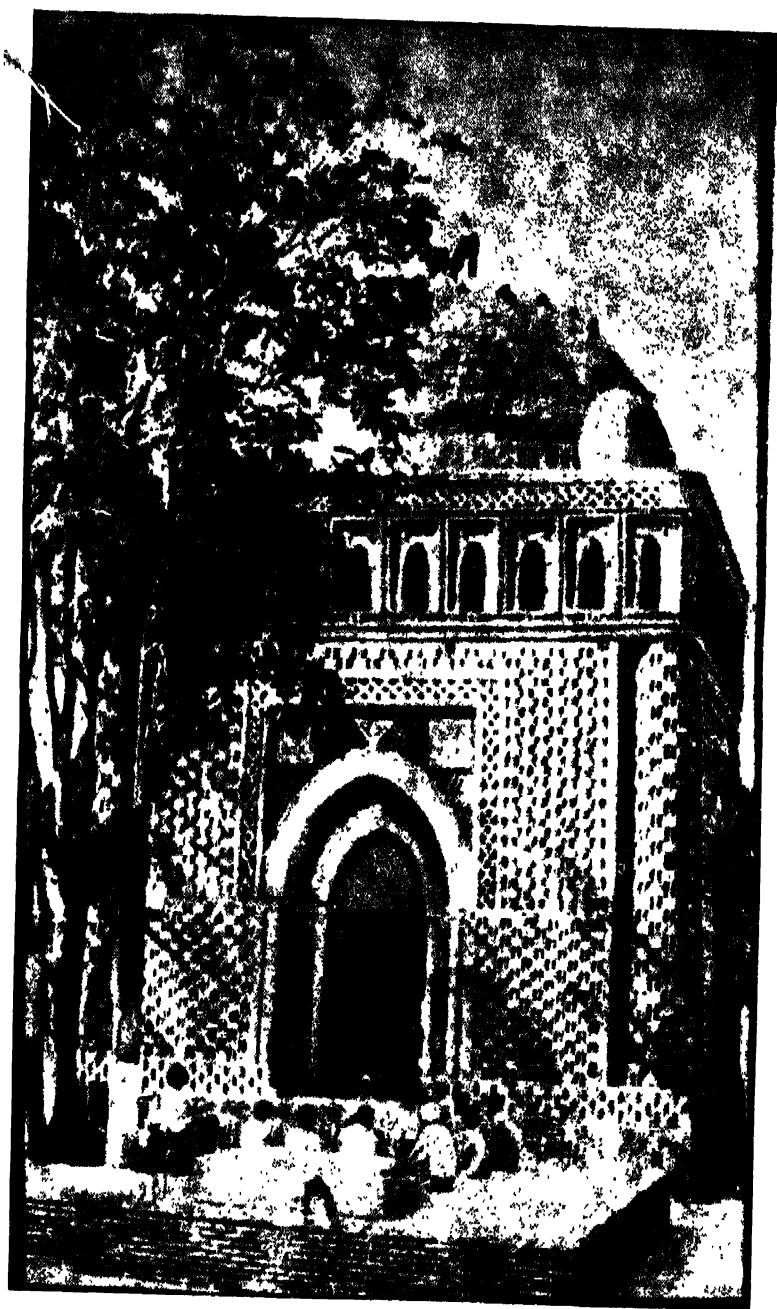
শাহ্ লতিফের রওজা মোবারক

দিয়েছিলেন প্রিয়তমের উদ্দেশে। জামীও প্রেমের দায়ে দয়িতের দ্বারে মাথা পেতে দেন। আর আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের শোণিতে প্রেমের উষ্ণতা নেই, মাথায় নেই নেশার মত্ততা। তাই স্বেচ্ছাকৃত আত্মদানে আমরা বিমুখ হই। দিয়াচ ও বিজলের কাহিনীকে অবলম্বন করে শাহ্ আবদুল লতিফ যে আত্মদানের ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেই আত্মদানের ব্যাখ্যা পূর্ণ বিলুপ্তি নয়; নিজেকে নিশ্চিহ্ন করাও নয়। এর প্রকৃত অর্থ মনের ভেতর যে অহং প্রিয়তমের প্রেম ও সান্নিধ্য থেকে নিবেদিত আমিকে বঞ্চিত করছে। নানা দ্বন্দ্ব-দ্বিধায় জীবনকে জটিল করে তুলছে তারই মৃত্যু ঘটানো। সাধকরা অহং আমির বিলুপ্তি চান। ভক্তের আমিকে সরল পথে চালিত করবার জন্য। শাহ্ আবদুল লতিফও তাই চেয়েছেন।

কুল ইন না সালাতী ওয়া নুস্কী
ওয়া মাহ ইয়ারা ওরা মামাতী
লিললাহি রব বিল আলামীন।

আমার প্রার্থনা, আমার ত্যাগ। আমার জীবন ও মৃত্যু সমস্ত বিশ্ব-করুণাময় আল্লাহ্র জন্য। দিয়াচ ও বিজলের মর্মান্তিক করুণ কাহিনীর শেষে শাহ আবদুল লতিফ উপরোক্ত বাণীকেই রূপ দিতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন:

রাজা দিয়াচ শির পেতে নিল, মস্তক তার
আল্লাহ্র উদ্দেশে কুরবান।
পিছনে ফেলে গেল সে রাজ্যপাট বাকীদের
আল্লাহ্র উদ্দেশে কুরবান!
আল্লাহ্র দুয়ারে রাজা গৃহীত হলো
আল্লাহ্র উদ্দেশে কুরবান।
পূর্ণ তার লক্ষ আশা, সমর্পিত হল সে
আল্লাহ্র উদ্দেশে কুরবান
একতারা সঙ্গীতে শির কামনা করেছে গীতকার
আল্লাহ্র উদ্দেশে কুরবান

তাঁর সব কীর্তি কর্ম সার্থক শুভ হল শেষে
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কুরবান।
এই সুর সঙ্গীতের কথা বলে শাহ্‌ লতিফ
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কুরবান।

দিয়াচ ও বিজলের কাহিনীর ভেতর দিয়ে সাধক শাহ্‌ লতিফ তাঁর অন্তরের উপলব্ধ চিরন্তন প্রেমেরই পরিচর্যা করেছেন। অন্ধ আমি চেতনাকে সেই অবিনশ্বর একের প্রেমে উৎসর্গ করতে বলেছেন। কারণ যতক্ষণ আমি ততক্ষণই শূন্যতা। রাজা দিয়াচ যতক্ষণ অহং আমি নিয়েছিলেন ততক্ষণ তাঁর জীবন ছিল সীমিত ভোগ বাসনায় লিপ্ত হয়ে খণ্ড ও ক্ষুদ্র। কিন্তু যে মুহূর্তে মায়াময় সঙ্গীতের সুরে তাঁর এই আমি খসে পড়ল তখন থেকেই তিনি অমরলোকে প্রবেশ করলেন এবং বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। নিজের অহঙ্কারকে ভুলে অমরত্বে উত্তীর্ণ হওয়াই মানবজীবনের সাধনা ও ঈশ্বরমিলনকামী মানুষের একমাত্র কামনা। শাহ্‌ আবদুল লতিফ তাঁর জীবন সাধনা দিয়ে সিন্‌ধী সাহিত্যে তারই চূড়ান্ত রূপ রেখে গেছেন। অধ্যাত্ম ভাবরসের সম্পদে একটি ভাষাকে জনসাধারণের প্রিয় করে দিয়েছেন। সূফীবাদের অন্যতম সাধক শাহ্‌ আবদুল লতিফের কর্মকাণ্ড তাই অনন্য। আজও তিনি প্রণম্য সকল শ্রেণীর ভক্তদের কাছে।

সৈয়দ শাহ্ জালাল

বিশ্বনবী হজরত মহম্মদের শেষনবী হবার সঙ্গে সঙ্গে নবুওয়েতের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এই পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত আর কোনো নবী বা রসুল আসবেন না। কিন্তু তা বলে বন্ধ হয়ে যায় নি নবুওয়েতের প্রচার। হজরত মহম্মদের পর আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁব সম্প্রদায় থেকে যুগে যুগে এক একজন সাধুপুরুষ বা সংস্কারককে প্রেরণ করে থাকেন। তাঁরা নিজেদের তপস্যা ও সাধনা দিয়ে কুসংস্কারে আবদ্ধ ভুল পথে চালিত মানুষদের পুনরায় হজরত মহম্মদ প্রচারিত সত্য ধর্মের দিকে নিয়ে যান। হাদীস শরীফে এই কথার ইঙ্গিত দেওয়া আছে। রসুলুল্লাহ্ বলেছেন, উলামাও উম্মাতী কা—আম্বিয়া-ই বানি ইস্রাইল। আমার সম্প্রদায়ভুক্ত আলেম সম্প্রদায়গণ ইস্রাইলদের নবীদের সমান। মনে হয় এই কথা দিয়ে হজরত মহম্মদ এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন আমার মৃত্যু ঘটলেও আমার প্রচারিত ধর্মের গতি ব্যাহত হবে না। সত্যান্বেষী আলেম সম্প্রদায় যারা আমাকে অনুসরণ করে তারাই পথভ্রষ্টদের সত্যপথে নিয়ে যেতে পারবে। যদিও তারা নবী নয়, তবু আমার প্রতিনিধিরূপে নবীদের সমান কাজ করতে সক্ষম।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে: আল উলামাও ওয়ারাতুল আম্বিয়া। আলেম সম্প্রদায় নবীদের উত্তরাধিকারী। কোনো নবীর মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ জনসাধারণের অধিকারে চলে যায়। ওয়ারীশরা কিছু পায় না। কিন্তু আলেম সম্প্রদায় তাঁর জ্ঞান ও ধর্মের উত্তরাধিকার লাভ করে। আর সেজন্যই তাঁরা সত্যের মশালধারী হন। এই আলেম কে? পুঁথিগত বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জনকারীই কি সেই জন? না তা নয়। এ হল এমন এক শ্রেণীর আলেম, যিনি মাতৃহারা নবুওয়েতের জ্ঞানে জ্ঞানী এবং এক অনন্ত আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী।

জ্ঞান ও সাধনায় যাঁরা উচ্চমার্গে পৌঁছতে পেরেছেন তারাই সত্যিকারের নবীদের উত্তরাধিকারী। তারাই সাধারণ জনমণ্ডলীকে

সত্য পথ দেখাতে পারেন। সৈয়দ শাহ জালাল ছিলেন এই রকমই একজন আলেম। জ্ঞান ও সাধনাবলে তিনি কত শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন তা তাঁর জীবনের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকেই জানা যায়।

তুরস্কের ছোট এক শহরের নাম কুশিয়া। সৈয়দ শাহ্ জালাল জন্মেছিলেন এই কুশিয়া শহরেই। পিতা মোহাম্মদ ছিলেন কোয়ায়েশ বংশীয়, মা ছিলেন সৈয়দ বংশের। মা-বাবার দু কুল দিয়েই তিনি ছিলেন শরীফ বা কুলীন। শাহ্ জালালের পূর্বপুরুষরা ইয়ামনে বাস করতেন। আরব সাম্রাজ্যের বিস্তারের সময় ব্যবসার কারণে কোনো এক সময় তাঁরা তুরস্কে চলে আসেন। শাহ্ জালাল তিন মাস বয়সের সময় মাকে হারান। দুগ্ধপোষ্য অবস্থায়ই ভবিষ্যতের এই পরম সাধককে আল্লাহ্ বুঝতেই দিলেন না মাতৃস্নেহ এ জগতে কতখানি মূল্যবান।

পিতার কাছে রইলেন শিশু শাহ্ জালাল। আল্লাহ্র বোধহয় এ ইচ্ছেও ছিল না। ভবিষ্যতে যিনি তাঁর নিকটবর্তী হবেন জাগতিক মায়ার বন্ধন থেকে বের করাই হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। শাহ্ জালালের পিতা এক জেহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করেন। ধর্মযুদ্ধের ডাক মুসলমানদের কাছে অপূর্ব এক উদ্দীপনার ব্যাপার। যুদ্ধশেষে জীবিত ফিরে এলে গাজীর সম্মান পাওয়া যায় আর যুদ্ধে শহীদ হলে শাহাদাত প্রাপ্তি। যার অর্থ কোনো হিসেব বাদেই বেহেশত অর্থাৎ স্বর্গলাভ। মুসলমানরা এই দুই সম্মানেরই আকাঙ্ক্ষী যার জন্য জেহাদের নামে তারা পাগল হয়ে যায়।

একই উদ্দীপনায় শাহ্ জালালের পিতা যুদ্ধে যোগদান করেন। অসীম বীরত্ব দেখিয়ে তিনি সেই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলেন। পিছনে পড়ে রইল নবজাত শিশু, যে কিনা পরবর্তী জীবনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের আলোর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সনাতন সত্যের দিকে। শাহ্ জালাল এসে পৌঁছলেন মাতুলালয়ে। তাঁর মামা সৈয়দ আহমদ কবীর ছিলেন মস্ত এক আলেম। সাধন জগতে অতি উচ্চে তাঁর স্থান ছিল। শিশু ভাগ্নেটি হয়ে উঠল তাঁর স্নেহের পাত্র। ফলে মামার

কাছে কাছেই বড় হয়ে উঠতে লাগলো শিশু। মনে হয় সৈয়দ কবীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন, একদা এই শিশু বিরাট সাধক ও সংস্কারকরূপে তাপিত বহুজনকে মুক্তির পথ বলে দেবে। মামার কাছেই শুরু হল লেখাপড়া। প্রথমেই কোরান শরীফ দিয়ে পাঠের শুরু। মুসলমানদের কাছে কোরানই সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার— অন্যান্য সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলো উদ্ভূত হয়েছে কোরান থেকেই। বর্তমান যুগেও মুসলমানী শিক্ষায় প্রথম থেকেই কোরান পড়ান হয়।

শাহ্ জালালের ধীশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ ছিল। প্রখর মেধার সঙ্গে ছিল জ্ঞানলাভের প্রতি প্রবল আগ্রহ। মামা তাই খুশি হয়ে তাঁকে বিশেষভাবে লেখাপড়া শেখাতে উদ্যোগী হলেন। বুদ্ধিমান বালক সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগকে গ্রহণ করলেন। তাঁর পড়ার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। পরিশ্রমী বালক অল্পদিনেই কোরান, হাদীস, ফেকাহ্ ইত্যাদি সব শাস্ত্রেই পারদর্শী হয়ে উঠলেন।

কিন্তু এত জ্ঞানলাভ করেও তাঁর মানসিক তৃপ্তিলাভ হল না। জানার আগ্রহ ক্রমশ আরো বেড়ে যেতে লাগল। তাঁর মনে হতে লাগল এখনো তিনি কিছুই শেখেন নি। এই মনোভাবে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। যাঁরা সত্যিকার সাধক, মনোভাবে তাবৎ মানুষের শিক্ষাদানে ব্রতী, তাঁরা শিক্ষার্থীর মুখ দেখেই মনের অবস্থার টের পেয়ে যান। সৈয়দ আহমদ নিজে ছিলেন একজন পরম সাধক, তিনি জ্ঞান চক্ষুতে দেখতে পেলেন প্রিয় ভাগ্নের মনের পিপাসা। তাই একদিন নিজের কাছে পরম আদরে শাহ্ জালালকে বসিয়ে বললেন, আমার মনে হয় তুমি ভেতরে ভেতরে একটা অভাবের তাড়নায় ভুগছ। আর তার কারণও আমি আন্দাজ করতে পেরেছি, সত্যিই তুমি অভাবগ্রস্ত, যে তত্ত্বজ্ঞানে হৃদয়ে প্রশান্তি দেখা দেয়, অন্তর ভরে ওঠে, তা এখনো তোমাকে শেখানো হয় নি। তোমার এই অস্থিরতা, মানসিক চাঞ্চল্য তাই তোমাকে স্থিতধী হতে দিচ্ছে না। তুমি দুধ নিয়ে সাধনা করেছ, কিন্তু সেই দুধ থেকে যে কত প্রকার মিষ্টি তৈরি হতে পারে তার খোঁজ পাওনি। অথচ সেই মিষ্টির আস্বাদ পাবার জন্যই এই

ব্যাকুলতা। এস, এখন থেকে তোমার অজানা সেই মিষ্টির সন্ধানই তোমাকে দেব।

শাহ্ জালাল তখনও বয়সে তরুণ। এ বয়সে সাধারণ তরুণদের মধ্যে দেখা দেয় জীবনের প্রতি একটা উচ্ছ্বাস, আবেগ। তারা খেলাধূলা নিয়ে মত্ত থাকে। কিন্তু শাহ্ জালালের মধ্যে এর কোন চিহ্নও দেখা গেল না। তারুণ্যের প্রাবল্য, যৌবনের আবেগ তাঁর মধ্যেও ছিল কিন্তু তিনি সেই প্রাবল্য ও আবেগকে আল্লাহ্‌র জ্ঞানান্বেষণে নিয়োজিত করলেন। উচ্চমার্গের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে সংযমে বেঁধে রাখল। শ্রদ্ধাস্পদ মামার কাছে তিনি ইলমে মা' রেফাতের দীক্ষা নিলেন।

সাধন জীবন শুরু হয়ে গেল। এ সাধনার রূপই আলাদা। নীরস পরীক্ষা পাসের জন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন নয় বরং বইয়ে লেখা পাঠের নির্যাসকে আলাদা করে উপভোগ করা। যদিও এ সাধনা অনেক কঠোর তবুও এর ভেতর অনির্বচনীয় এক আনন্দ পাওয়া যায়। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে; আল্লা কি ফিকরিল্লাহি তাত্বমাইন্নুল কুলুব—অর্থাৎ মনে রেখ আল্লাহ্ চিন্তায় অন্তর পরিপ্লাবিত হয় সুখে। এ কথা বাস্তব সত্য। বহুজন কর্তৃক পরীক্ষিত। শাহ্ জালাল সেই দুরূহ সাধনায় মন দিলেন। আগে থেকেই তাঁর মনের আয়না পরিষ্কার ছিল। মা' রেফাত সাধনায় লিপ্ত হওয়ার অল্পদিন পরেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাঁর অন্তরে ঐশী প্রেম স্থায়ী হল। নূরানীর আলোকরশ্মিতে অন্তর আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি পূর্ণ সাধকরূপে সিদ্ধিলাভ করলেন।

সৈয়দ আহমদ কবীর প্রিয়দর্শন এই ভাগ্নের মানসিক উন্নতিতে আনন্দিত হলেন। তিনি মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করলেন: হে প্রভু, একে তোমার প্রিয়জনদের মধ্যে গ্রহণ কর। তোমার সেবায় নিয়োজিত কর। সে যেন সর্বদা তোমার কাজে ও চিন্তায় লিপ্ত থাকে। একে জগতের বরণীয় করে তোল। পার্থিব কোনো আসক্তি যেন তাকে সমাজ সংস্কারের কাজে বাধা না দেয়।

মামার প্রার্থনা সফল হল। শাহ্ জালাল পূর্ণতার শেষ শীর্ষে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু তখনো এ ব্যাপারে তাঁর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। দীক্ষাগুরু মামা এবার সেই পরীক্ষা নেবার জন্য অপেক্ষায় রইলেন। আল্লাহ্‌র অপার মহিমা! পরীক্ষার সেই সুযোগও এসে গেল একদিন। সৈয়দ আহমদ কবীর পবিত্র মক্কাবাসী ছিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর শাহ্ জালাল মামার কাছে এখানেই প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। এইখানেই চরম পরীক্ষার সময় এসে গেল। মক্কার অদূরবর্তী এক জঙ্গলে একটি হরিণীকে এক বাঘ তাড়া করল। হরিণীটি দিশেহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল সৈয়দ আহমদ ফকিরের কাছে। বাঘটির বিরুদ্ধে নালিশ জানাল হরিণ। সমস্ত ঘটনা দেখে কবীর ভাগ্নের ওপর বিচারের ভার দিলেন।

শাহ্ জালাল সঙ্গে সঙ্গে বনে গেলেন।

সৈয়দ আহমদ কবীর মনে মনে ভাবতে লাগলেন, কিভাবে বাঘটাকে শাস্তি দেওয়া যায়। একবার ভাবলেন ডান হাতের তিন ও বাঁ হাতের দুটি আঙুল দিয়ে চপেটাঘাতই বাঘের উপযুক্ত শাস্তি। দিব্যজ্ঞানবলে গুরুর মনের ইচ্ছে বুঝতে পারলেন শাহ্ জালাল। তিনি বাঘের কাছে গিয়ে ঠিক ওইভাবে চপেটাঘাত করে তাড়িয়ে দিলেন। এবার ফিরে এলেন তিনি। কবীর তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, বাঘটাকে কি শাস্তি দিলে?

শাহ্ জালাল সমস্ত ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন। সৈয়দ আহমদ সমস্ত শুনে কোনো উত্তর দিলেন না কিন্তু মনে মনে খুশি হলেন। উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁর ভাগ্নের পূর্ণতা লাভ হয়েছে। এবার তাঁকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত কোনো কাজ পেলেন না। ওপরের ঘটনাটা হয়তো অনেকের কাছে গল্প বলে মনে হতে পারে। অনেকেই ভাবতে পারেন হরিণ আর বাঘ বন্য পশু। মানুষের মতো তাদের কোনো আইন নেই। হরিণকে তাড়া দেওয়া বাঘের স্বভাবজাত কাজ। হরিণ তার খাদ্য। এই অপরাধে তার বিচার হাস্যকর। হরিণও বনের জানোয়ার। মানুষ

তার ভাষা বোঝে না। তাহলে সৈয়দ আহমদকে কি নালিশ করল? তিনিই বা কি বুঝলেন? বাঘ মানুষের চেয়ে হিংস্র জন্তু, তার শক্তিও বেশি। সুতরাং শাহ্ জালাল তাকে চড় মারলেন কেমন করে? এই প্রশ্ন যুক্তিবাদী মানুষ করতেই পারে। চিরকাল মানুষ যা দেখছে যুক্তি দিয়ে বুঝছে তার বাইরে কিছু বিশ্বাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যুক্তির বাইরেও অনেক কিছু থেকে যায়। ওপরের ঘটনাও তাই। অন্তরের শক্তি থাকলে যে কোনো ভাষাই বোঝা যায়। তেমনি সাধনালব্ধ অমিত শক্তি দিয়ে হিংস্র বাঘকেও চড় মারা সম্ভব। এখন যদি বলা হয় পশুরাজ্যে মানুষের আইনানুযায়ী শাস্তি দেওয়ার বিধান নেই। জেনে শুনেও কবীর কেন বাঘকে শাস্তি দিতে গেলেন? তারও উত্তর আছে। কোনো কোনো ঘটনায় সাধকের কাছে সরাসরি ভগবানের নির্দেশ আসে। সূক্ষ্মজ্ঞানযোগে আল্লাহ্ সাধককে নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারেও কবীর তেমনি নির্দেশ পেয়েছিলেন।

শাহ্ জালাল মামার কাছে কামেল (সিদ্ধপুরুষ) বলে স্বীকৃতি পেলেন। এবার সামনে বহু কর্ম পড়ে আছে। সৈয়দ আহমদ ভাবছেন। ভাগ্নের হাতে কি কাজ তুলে দেবেন। এমন সময় একদিন স্বপ্ন দেখলেন, শাহ্ জালাল। কেউ তাঁকে বলছে, হে শাহ জালাল, তোমার তপস্যা একনিষ্ঠ সাধনা ও সংযম দেখে আল্লাহতায়ালা খুব খুশি হয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় দাসদের মধ্যে তোমাকে গণ্য করে নিয়েছেন। কাজের জন্য হিন্দুস্থানের ভার আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন। সেখানকার মানুষরা পুতুল পুজো করে। কুসংস্কার ও পাপে ডুবে রয়েছে সবাই। ভগবানকে ভুলে প্রবৃত্তির দাসত্ব করছে তারা। সুতরাং তুমি যত তাড়াতাড়ি পার সেদেশে যাও, বিপথগামী মানুষকে ইসলামের জ্যোতি দেখিয়ে আল্লাহ্‌র পথে নিয়ে এস।

স্বপ্ন ভেঙে শাহ্ জালাল অবাক হয়ে গেলেন। এ কি নিছক স্বপ্ন না প্রত্যক্ষ আদেশ! সময় নষ্ট না করে মামার কাছে গিয়ে তিনি স্বপ্নের কথা খুলে বললেন। সৈয়দ শুনেই বললেন, বাবা, এত তোমার

জন্য সুসংবাদ। একে স্বপ্ন ভেব না—এই সেই পরম কল্যাণকামী আল্লাহ্‌র তোমার প্রতি নির্দেশ। ভারতের দায়িত্ব তিনি তোমাকে দিয়েছেন। খুবই ভাল হল, আমিও তোমার উপযুক্ত কাজের কথা ভাবছিলাম। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। যাও! তাহলে আর দেরী করো না। অবিলম্বে হিন্দুস্থানে গিয়ে সেখানকার পৌত্তলিকতা থেকে মানুষদের মোহমুক্ত করো। তোমার হাতে ইসলামের জয়পতাকা সেখানে উড়ুক।

শাহ্ জালাল ভারতের কিছুই জানেন না। সেখানের আবহাওয়া, পরিবেশ কোনো কিছু সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান নেই। কিন্তু তাঁকে যেতেই হবে সেই দেশে। শাহ্ জালাল ভারতের পরিচয় জানতে উন্মুখ হলেন। সৈয়দ আহ্‌মদ কবীর একাধারে মামা ও দীক্ষাগুরু। তিনি বোধ হয় ভাগ্নের মনেব কথা জানতে পারলেন। এক মুঠো মাটি হাতে তুলে নিলেন কবীর। বললেন, চিন্তা করো না বাবা, এই এক মুঠো মাটি সঙ্গে রাখ। এই মাটির বর্ণ ও গন্ধের অনুরূপ যে জায়গা চোখে পড়বে মনে করবে সেটাই তোমার কর্মস্থল। সেখানেই তুমি আস্তানা গেড়ে খোদার কাজে লেগে যাবে। যাও বাবা! এতকাল আমার কাছে ছিলে, এবার তোমাকে আল্লাহ্‌র হাতে তুলে দিলাম। সর্বাবস্থায় তিনিই তোমাকে সাহায্য করবেন। আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ তোমার সঙ্গী হোক।'

জন্মভূমি কি জিনিস তা মানুষ মাত্রেই জানে। তার আকর্ষণ কি দুর্বার। সেই দুর্বার আকর্ষণের বন্ধনকে ছিন্ন করে শাহ্ জালাল আল্লাহ্‌র নির্দেশে অজানা ভারতের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর এই যাত্রার কথা শুনে বার জন দরবেশ তাঁর সঙ্গে চলল। কামেল অলী (মহাসাধক) রূপে তিনি এর মধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন। যদিও সেই পরিচয়ের প্রতি তাঁর কোনো মোহ নেই। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে। ভারতের পথে সবচেয়ে আগে শাহ্ জালাল ইয়ামন সফর করলেন। পিতৃপুরুষদের ভিটে ছিল এ দেশে। তাই এখানে এলেন তিনি। ইয়ামনের তদানীন্তন শাসক

ছিলেন একজন চতুর রাজনীতিবিদ। যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাই তার উদ্দেশ্য ছিল। দেশের মধ্যে অবাধে মারামারি খুনোখুনি চলছিল কিন্তু এতে বাদশাহের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। মদ্যপান জুয়া ব্যভিচার ইত্যাদির ফলে সর্বত্র অরাজকতা বিরাজ করছিল। রাহাজানি ছিল সেখানকার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বাদশাহ্ এসব দেখেও দেখতেন না। অনাচার অবিচারে গোটা দেশ যখন ভরে গেছে ঠিক সেই সময় শাহ্ জালালের পদক্ষেপ পড়ল সেখানে। তাঁর আগমনের কথা শুনে একদল সত্যান্বেষী যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইল তখন বাদশাহ্ দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন। কি জানি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। যদি এই আগন্তুক সতিকার অলী হন তো প্রজাবৃন্দ তাঁর দিকে ঝুঁকে পডতে পারে তা হলে তাঁকে ধর্মের পথে ন্যায়ের ভিত্তিতে রাজ্য চালাতে হবে, না হলে পদত্যাগ করতে হবে বাদশাহ্গিরি থেকে। কোনো অন্যায়কে আর প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। অতএব এই দরবেশ বাদশাহ্র কাছে মারাত্মক অতিথি। তাই বাদশাহ্ ভাবতে লাগলেন কি করে খতম করা যায় দরবেশকে। ছলনার আশ্রয় নিলেন বাদশাহ্। সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করে সভাসদবৃন্দকে ডেকে বললেন, দেখ, সারা জীবনভর আমি পাপ করেছি পুণ্যের খাতায় শূন্য, জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। এখন ভয় হচ্ছে পরকালের কথা ভেবে। কি জানি আল্লাহ্ আমার জন্যে কি শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাই ভাবছি কোনো দরবেশ ফকিরের কাছে গিয়ে সদুপদেশ লাভ করি, দীক্ষা নিয়ে অন্তত জীবনের বাকী দিনকটা আল্লাহ্র নামে কাটিয়ে দি। শুনলাম, মক্কা শরীফ থেকে নাকি এক অলী এসেছেন ইয়ামনে। আমার ভীষণ ইচ্ছে তার কাছেই দীক্ষা নেব। কিন্তু একটা কথা কি জান। সবাই তো শুনেছে, মনে একটা দ্বিধা থেকেই যায়, সত্যিই তিনি অলী কিনা—এটা না জেনে দীক্ষা নিতেও পারছি না।

বাদশাহ্ খানিক থামলেন। সব সভাসদকে দেখলেন। তারপর

আবার বলতে লাগলেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনারা আমাকে যদি সামান্য সাহায্য করেন, তাহলে তাঁকে একবার যাচাই করি। বেশ তো! এতে আর এত কিন্তুর কি আছে। সবাই এক স্বরে বলে উঠল, আদেশ করুন আমাদের কি করতে হবে ?

আপনাদের তেমন কিছু না। শুধুমাত্র এই বিষ মেশান পানপাত্রটি আপনারা তাঁর নিকট পৌঁছে দিন। বলবেন, আপনি সাধু মহাজন, বাদশাহ্ নামদার আপনার নাম শুনে খুবই খুশি। তাই আতিথেয়তা প্রদর্শনের জন্য তিনি আপনাকে এই পানপাত্রে সামান্য শরবত পাঠিয়েছেন। অনুগ্রহ করে এই শরবত পান করুন ও তাঁর মঙ্গল কামনা করুন। ব্যাপারটা এই, যদি তিনি সত্যিকার অলী হন তবে আগে থেকেই সব কথা জানতে পারবেন এই শরবত পান করবেন না। তা না হলে এই শরবত পানেই মৃত্যুবরণ করবেন।

তাঁর মৃত্যু ঘটলে একজন ভণ্ড সাধুর হাত থেকে আমরা নিস্তার পাব।

সবাই বাদশাহ্‌র এই কথাকে যুক্তিপূর্ণ মনে করে কজন লোককে এই কাজের জন্য পাঠাল। নির্দিষ্ট সময়ে সেই লোকরা পানপাত্র নিয়ে শাহ জালালের কাছে হাজির হল। তারা বলল, হে সাধু মহাজন! আপনার খ্যাতির কথা আমরা আগে থেকেই শুনেছি এবার আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হলাম। বাদশাহ্ নামদারও আপনার সুযশ শুনেছেন। তিনি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী। রাজকাজের নানা ঝামেলায় কিছুতেই সময় করতে না পেরে এই সামান্য শরবৎটুকু পাঠিয়েছেন। দয়া করে শরবত পান করে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মঙ্গল কামনা করুন।

শাহ্ জালাল সব শুনলেন। দিব্য জ্ঞানে তিনি জানতে পারলেন বাদশাহের ছলনার কথা। পানপাত্রটি তিনি হাতে নিলেন। বললেন, আমি ফকির। ফকিরের কাছে সব কিছুই অমৃত কিন্তু প্রেরকের কাছে এটা হলাহল স্বরূপ। এই বলেই বিসমিল্লাহ্ উচ্চারণ করে তিনি সবটুকু পানীয় এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন। বিষপানেও তাঁর কিছুই

হল না। সামান্য শরীরের বিকৃতিও দেখা দিল না। বিষ বহনকারী দলটি অবাক হয়ে ফিরে চলল বাদশাহ্‌র কাছে। সেখানে গিয়ে তারা দেখল বাদশাহ আর বেঁচে নেই। শাহ্‌ জালাল যে মুহূর্তে গলায় বিষ ঢেলেছেন ঠিক তখনই তার মৃত্যু ঘটেছে। রাজ্যের সবাই এই ঘটনার কথা শুনে তো থ বনে গেল। শাহ্‌ জালালের সাধুতা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো সন্দেহ আর থাকল না।

এবার অনেকেই এসে তাঁর কাছে দীক্ষা নিল। বাদশাহ্‌র মৃত্যুর পর যুবরাজ শেখ আলীই ছিলেন সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে তাঁর মনে বৈরাগ্য দেখা দিল। রাজ্য রাজত্ব সব কিছুই তাঁর কাছে বিষের মতন মনে হল। পিতার জানাজা ও কাফন-দাফন শেষ করে তিনি হাজির হলেন শাহ্‌ জালালের কাছে। সবিনয়ে বললেন, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন। পাপময় এই জগৎ থেকে আমি মুক্তি চাই। আপনি আমার সহায় হন। আমাকে ওই চরণ তলে আশ্রয় দিন।

শাহ্‌ জালাল তাঁর কথা শুনে স্নেহ মেশান মধুর বচনে বললেন, বাবা তুমি বাদশাহর ছেলে বাদশাহই। তোমার কাজ রাজ্য পরিচালনা করা। যাও, সেই কর্তব্যে ফিরে যাও। প্রজাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে নাও। ন্যায় বিচার করো। সব কাজে আল্লাহ্‌র আইনকে তুলে ধরো। আমি দোয়া করছি, আল্লাহ্‌ তোমাকে সৎপথে রাখবেন। তোমার জীবন মঙ্গলময় হোক।

শাহ্‌ জালালের আশীর্বাদ নিয়ে শেখ আলী তাঁর কথা মতো রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর মন কিছুতেই রাজকাজে বসল না, বৈরাগ্যভাব মন থেকে গেল না। একদিন গভীর রাতে রাজ্যপাট ছেড়ে তিনি শাহ্‌ জালালের উদ্দেশে ধাবিত হলেন। চোদ্দ দিন একটানা পথ হেঁটে অবশেষে তাঁর দেখা পেলেন। শাহ্‌ জালাল শেখ আলীকে ভাল করে দেখেই বুঝতে পারলেন। এর দ্বারা রাজকাজ এরপর অসম্ভব। যুবকের হৃদয়ে যে আগুন জ্বলেছে তা নেববার নয়।

সংসারের প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি নেই। অতএব সংসারের মায়াজালে একে বন্দী করে রাখা অনুচিত। একথা চিন্তা করে শাহ্ জালাল তাঁকে দীক্ষা দিলেন। শিষ্য হয়ে শেখ আলী গুরুর সঙ্গেই চললেন। রাজ্য রাজত্ব সিংহাসন পদমর্যাদা সব পেছনে পড়ে রইল। শেখ আলী নির্মোহ। আল্লাহ্‌র প্রেমে সব মোহই তার কেটে গেছে।

সঙ্গীসহ শাহ জালাল ভারতের দিকে রওনা দিলেন। এই সঙ্গীদের মধ্যে প্রধান তিনজনের নাম হাজী ইউসুফ, হাজী দরিয়া ও হাজী খলিল। যাত্রার পূর্বে সৈয়দ আহমদ কবীরের দেওয়া মাটিটুকু শাহ জালাল এক সঙ্গীর কাছে দিয়েছিলেন। এই সঙ্গী দরবেশ পরবর্তী জীবনে চাশনি পীর নামে খ্যাত হন।

চলতে চলতে সঙ্গী সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আল্লাহ্‌র অলীর সংস্পর্শে আসবার জন্য ব্যাকুল মানুষের দল এগিয়ে আসে। ভ্রমণকালে বিভিন্ন জায়গা হয়ে শাহ্ জালাল তাঁর নির্দেশিত দেশে চলেছেন। রোম বাগদাদ সমরকন্দ কিরমান শাহ্ আফগানিস্থান গজনী মুলতান আজমীঢ় নার্নুল ইত্যাদি স্থান ঘুরে ঘুরে তিনি দিল্লীর মাটিতে পা দিলেন। এই সময়ে শিষ্য সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে সৈয়দ ওমর করিমদাদ নিজামুদ্দিন শাহ গাবরু জাকারিয়া শাহ দাউদ মখদুম জাফর সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ জুয়ায়েদ মোহাম্মদ শরীফ সৈয়দ কাসেম হেলিমুদ্দিন প্রভৃতি অলীরা ছিলেন।

শাহ্ জালাল পথ চলেছেন। নিরন্তর চলা। তাঁকে ভারতের মাটিতে পৌছতে হবে এটাই আদেশ। সেখান থেকে পৌত্তলিকতার অভিশাপ দূর করে পবিত্র ইসলামের বিজয় পতাকা ওড়াতে হবে। কোনোরকম যানবাহন নেই, সম্বল শুধু দুটি পা। সেই পায়ের ওপর ভরসা করে আর আল্লাহ্‌র কৃপা মাথায় করে শাহ জালাল রাস্তায় নেমেছেন। জীবন যায় যাক, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। শিথিলতা থাকলে চলবে না। ধর্মীয় কাজে আলসেমীর স্থান নেই। কখনও দিগন্তজোড়া তপ্ত বালুকারাশি, কখনও বা দুর্ভেদ্য জঙ্গল, আবার সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, কখনো বা জলাশয়—এসব পেরিয়েই

সঙ্গীদের নিয়ে তিনি চলেছেন। কখনো রোদ কখনও বৃষ্টি। শীত গ্রীষ্ম ঋতুকে তুচ্ছ করে আল্লাহ্‌র বন্দনা গান কণ্ঠে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। দিনের শেষে রাতের মতো বিশ্রাম কোনো মসজিদের উন্মুক্ত চত্বরে; আবার আশ্রয় নিয়েছেন বেদুইনের তাঁবুর ভেতরে। কোনো কিছুতেই তিনি চিন্তিত নন। আপন মনে তসবীহ্ জপ করছেন আবার সময়মতো শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন। কি অসীম ধৈর্য! কি অগাধ বিশ্বাসের সঙ্গে গুরুর আদেশ পালন।

দিল্লীতে তখন নিজামুদ্দিন আউলিয়া বিখ্যাত অলী। যেমন তাঁর ভক্ত সংখ্যা, তেমনি তাঁর নাম। শাহ্ জালাল দিল্লীতে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে এক ভক্ত নিজামুদ্দিনকে খবর দিল, হুজুর সুদূর মক্কা থেকে এক দরবেশ এখানে এসেছেন। তাঁর শিষ্যরা বলছে, তিনি নাকি কামেল আলী। বিয়ে-থা করেন নি। রমণী সঙ্গ পছন্দ করেন না। এমন কি জেনানাদের মুখও দেখেন না। পথ চলাকালে এ কারণে মুখ ঢেকে নেন। একটি বাচ্চা ছেলে আছে সঙ্গে। সেই তাঁর সব কাজ করে দেয়।

শিষ্যের মুখে আগন্তুক দরবেশের কথা শুনে নিজামুদ্দিন সন্দেহের দোলায় দুললেন। এই ব্যক্তি সত্যিকার অলী না ভণ্ড সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। একজন ভক্তকে দিয়ে শাহ্ জালালকে তিনি নিজের আস্তানায় নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। দিব্যজ্ঞানের অধিকারী শাহ জালালের কাছে এই সন্দেহর চিন্তা অবিদিত রইল না। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার নিমন্ত্রণের জবাবে তাই তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে একটি কৌটোর মধ্যে পাশাপাশি কিছু তুলা ও জ্বলন্ত অঙ্গার পাঠিয়ে দিলেন।

ভক্ত শিষ্য কৌটোটি এনে নিজামুদ্দিনের হাতে দিল। কৌটো খুলতেই বিস্মিত নিজামুদ্দিনের চোখ বড় হয়ে গেল। একি দেখছেন তিনি! তুলা আর জ্বলন্ত অঙ্গার পাশাপাশি, অথচ তুলার গায়ে একটুও আগুন লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে নিজামুদ্দিন বুঝতে পারলেন। এ তাঁর অন্যায় সন্দেহর উপযুক্ত উত্তর। শাহ্ জালাল পৃথিবীর

পাপতাপের মধ্যে থেকেও নিষ্কলুষ। নির্দোষ চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র এক পুরুষ। নিজের অন্যায় সন্দেহর জন্য অনুতাপানলে পুড়তে লাগলেন আউলিয়া। মুহূর্তমাত্র দেরী না করে তিনি নিজে ছুটলেন শাহ্‌ জালালের কাছে।

শাহ্‌ জালাল যেন এরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুই অলীর সেই মহামিলন ভক্তদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে এক মহা আনন্দে ভরিয়ে দিল। তাঁরাও দাঁড়িয়ে দুজনকে সম্মান দেখালেন। মিলনপর্ব ও অভ্যর্থনা শেষ হলে নিজামুদ্দিন আপন অন্যায় সন্দেহর জন্য ক্ষমা চাইলেন। প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুজনই দুজনের গভীরতা উপলব্ধি করলেন।

মজির কদর বাদশাহ্‌ জানে আর জানে তা জহুরী,
জানে বুলবুল ফুলের কদর আর জানে সে শাহাপুরী।

গুণীরা একে অন্যের গুণগান না করে পারেন না। বিশেষ করে যারা একই পথের পথিক। জালাল নিজামুদ্দিন একই আল্লাহ্‌র অলী—উভয়ে প্রেমের পথের পথিক। দুজনের হৃদয়েই প্রজ্বলিত হয়েছে ঐশী ভালবাসার উজ্জ্বল আলো। নিজামুদ্দিন শাহ্‌ জালালকে আপন আস্তানায় আমন্ত্রণ জানালেন। শাহ্‌ জালাল সানন্দে তা গ্রহণ করলেন। সশিষ্য তিনি নিজামুদ্দিনের আস্তানায় গেলেন। আস্তানাটি আল্লাহ্‌র সেবকদের পদধূলিতে পবিত্র হয়ে উঠল। রাত দিন চলল ধ্যান ও ধর্মালোচনা। যে কদিন শাহ্‌ জালাল দিল্লীতে ছিলেন সে কদিন তিনি আর অন্য কারো আতিথ্য গ্রহণ করেন নি।

বিদায়ের দিন এগিয়ে এল। বিদায়কালীন নিজামুদ্দিন শাহ্‌ জালালকে এক জোড়া কবুতর উপহার দিলেন। শাহ্‌ জালালের নামানুসারে এই কবুতরগুলি জালালী কবুতর নামে অভিহিত হয়। শাহ্‌ জালালের দরগাহ ছাড়াও সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় এখনও এই শ্রেণীর পায়রা দেখা যায়। কোনো হিন্দু বা মুসলমান তাদের হত্যা করে না। মানুষের মনের বিশ্বাস এই কবুতর হত্যা করলে অমঙ্গল

দেখা দিতে পারে। তাদের মনের আরো বিশ্বাস, যদি কোনো জালালী কবুতর নিজে থেকে এসে কারো বাড়িতে বাসা বাঁধে তো তার সমৃদ্ধির দিন সমাগত। তেমনি আবার যদি কোনো বাড়ি থেকে জালালী কবুতর বাসা ভেঙে চলে যায় তাহলে সেই ব্যক্তির সুদিনের শেষ হয়েছে। হিন্দু মুসলমান সকলেরই প্রায় একই ধারণা। যে কোনো কারণেই হোক এই ধারণাটি চলে আসছে বহুদিন ধরে। শাহ জালাল তাঁর মহামানবত্ব দিয়ে এই শ্রেণীর পায়রাকে নতুন এক মর্যাদা দান করেছিলেন। ধন্য সাধক তিনি।

দিল্লী ছেড়ে বিহারে গিয়ে পৌঁছলেন শাহ জালাল। এখানেও একদল মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করল। এরপর তিনি আজকের বাংলা দেশের সপ্তগ্রামে এসে পৌঁছলেন। সপ্তগ্রামের শাসক তখন একজন মুসলমান নরপতি। তিনি এই মহাতাপসকে স্বরাজ্যে বরণ করে নিলেন। স্থায়ীভাবে তাঁকে থাকতে বললেন। শাহ জালাল রাজী হলেন না। গুরুর দেওয়া সেই মাটির মতো স্বাদ গন্ধ বর্ণমুক্ত মাটি না পাওয়া পর্যন্ত কোথাও তিনি স্থায়ী আস্তানা গাড়তে রাজী নন।

এখনকার বাংলাদেশের সিলেট জেলার পুরনো নাম শ্রীহট্ট। এই শ্রীহট্টের টুলটিকর পাড়ায় বোরহানুদ্দীন নামে এক মুসলমান বাস করতেন। তিনি ছিলেন নিতান্ত ধার্মিক। তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না। প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও মনে তাঁর শান্তি ছিল না। নিয়মিত নামাজ পড়তেন। আল্লাহ্‌র কাছে আকুল হয়ে একটি পুত্রের জন্য প্রার্থনা জানাতেন। একদিন তিনি মানত করলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি করুণা করলে তিনি একটি গরু কোরবানি করবেন। হয়তো এই মানত আল্লাহ্‌র কানে পৌঁছল। অসীম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে বোরহানুদ্দীনের স্ত্রী সন্তানবতী হল। বোরহানুদ্দীন খুব খুশি। আনন্দে ভরাট হয়ে গেল শূন্য বুক। একদিন অপেক্ষার শেষ হল। বোরহানুদ্দীন পুত্রের পিতা হলেন। ফুটফুটে শিশু, যেন আসমানের চাঁদ তাদের ঘরে এসে পড়েছে।

বুরহানউদ্দীনের এই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। দুনিয়ার সমস্ত সুখ দুঃখ আল্লাই নিয়ন্ত্রণ করেন। এর পেছনে তাঁর নিগূঢ় উদ্দেশ্য লুকনো থাকে, যা মানুষ বুঝতে পারে না। বুরহানউদ্দীনের দুঃখে সকলেই সমব্যথী হল কিন্তু তারা বুঝবে কি আল্লাহতালার ইচ্ছে। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান লাভ করেও সন্তান না থাকার ব্যথা তাকে বয়ে বেড়াতে হল। আল্লা ছেলেটিকে টেনে নিলেন নিজের কাছে।

অশান্তির হাওয়া তাড়িয়ে নিয়ে চলল বুরহানউদ্দীনকে। পুত্র হারিয়ে পাগলের মতো হয়ে গেল সে। সেই সঙ্গে তার একটা হাত জখম হল। খোদার কাছে ফরিয়াদ ভিক্ষা করল সে। পথে পথে কেঁদে বেড়াল।

সবাই মৌখিক সান্ত্বনা জানায় তাকে কিন্তু শান্তি দিতে পারে না। শান্তির সন্ধানে বুরহানউদ্দীন দৌড়ে বেড়াল এদিক ওদিক। এমনি করে দিন যায়। পৃথিবীর বয়স বাড়ে। সৈয়দ শাহ্ জালাল তখন দিল্লী থেকে এলাহাবাদ পৌঁছেছেন। এই দীর্ঘ পথে মানুষ অবাক হয়ে আল্লার আলীকে দেখেছেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। এলাহাবাদে তিনি কিছু দিন থাকলেন।

নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, খাদ্য-দ্রব্য নতুন। সৈয়দ শাহ্ জালাল ও তাঁর অনুগামীরা এই আবহাওয়ায় অভ্যস্ত নন। কোথায় আরব আর কোথায় হিন্দুস্থান। কিন্তু খোদার আদেশে সব সইয়ে নিতে হবে। খোদার বাণী প্রচারই তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

ভারতবর্ষে তখন তুর্কী তুঘলক সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে আসীন। তিনি ন্যায় ধর্ম বিস্তারে মনোযোগী। সৈয়দ শাহ্ জালাল যখন এলাহাবাদে তখন একদল তুর্কী সৈন্য দিল্লী থেকে সেখানে এল। তারা যাবে পূর্বদেশে।

গৌড়ের বিচক্ষণ শাসক শামসুদ্দীন পরলোকগমন করেছেন। তাঁর শূন্য জায়গায় পুত্র সিকান্দর শাহ্ সুলতান হয়েছেন। কিন্তু রাজ্যে শৃঙ্খলা নেই। দিল্লীর সুলতান গৌড়ের দিকেই সৈন্য পাঠিয়েছেন। সৈন্যরা ভারতের পূর্ব সীমান্ত কাছাড়ে যাবে।

সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক সৈয়দ শাহ্ জালালের নাম শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। সামান্য আলাপেই সৈন্যাধ্যক্ষ অনুরক্ত হয়ে পড়লেন এই সাধকের। এমন দৃঢ়চেতা নিষ্পাপ মানুষ তিনি এর আগে দেখেন নি।

সৈন্যদের এলাহাবাদ ছাড়বার সময় এল। তারা এবার রওনা দেবে। হঠাৎ শাহ্ জালাল তাদের সঙ্গে চললেন পূর্বদেশে। দীর্ঘপথ, বন্ধুর রাস্তা। ফকিরের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সৈন্যদের মতোই তিনি পথ চলতে লাগলেন।

বহু রাস্তা অতিক্রম করে সমগ্র দল সিলেটে এসে পৌঁছাল। সুন্দরী সিলেট যেন বরণীয় এই মহান সাধককে বরণ করে নিল। সিলেট পৌঁছবার কিছুদিনের মধ্যেই সৈয়দ শাহ্ জালালের নামের সৌগন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল।

দলে দলে লোক আসতে লাগল। সকলেই শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ল সৈয়দ জালালের পদতলে। অস্থায়ী আস্তানা গেড়ে তিনশ এগার জন সঙ্গী নিয়ে সিলেটেই বসবাস করতে লাগলেন। বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

সৈয়দ শাহ্ জালাল তাঁর সাধনা নিয়ে বসে আছেন। তিনি স্থির করতে পারছেন না এরপর কোথায় যাবেন বা কি করবেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ কি অন্তরে তার উত্তর পাচ্ছেন না। অপেক্ষা করে আছেন যদি কোনো নির্দেশ আসে।

নানা লোকের সঙ্গে একদিন শোকসন্তপ্ত বুরহানউদ্দীন শাহ্ জালালের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কোথাও শান্তি খুঁজে পায় নি সে। যদি এই সাধক তাঁর তাপিত হৃদয়কে ঠাণ্ডা করতে পারে।

সত্যিই তাই হল। বুরহানউদ্দীন সৈয়দ শাহ্ জালালের স্নেহ পেল। তিনি বুরহানউদ্দীনকে আশ্রয় দিলেন ও তার মন থেকে এতকালের পুষে রাখা দুঃখকে দূর করে দিলেন। বুরহানউদ্দীন এই মহান সাধকের আশীর্বাদ পেয়ে আল্লার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করল। আল্লার ইচ্ছায় ভারতে এসেছিলেন পরম সাধক সৈয়দ

শাহ্ জালাল। কিন্তু বিরাট দেশের কোথায় অবস্থান করবেন তিনি? কোথা থেকে তাঁর সেবাকর্মকে শুরু করবেন?

দীর্ঘদিন কেটে গেছে পথে ঘুরে ঘুরে। অস্থায়ীভাবে বহু জায়গায় শাহ্ জালাল কাটিয়েছেন। সর্বত্রই তাঁর মহৎ চরিত্র সাধু আচরণ ও আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদন দৃষ্টান্তের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল শ্রেণীর মানুষের ভালবাসা তিনি লাভ করেছেন সমানভাবে।

কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারেন নি। কিছুদিন এক জায়গায় কাটিয়েই অন্যত্র রওনা দিয়েছেন। নানা দেশ ঘুরে সিলেটে এসে এবার তিনি ভাবছেন এরপর কোথায় যাওয়া যায়। শাহ্ জালাল এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। কোথায় তাঁর কর্মক্ষেত্র হবে, কিভাবে তিনি আরব্ধ কাজ শুরু করবেন এইসব ভাবনা নিয়েই কিছুদিন কেটে গেল।

হঠাৎ শাহ্ জালালের মনে পড়ে গেল মামার দেওয়া এক মুঠো মাটির কথা। গুরুরূপী মামা বলেছিলেন, হিন্দুস্থানের যেখানে এই বর্ণ গন্ধ যুক্ত মাটি পাবে জানবে সেটাই তোমার কাজের জায়গা। সেখানেই স্থায়ী আস্তানা গাড়বে তুমি। শিষ্য চালনী পীরকে তখনই সেই মাটি তাঁর কাছে আনতে বললেন। মাটি নিয়ে এলেন চালনী পীর। শ্রীহট্টের মাটির সঙ্গে মেলানো হল সেই মাটি। কি আশ্চর্য! দুই মাটি এক হয়ে মিলে গেল। আনন্দে আর খুশিতে শাহ্ জালালের বুক ভরে উঠল। এতদিনে তিনি তাঁর কর্মস্থল খুঁজে পেয়েছেন। আল্লাহ্‌কে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালেন সঙ্গে সঙ্গে। ভ্রমণের শেষ হল এতদিনে। এবার কর্মের আরাধনা। তিনি স্থায়ীভাবে শ্রীহট্টে আস্তানা গড়ে তোলবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

শাহ্ জালাল যে সময়ে শ্রীহট্টে স্থায়ী আস্তানা গড়ে তোলবার সিদ্ধান্ত নিলেন ঠিক তার আগে শ্রীহট্ট ছিল হিন্দু রাজা শাসিত একটি ভূখণ্ড।

শাহ্ জালালের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহট্টে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে এবং সেখানে মুসলমান আধিপত্য প্রভাব বিস্তার করে।

দিল্লীর যে তুর্কী সৈন্যদলের সঙ্গে শাহ্ জালাল শ্রীহট্টে এসেছিলেন তারাই ওই রাজ্য অধিকার করে।

শাহ্ জালাল ওই সেনাদলে এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে তারা শ্রীহট্ট দখলের পর তাঁকেই কে শাসক হবে তা স্থির করে দিতে অনুরোধ করে। এই অনুরোধ তিনি রক্ষা করলেন। শ্রীহট্ট আসবার সময় যে সব দরবেশ ফকিরকে তিনি সঙ্গে এনেছিলেন তার মধ্যে একজন ছিলেন নূরুল হুদা আবুল কারামত সাঈদী হোমায়ষী। তিনি একাধারে ছিলেন বিচক্ষণ, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র পরম ভক্ত। তাসাউফ সাধনায় তিনি অনেক উচ্চমার্গে উঠেছিলেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, শাসন দক্ষতা ও রাজকাজ পরিচালনাতেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। শাহ্ জালাল তাঁর হাতেই শ্রীহট্টের শাসনভার তুলে দিলেন। পরবর্তীকালে উনিই হায়দার গাজী নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। শাসনভার অর্পণের পর শাহ্ জালালের চিন্তাও কিছুটা প্রশমিত হল। এবার তিনি নিজের আস্তানা তৈরিতে মন দিলেন। পাহাড়ের উঁচু এক টিলায় তাঁর হুজরা গড়ে উঠল। নির্জন পরিবেশ, নীরব সাধনার জন্য এই জায়গাটি উপযুক্ত। এখানেই তিনি ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হতেন। আমৃত্যু তিনি এই আস্তানায় কাটিয়েছিলেন।

ভ্রমর যেমন ফুলের গন্ধ পেয়ে মুগ্ধ হয়ে চারদিক থেকে ছুটে এসে ফুলের কাছে গুনগুন করে, তেমনি শাহ্ জালালের সাহচর্য ও উপদেশ পাবার জন্য চারদিক থেকে দলে দলে পিপাসার্ত মানুষ এসে জুটতে লাগল। তিনি ছিলেন সদাহাস্যময় দরবেশ। যখন কথা বলতেন তখন মনে হত যেন তাঁর কণ্ঠ থেকে মধু ঝরে পড়ছে। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আকর্ষিত হয়ে বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করল। শাহ্ জালাল যে দায়িত্বভার কাঁধে নিয়ে ভারতে এসেছিলেন, সে দায়িত্ব পালন করা তাঁর একার কাজ নয়। তাই তিনি সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত পূর্ণ শিষ্যগণকে ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভক্ত শিষ্যরা গুরুর আদেশ মাথায় নিয়ে যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় ধর্মপ্রচার করে বেড়াতে

লাগলেন। কোথাও কোনো জটিলতা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তা গুরুর গোচরীভূত করতেন। গুরু স্নেহভরে সেইসব জটিলতার সমাধান করে দিতেন সহজ উপায়ে। সিলেটের নানা জায়গায় এইসব ভক্তদের মাজার আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীহট্টের মতো আর একটি হিন্দু রাজা শাসিত রাজ্য ছিল তরফ। তরফের শাসনকর্তা শ্রীহট্টের মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নিজেকে অসহায় বোধ করলেন। তরফে তখন শাহ্ জালাল তাঁর অনুগামী দল থেকে বার জনকে বেছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। ইসলামের মহৎ বাণী সেখানে ঘরে ঘরে প্রচারিত হওয়ায় রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন। ভিন্ন রাজাকে নিরাপদ ভেবে তিনি সপরিবারে ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিলেন। তরফও মুসলমান অধীনতা মেনে নিল। এই ঘটনায় স্থানীয় মুসলমানরা খুব খুশি হয়ে উঠল। তরফও শ্রীহট্টের মতো বিনা রক্তপাতে মুসলমান শাসনে চলে এল। মুসলিম জনগণ আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি তুলে দরবেশ ও সৈন্যদের অভ্যর্থনা করল। শাহ্ জালালের মানসিক বিজয় এর ফলে এদেশে তাঁর নাম ঘোষিত হল এক বিজয়বার্তার মধ্যে। পুনরায় মুসলিম দরবেশদের আন্তরিকতায় এই রাজ্য নতুন করে প্রাণ পেল। বারো জন দরবেশ শাহ্ জালালের নির্দেশে স্থায়ীভাবে ওখানে থেকে গেলেন। আস্তানা বানিয়ে ওখান থেকেই ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। এইজন্য আজও তরফকে বলা হয় বারো আউলিয়ার দেশ।

শাহ্ জালালের রাজনীতি ছিল ধর্মভিত্তিক। ধর্মের আলোয় তিনি তাঁর রাজনীতির রূপ দিলেন। ইসলাম তথা আল্লাহ্র আইন তাঁকে মনের মধ্যে যেভাবে নির্দেশ দিত, তিনি সেই ভাবেই রাজনীতির রূপরেখা টানতেন।

ধর্ম আর রাজনীতিকে একই সঙ্গে প্রয়োগের মধ্যে তাঁর দূরদর্শিতা ছিল। রসূলুল্লাহ্ ঠিক একই আদর্শকে বহন করে গেছেন। রাজনীতিকে আলাদা করে দেখেন নি। বরং সব সময়েই শিক্ষা দিয়েছেন রাজনীতি ধর্মেরই একটা অঙ্গ। রাজনীতির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবের

কল্যাণ সাধন করা যায়। ধর্ম আর রাজনীতির উদ্দেশ্যও তো প্রায় এক। আরেক দিক দিয়ে দেখলে রাজনীতি ও ধর্মকে আলাদাভাবে ব্যবহার করা যায় না। দুটোর সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই যে নীতি তাকেই পরিপূর্ণ ইসলাম বলা যায়। এই দুই একত্র হওয়ার জন্যই পুরানো পৃথিবীর মানুষরা এত তাড়াতাড়ি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নবীন পৃথিবী গড়ে তুলেছিল। ধর্মনীতি ও রাজনীতির সমান ব্যবহারে ইসলামের বিজয় রথ মাত্র আশি বছরের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এত দ্রুত বোধ হয় অন্য কোনো ধর্মই বিস্তার লাভ করে নি।

সৈয়দ শাহ্ জালাল শুধু সাধক ছিলেন না। তিনি ছিলেন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিশ্বমানবের কল্যাণকামী, অসাধারণ একজন সাধক। তাই এত বড় সাধক হয়েও প্রয়োজনে তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন নি। আবার রাজনীতির প্রয়োজন শেষ করেই নিজের পথে ফিরে গেছেন। উভয়নীতিকে খুব সহজে শাহ্ জালাল মেশাতে পেরেছিলেন তার ফলে শ্রীহট্ট ও তরফ বিজয়ে মুসলমানদের কোনো রক্তপাতই করতে হয় নি। খুব সহজেই ওখানে মুসলমান শাসন কায়েম হয়েছে। নেতা নির্বাচনও করেছেন শাহ্ জালাল তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতেই। তাদের হাতে ভবিষ্যৎ শাসন ভার তুলে দিয়েছেন।

ইবনে বতুতা ইতিহাস বিখ্যাত পর্যটক। তিনি পায়ে হেঁটে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর লেখা বিবরণী থেকে জানা যায়, পবিত্র মক্কায় হজ ব্রত পালনকালে তাঁর দেশ ভ্রমণের বাসনা মনে জাগে। ধর্মীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন পৃথিবীর পথে পথে। সৌদী আরব, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, মরক্কো, ইয়ামন, তুরস্ক, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জাভা, সুমাত্রা এইসব দেশ ভ্রমণ করেন। দেশ ভ্রমণ শুরু করেন যখন তখন সবে যুবক মাত্র ইবনে বতুতা—ভ্রমণ শেষ করে নিজের দেশে যখন ফিরে যান, তখন তাঁর বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমা শেষ করতে চলেছে। এই থেকে স্পষ্ট কত দীর্ঘদিন তিনি পর্যটনের মধ্যে কাটিয়েছেন এবং পর্যটন তাঁর কাছে কত প্রিয় ছিল।

শাহ্ জালাল যখন তাঁর সাধনা ও ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যস্ত, তখন হিন্দুস্থান ভ্রমণে এসেছিলেন ইবনে বতুতা। মাত্র দুখানা পায়ে ভর করে সমস্ত ভারতবর্ষ তিনি চষে বেড়ান। ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে সাত-গাঁওয়ে এসে পৌঁছান। এই স্থানে এসেই স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে তিনি সৈয়দ শাহ্ জালালের মাহাত্ম্য ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শুনতে পান। শুনেই এই পরমপুরুষকে দেখবার জন্য ভীষণ এক আগ্রহ দেখা দিল তাঁর মনে। দীর্ঘ একমাস পায়ে হেঁটে তিনি কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলের কোনো এক স্থানে পৌঁছলেন। দিব্যজ্ঞানী শাহ্ জালাল বতুতার আগমন টের পেয়ে যান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চারজন অনুচরকে ইবনে বতুতা যেখানে ছিলেন, সেই জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। বললেন: এখানে যাও, দূরদেশীয় একজন পর্যটক আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসছেন. তাঁকে স্বাগত জানিয়ে পথ দেখিয়ে আমার কাছে নিয়ে এস। আজ্ঞা পেয়ে অনুচররা রওনা হলেন। চারদিন পথ হাঁটার পর তাঁরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন ইবনে বতুতাকে। শাহ্ জালাল অনুচরদের বলে দিয়েছিলেন, আগন্তুকের চেহারা ও রূপের কথা। তাই এক নজর দেখেই তাঁকে চিনতে কোনো অসুবিধে হল না। ইবনে বতুতা সেই চারজন দরবেশের পরিচয় জানতে চাইলেন।

তারা বললেন, শ্রীহট্টের সাধক শাহ্ জালাল তাঁদের গুরু। তিনিই চারজনকে ইবনে বতুতার কাছে পাঠিয়েছেন, তাঁকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। উত্তর শুনে পর্যটক অবাক হলেন। যাকে জীবনে তিনি দেখেন নি, জানেন না, তিনি কি জন্য এসেছেন সেই কারণও তাঁর কাছে অজ্ঞাত অথচ তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে এই চারজন দরবেশকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কি করে এমন সম্ভব হল ইবনে বতুতা বুঝতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝলেন এই ব্যক্তি সেই কামেল অলী, এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। মনের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল ইবনে বতুতার। তিনি তখুনি দরবেশদের সঙ্গে শাহ্ জালালের কাছে রওনা দিলেন।

দীর্ঘ পথযাত্রা শেষ করে তাঁরা শ্রীহট্টে পৌঁছলেন। শাহ্ জালাল ইবনে বতুতাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অভ্যর্থনা জানানোর পর দুজনের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল। শাহ্ জালাল প্রথমে কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করে ইবনে বতুতার ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা খোঁজখবর নিলেন। ইবনে বতুতা তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। তিনি শাহ্ জালালের সৌজন্য ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরবর্তী জীবনে স্বদেশে ফিরে বহু ব্যক্তির সঙ্গে আলাপের সময় বিখ্যাত এই পর্যটক শাহ্ জালালের নাম উল্লেখ করতেন। প্রথম দিন সাক্ষাতের সময় ইবনে বতুতা শাহ্ জালালের গায়ে একটি ছাগলের চামড়ার জোব্বা দেখতে পেয়েছিলেন। বিদায় নেবার আগের দিন তাঁর মনে হয়েছিল শাহ্ জালাল যদি জোব্বাটি তাঁকে দান করেন তো তিনি ভক্তিভরে তা গায়ে দেবেন। কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে তিনি বলতে পারলেন না।

বিদায় সময় আসন্ন হল। বিদায় নিয়ে শাহ্ জালালের কাছ থেকে ইবনে বতুতা বাইরে এলেন। একজন শিষ্য এসে তাঁর হাতে জোব্বাটি দিয়ে বললেন, শাহ্ জালাল এই জোব্বাটি আপনাকে দান করেছেন। আপনি যেদিন এখানে এসেছেন সেইদিন থেকেই তিনি এটি পরে-ছিলেন। জোব্বাটি তৈরির সময় তিনি বলেছিলেন, তাঁর দোস্ত বুরহানউদ্দীন মাগরবীর জন্যই জোব্বাটি বানানো হয়েছে। মাগরবী এখন চীনদেশে আছেন ও সেখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করছেন। তিনি এও বলেছিলেন, ইবনে বতুতা নামে একজন পর্যটক তাঁর কাছে আসবেন এবং জোব্বাটি তাঁর পছন্দ হবে, মনে মনে জোব্বাটি তিনি পেতে চাইবেন কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারবেন না। আমি জোব্বাটি তাঁকেই দিয়ে দেব। তারপর একসময় জোব্বাটি বুরহানুদ্দীন পেয়ে যাবে। ইবনে বতুতা বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, জোব্বাটি তিনি যখন আমাকে দিয়েছেন তখন এটি আমি আর কাউকেই দান করব না। দেখব কেমন করে বুরহানুদ্দীন মাগরবী এটি লাভ করেন। এই কথা বলে জোব্বাটি নিয়ে তিনি পুনরায় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

সুদীর্ঘকাল ভ্রমণের পর তিনি চীনদেশে গিয়ে পৌঁছলেন। চীনের খাবসা শহরের রাজা ছিলেন অত্যন্ত সুচতুর। জোব্বাটি তাঁর খুব পছন্দ হল। তিনি কায়দা করে জোব্বাটি ইবনে বতুতার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। জোব্বাটি হারিয়ে যাওয়ায় ইবনে বতুতা খুবই কষ্ট পেলেন। কিন্তু বিদেশে তাঁর কিছু করার ছিল না। তিনি নিজের পথে চলে গেলেন। পরের বছর হঠাৎ কেন যেন তাঁর মনে হল বুরহানুদ্দীন মাগরবীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন। ইচ্ছে মতো তিনি একদিন সফর করতে করতে বুরহানুদ্দীনের আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। বুরহানুদ্দীনের সামনে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া জোব্বাটির মতো একটি জোব্বা পরে বুরহানুদ্দীন কোরান শরীফ পাঠ করছেন। ইবনে বতুতা সামনে গিয়ে বার বার হাত দিয়ে জোব্বাটি পরীক্ষা করছিলেন। তাই দেখে মাগরবী জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? জোব্বাটি কি আপনার পরিচিত?

বতুতা বললেন, তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু ভাবছি কি করে এটা আপনার কাছে এল?

মাগরবী তখন শাহ্ জালালের লেখা একটি চিঠি দেখিয়ে বললেন, জোব্বাটি আমার দোস্ত শাহ্ জালাল আমার জন্য তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু এতদিন তিনি তা আমাকে দিতে পারেন নি। কারণ আমরা কেউই আমাদের কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করে যেতে পারি নি। এই চিঠিতে তিনি লিখে পাঠিয়েছেন কিভাবে এটা পাব।

ইবনে বতুতা এবার চিঠিটা পড়তে লাগলেন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল, কবে ইবনে বতুতা সফরে যাবেন, শাহ্ জালালের সঙ্গে দেখা করবেন। জোব্বাটি তিনি মনে মনে প্রার্থনা করবেন, তারপর খারসার বিধর্মী রাজা কিভাবে সেটা কেড়ে নেবে এবং শেষ পর্যন্ত কেমন করে তা মাগরবীর কাছে পৌঁছবে এসব কথাই ওই চিঠিতে রয়েছে। শাহ্ জালালের দিব্যজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে ইবনে বতুতা তাজ্জব বনে গেলেন। পরম শক্তিধর এই সাধকের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর মাথা নত হয়ে গেল।

ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা অলী বা আউলিয়াদের কারামত বা অলৌকিকত্বকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। মোজেয়া, কারামত ও এস্তেদরাজ।

নবী ও রসূলদের দ্বারা প্রকাশিত অলৌকিকত্ব হল মোজেয়া। আল্লাহ্‌র অলীরা যেসব অলৌকিক কাজকর্ম করেন তা কারামত। অবিশ্বাসী জনগণের মনে নবুওত ও বেলায়েতের প্রভাব বিস্তার করে তাদের আল্লাহ্‌র পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই এই বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়ে থাকে। আপন স্বার্থসিদ্ধি বা যশলাভের জন্য নয়। একদল শয়তানও কোনো কোনো অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে, তাকে বলা হয় এস্তেদরাজ। অলীরা তাই জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দিতেন, মানুষকে না জেনে শুধু তার অলৌকিকত্বে মুগ্ধ হয়ে দীক্ষা নিও না। এইভাবে শয়তানরা সরল মানুষদের বিপথগামী করে।

শাহ্‌ জালাল ছিলেন পরম সাধক। তাঁর স্থান ছিল খুবই উঁচুতে। শুধু অলৌকিক কাজকর্মে তাঁর পূর্ণতা নয়। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। নিজের ইচ্ছা দিয়ে তিনি বহু ঘটনা ঘটাতে পারতেন। আল্লাহ্‌র পরম অনুগ্রহ ও সাধনা না থাকলে এমন সব ঘটনা একজন করতে পারে না। তাঁর জীবনে বহু ঘটনাই তাই মানুষকে অবাক করে দেয়। তিনি যখন শ্রীহট্টে তাঁর আস্তানা গড়লেন তখন সেখানে জলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অথচ জল না হলে কি করে চলবে! শাহ্‌ জালাল ভক্তদের নিয়ে একটা কূপ খনন করলেন। দরগার পশ্চিম দিকে সামান্য দূরে আজও তীর্থযাত্রীদের চোখে এই কূপটি পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ। সিলেটবাসীরা মক্কা শরীফের জমজম কূপের সমমর্যাদায় কূপটিকে শ্রদ্ধা করে। খননের সময় কূপটির গভীরতা বেশি ছিল না। তাই জল জমত না। শাহ্‌ জালাল এই দেখে একদিন কূপের মধ্যে নিজের লাঠিটি স্থাপন করেন। ঐ লাঠির ছোঁয়ায় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। কূপের তলদেশ থেকে কেমন করে উচ্ছ্বসিত জলধারা দ্রুত বেগে উত্থিত হল। এখনো ওই কূপের জল স্থির একটা উচ্চতায় অবস্থিত। কোনোদিন তা কমে না বা বাড়ে না। বৃষ্টির জলে কূপ ভরে গেলেও একটু বাদেই স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত হয়।

বহুদিন আগে মনস্থর আহমদ ও আবদুল ওহাব নামে দুজন ধার্মিক ব্যক্তি সিলেটের চাঙ্গাইটিলা গ্রাম থেকে হজ করবার জন্য মক্কা শরীফে গিয়েছিল। হজ শেষ করে দু বন্ধু ভাবল দেশে ফেরবার পথে তারা নানা দেশ পর্যটন করবে। সামান্য একটা অসুবিধে দেখা দিল। আবদুল ওহাবের সঙ্গে কিছু আশরফি ছিল, যা নিয়ে দেশ ভ্রমণ নিরাপদ নয়। এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি এখন কোথায় রাখা যায়। হঠাৎ আবদুল ওহাবের মনে পড়ে গেল প্রচলিত একটি কথা। সে শুনেছিল মক্কার জমজম কূপের সঙ্গে শাহ্ জালালের কূপের মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে। কথাটা সিলেটে বহুল প্রচলিত; ফলে ওহাবের মনে এই সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল। সে ভাবল, যদি আশরফিগুলি একটা কাঠের বাক্সে রেখে জমজম্ কূপে ফেলে দিই তাহলে হয়তো শাহ্ জালালের কৃপায় বাক্সটি তাঁর সিলেটের কূপে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। বিশ্বাস মিলায়ে আল্লাহ্ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ওহাব একটা বাক্সে আশরফি রেখে বাক্সটায় তার নাম লিখে জমজম্ কূয়ায় ফেলে দিল।

এবার নিশ্চিন্ত মনে দু বন্ধু ইরাক ইয়ামন সিরিয়া বাগদাদ প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরে বহুদিন বাদে নিজেদের গ্রামে ফিরে এল। দেশে ফিরে, ওহাবের আশরফির কথা মনে পড়ল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দরগার খাদেম খায়রুদ্দীনের কাছে গেলেন। খায়রুদ্দীন শাহ্ জালালের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি জল তুলতে গিয়ে দেখলেন, কুয়োর মধ্যে একটা কাঠের বাক্স ভাসছে। বাক্সটি তুলে দেখলেন তার গায়ে আবদুল ওহাব নাম লেখা। বাক্সটা বেশ ভারী দেখে তিনি সযত্নে তা রেখে দিলেন। তাঁর ধারণা, এই নামের কোনো লোক এখানে এসেছিল, কুয়োয় জল তুলবার সময়ে তার অজ্ঞাতে বাক্সটি জলে পড়ে গেছে। না পেলেই সে খোঁজ করতে আসবে। আবদুল ওহাব এসে তাঁকে বাক্সের কথা বললেন। তার কথার সঙ্গে বাক্সটি মিলে গেল। খায়রুদ্দীন বুঝতে পারলেন, ওহাবই বাক্সটির প্রকৃত মালিক। তিনি বাক্সটি তাকে দিয়ে দিলেন।

কি আশ্চর্য ব্যাপার! কোথায় মক্কা শরীফ আর কোথায় সিলেট!

এত পথ পেরিয়ে বাক্স এখানে এল কি ভাবে! এ যে অসম্ভব সম্ভব হওয়া। দুজনেই অনুভব করল একমাত্র শাহ্ জালালের অলৌকিক শক্তিবলেই বাক্স এখানে এসেছে। শাহ্ জালালের ক্ষমতার কথা দুজনেই জানত। এবার তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হল। ওহাব আশরফিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে গেল না। গরিব দুঃখীদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিল খুশি মনে।

সেই প্রথম আমল থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ পর্বে শাহ্ জালালের দরগায় বহু মানুষ হাজির হয়। চারদিক থেকে ভক্তের দল ছুটে আসে। মাজার জিয়ারত করে। কোরান শরীফ পাঠ দান ধ্যান করে পরম শ্রদ্ধেয় পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। দরগা থেকে আগত সবাইকে খাবার দেওয়া হয়। সে এক এলাহী কাণ্ড! কোথেকে যে এত চাল, মাংস জুটে যায়, তা ভাবলেও বিস্ময়ে মন ভরে যায়। আল্লাহ্‌র অলীর কারামত ছাড়া একে আর কি বলা যাবে! দরগার লঙ্গরখানার পূর্বদিকে একটা ঘরে দুটো ডেকচি আছে। ডেকচির গায়ে খোদিত লেখা থেকে জানা যায় ১১০৬ হিজরী সনে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) নিবাসী আবু সঈদ নামে এক ধার্মিক (ধর্মপ্রাণ মুসলমান) ডেকচি দুটো তৈরি করান এবং মীর মোরাদ বকশ সিলেটে শাহ্ জালালের কাছে ডেকচি দুটি পাঠিয়েছিলেন। এই বিরাট ভারী ডেকচি দুটোর ঢাকা থেকে সিলেটে আসা নিয়েও অলৌকিক কাহিনী আছে। ডেকচি দুটো তৈরির পর তা সিলেটে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অত ভারী অত বড় ডেকচি কি করে এত দূরে পাঠানো হবে? মোরাদ তখন কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে ঠিক করলেন, যে অলীর দরগার জন্য ডেকচি নির্মিত হয়েছে, তাঁর আপন মাহাত্ম্য থাকলে আল্লাহ্‌র কৃপায় আপনা থেকেই তা যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। এই কথা ভেবে তিনি লোক ডেকে ডেকচি দুটো বুড়িগঙ্গা নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। আল্লাহ্‌র অপার মহিমা! সেই ভাসমান ডেকচি সিলেটের চাঁদনীঘাটে নিজে থেকেই হাজির হল। খবর পেয়ে আশপাশের বহু মানুষ ডেকচি দেখতে এল। ডেকচির গায়ে সব লেখা—লেখা থেকে সবাই বুঝতে

পারল কার জন্য এই ডেকচি এখানে এসেছে। সবাই তীরে ওঠাবার জন্য ডেকচি ধরতে গেল। তাজ্জব কাণ্ড! লোক দেখেই ডেকচি দূরে সরে গেল। সবাই বুঝল, এটা কারামাতী ডেকচি—যার তার হাতে ধরা পড়বে না। তখন দরগার প্রধান খাদেম মৌলভী আবতুল আয়াস মোহাম্মদ আহমেদকে খবর দেওয়া হল। খবর পেয়েই তিনি এলেন। তাঁকে দেখেই ডেকচি কাছে এল। তিনি অন্য লোকের সাহায্যে ডেকচি তুটো তীরে তুললেন। তারপর ডেকচির গায়ের খোদিত লেখা পড়লেন। আজো ডেকচি তুটো দরগায় রয়েছে। এতে একসঙ্গে সাত মণ চাল ও সাতটি গরুর গোশ্ত রান্না করা যায়। ডেকচি তুটির ওজন পাঁচ মণ তিন সের তুই পোয়া মাত্র। এক মণ সমান সাড়ে সাঁইত্রিশ কেজি। বিশেষ পর্বে এখনো তা ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বাইরে কখনোই আনা হয় না।

শাহ্ জালালের এক শিষ্য ছিলেন জিয়াউদ্দীন। তাঁকে শাহ্ জালাল ধর্ম প্রচারের জন্য বোন্দাশীলে পাঠিয়েছিলেন। বোন্দাশীলের মানুষদের জলের জন্য নির্ভর করতে হত সুরমা ও বোরাক নদীর ওপর। কিন্তু এই তুটি নদীর জলই ছিল বিস্বাদ। এই জল খাওয়া, এ দিয়ে রান্নাবান্না করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেজন্য স্থানীয় অধিবাসীদের কষ্টের সীমা ছিল না। বোন্দাশীলের সবাই জিয়া-উদ্দীনকে এ বিষয়ে জানিয়ে একটা কিছু করতে বলল। জিয়াউদ্দীন সব দেখে শুনে শাহ্ জালালের কাছে একটা উপায় করার প্রার্থনা নিয়ে হাজির হলেন। শাহ্ জালাল স্বচক্ষে দেখবার জন্য জিয়াউদ্দীনের সঙ্গে বোন্দাশীলে এলেন। তাঁকে দেখে বোন্দাশীলের মানুষরা খুব খুশি। এই পীরের নাম তারা শুনেছে। সবাই দলে দলে এসে হাজির হলেন তাঁকে দেখবার জন্যে। তিনি তখন উপস্থিত জনতাকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে চলে এস। যারা আল্লাহ্‌র উপাসনা করে তাদের প্রতি তিনি সদয় হন—তাদের সব অভাব অভিযোগ দূর করেন। যারা শয়তানের অনুগামী হয়, তাদের তিনি শয়তানের হাতেই সোপর্দ করেন। তোমরা আমার ডাকে চলে এস, দেখবে

শিগগিরই আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট দূর করে দেবেন। সুখ শান্তিতে তোমাদের জীবন ভরে যাবে। সেই সুললিত উপদেশে বহু অমুসলমান ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিল। শাহ্ জালাল তাদের জন্য দোয়া করলেন। তারপর সকলকে সঙ্গে নিয়ে সুরমা নদী তীরে গেলেন। সেই বিস্বাদ নদীর জল দিয়ে তিনি অজু করলেন। সেই জল মুখে দিয়ে কুলি করে নদীতে ফেললেন। বিস্ময়কর ঘটনা। সকলের সামনে নদীর জল সুস্বাদু হয়ে গেল। বোন্দাশীলের মানুষরা এই মহান তাপসের আশ্চর্য কীর্তি দেখে হতবাক! তারা তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাল শাহ্ জালালকে।

বহুদিন হল শাহ্ জালালের এন্তেকাল হয়েছে। কিন্তু এই ভারত-ভূমিতে তিনি কিংবদন্তী পুরুষ হয়ে মানুষের মুখে মুখে অমর হয়ে আছেন।

একদিল শাহ্

পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর পুরো নাম পীর হজরত আহমদ-উল্লাহ্ রাজী। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তিনি একদিল শাহ্ নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। সাফি দিল কথাটি অপভ্রংশে একদিন একদিল শব্দে রূপান্তরিত হয়। একদিল কথার মানে এক দিল অর্থাৎ অদ্বিতীয় হৃদয়। এ থেকে বোঝা যায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ দিলের মানুষ। শাহ্ শব্দটি উপাধি হিসেবে হয়তো নামের পেছনে জায়গা করে নিয়েছিল।

পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজী এদেশে হজরত গোরাচাঁদ রাজীর সঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন। চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার আনোয়ারপুর নামক জায়গায় ছিল তাঁর কর্মস্থল। মোর্শেদ কর্তৃক তিনি একদিল শাহ্ উপাধি পেয়েছিলেন কিনা তাই বা কে বলতে পারে। তিনি যে কোন জায়গার অধিবাসী ছিলেন ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। অজানা থেকে গেছে তাঁর জন্ম তারিখ। গৌড়ে যখন হাবসী সুলতানরা রাজত্ব করত, তারই শেষ সময়ে অথবা সুলতান হোসেন শাহ্‌র রাজত্বের প্রথমদিকে এই দরবেশ ইসলাম ধর্মপ্রচারের জন্য বারাসতে পৌঁছেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কবি আশক্ মোহাম্মদ শাহ্ তাঁর পীর একদিল শাহ্ নামক পাঁচালী কাব্যে লিখেছেন :

মেরা জন্মস্থান জান সাহানা নগর,
বাপের যে নাম শাহানির সদাগর,
বাপ মেরা শাহানির মাতা আশক নুরি।
আড়াই রোজের হইয়া যাই নিরঞ্জন পুরি।

পৌষ সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে একদিল শাহ্ তাঁর জীবনলীলা শেষ করেন বলে বলা হয়। কিন্তু পরলোকগমনের সাল জানা যায় না। চব্বিশ পরগনার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কাজীপাড়ার বাসিন্দা ছুটে

খাঁ ওরফে ছুটে মণ্ডল সাহেবের বাড়িতে তিনি থাকতেন। দুশ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে তাঁর প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করেছিল। পীর একদিল শাহ্ কাব্যে তাঁর রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে :

উপনীত হইল পীর রাজ দরবারে॥
আকাশের চন্দ্র যেন নামিল ভূমেতে
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনে একদিল বরণ॥
রবির কিরণ নহে তাহার মতন
কাল মেঘের আর যেন বিজলীর ছটা॥
কাচা সোনা জ্বলে যেন মাণিকের বেটা
দু আঁখে কাজল অতি দেখিতে উত্তম॥
চলন খঞ্জন পাখি পাইবে শরম
হাতে পদ্ম পায় পদ্ম কপালে রতন জ্বলে
পীরকে দেখিয়া প্রজা ধন্য ধন্য করে॥

পীর একদিল শাহ্ সাধারণ রাখালের বেশে আনোয়ারপুর অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। এরই মধ্যে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা লোকের সামনে বিস্ময়ের রূপ নিয়ে দেখা দিত। কাজীপাড়ায় ছুটে খাঁর নিঃসন্তানা পত্নী তাঁকে পুত্র স্নেহে যত্নসহকারে রাখতেন। তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। বার্ধক্য ও জরাজনিত কারণে ধীরে ধীরে তাঁর জীবনদীপ একটু একটু করে নিবে গিয়েছিল। আনোয়ারপুরে পীর একদিল শাহ্‌র সঙ্গে কোনো হিন্দু ধর্মাবলম্বীর কখনো কোনো সংঘর্ষ হয় নি। তিনি আপন মনে আল্লার মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। হজরত চাঁদ নামক একজন প্রতিপত্তিশালী মুসলমানের সঙ্গে তাঁর মন কষাকষি হয়েছিল বলে শোনা যায়। এই মনোমালিন্যের কারণে চাঁদ খাঁ কর্তৃক আরব্ধ মসজিদ আর পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। পীর একদিল শাহ্‌র প্রতি চাঁদ খাঁর আচরণকে অনেকেই ঐশ্লামিক নয় বলে বলেছেন। অসামান্য সরলতার সুযোগ নিয়ে একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ তাঁকে সামনে দাঁড় করিয়ে চাঁদ খাঁর ওই মসজিদকে সম্পূর্ণ হতে দেয় নি। আনোয়ারপুর কাজীপাড়ায় একদিল শাহ্ গাজীর পবিত্র মাজার শরীফ
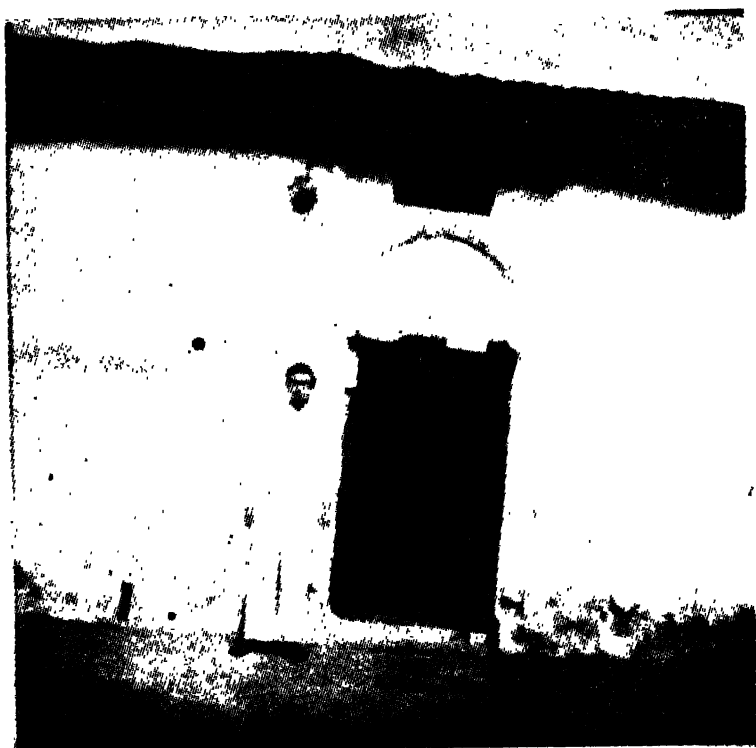
গ্রন্থকারকে রওজা শরীফে হাজিরা দিতে দেখা যাচ্ছে।

আছে। প্রতি বছর পৌষসংক্রান্তির আগের রাত থেকে উরস উৎসবের শুরু হয়। উৎসব চলে আটদিন ধরে। দরগার সামনে উঁচু এক মিনারের পাশে নহবতে সানাইয়ের সুর বাজে। প্রভাতী এই সুর জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলে ঘুম থেকে। শীতের কুয়াশা মাখা ভোরে মাজারের কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত হয়ে পড়েন উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। দূর দূরান্তর থেকে ফকির ও দরবেশরা, মানিকপীরের গায়করা জমা হতে থাকেন। পাড়ায় পাড়ায় আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর মাজার শরীফ ইটের তৈরি সৌধ। সৌধের গায়ে কারুকার্য করা। দরগার চারপাশে প্রাচীর। সামনের চত্বরে রয়েছে কটি বকুল গাছ। এই গাছগুলি রমণীয় করে তুলেছে কবরকে। দরগার পেছন দিক দিয়ে প্রবাহিত সুবর্ণরেখা নদী। উৎসবের সময় সমস্ত দরগা সাজান হয়। আলোকমালায় উৎসব স্থান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রাজা রামমোহন রায়ের বংশধর, ধরণীমোহন রায় দরগায় খুব সকালে এসেই শিরনি প্রদান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেরেস্তা থেকে শিরনি দেওয়া হত। আরেকজন হিন্দু: ক্ষেত্রমোহন তেওয়ারীর স্থলে শ্রীভূদেব তেওয়ারী সত্তর বছর বয়সেও নিজে শিরনি দেন। একটি বিষয় লক্ষ্য করার, এই দরগায় হিন্দুরাই প্রথমে শিরনি দিয়ে থাকেন। এ নিয়ে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। দরগার বর্তমান খাদিমদার আলহাজ ফকির আমেদ, কাজী আজিজার রহমান বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও তাঁর পরবর্তী কোনো ব্যক্তি ভক্তির চিহ্নস্বরূপ একদিল শাহ্‌কে নশো উনত্রিশ বিঘা পাঁচ কাঠা জমি দিয়েছিলেন।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর উক্ত দরগার নির্ধারিত সেবায়েৎ বা খাদিমদার দরগা ও তার সংলগ্ন প্রাঙ্গণ নিজের হাতে পরিষ্কার করেন। পীরের ঘরে বাতি জ্বেলে দেন। কোরান শরীফ পাঠ করেন। প্রার্থনা জানান আল্লাহ্‌র কাছে পীরের আত্মার শান্তির জন্য। এরপর তিনি দরগা থেকে বেরিয়ে অতিথিশালায় কোনো অতিথি আছে কিনা খোঁজ নেন। অতিথি

থাকলে তাঁর আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। এক সময়ে এখানে গড়ে একশর বেশি অতিথির সৎকার করা হত। এখনও গড়ে দশ-বারো জন অতিথির সৎকার করা হয়। পীরোত্তর জমির আয় ও ভক্তদের দেওয়া অর্থ থেকেই আগে এই ব্যয় চলে যেত—কিন্তু এখন তা চলে না। চাঁদা করতে হয়।

প্রতি শুক্রবারে হিন্দু মুসলমান বহু নরনারী পীরের দরগায় হাজত, মানত বা শিরনি দিতে আসে। তাতে একেক দিন এমন জনসমাগম হয় যে, তাকে ছোটখাট একটি মেলা বলেই মনে হয়। উরসের সময়ে যে মেলা হয় তা এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মেলা। দশ পনের দিন উৎসবের আনন্দে দরগা মেতে থাকে। সকাল থেকে হিন্দু মুসলমান ভক্তরা ফুল ও নজরানা দেয়। যার যা হাজত মানত শিরনি দেয়ার তা সবই খাদিমদারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিবর্তে সকলেই শান্তিবারি ও প্রসাদ পান। ফুল দিয়ে সাজানো হয় পীরের স্থান। হিন্দুদের হরির লুঠের মতো পীরের লুঠ হয়। বহু ভক্তই মাঝে মাঝে পীরের লুঠ দেন। দরগার চারপাশে সাজানো দোকান। শিরনির ডালা সাজিয়ে বসে আছে। আশেপাশে প্রচুর ফকিরকে বসে থাকতে দেখা যায়। নানারকম পোশাক পরে, নানা বয়সের। ভক্তরা অনেকেই দরগা থেকে ফেরার পথে এদের কিছু খয়রাত করে যান। এই দরগার খাদিমদারও অনেক। পীরোত্তর সম্পত্তির অংশীদারদের বিরাট নামের লিস্ট টাঙানো। লিস্ট অনুযায়ী তারা প্রসাদ পেয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে ভাগ পান দক্ষিণাপ্রাপ্ত অর্থের। দরগার সামনের চত্বরে পাঁচ ছটি গায়কের দল ঢোল হারমনিয়াম ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে পীরের মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত গানের মধ্যে দিয়ে জায়গাটিকে জমজমাট করে তোলে। প্রতিদলেই থাকে একজন করে মূল গায়েন। তার ফকিরের পোশাক। মূল গায়েন হাতের চামর দুলিয়ে নেচে নেচে সকলের জন্য দোয়া ভিক্ষা করে। ভক্তরা এতে খুশি হন ও ওই গানের জন্য গায়কদের পয়সা দেন।

মেলায় সার্কাস, দোকান, বাজার সমস্ত জিনিস আসে। পশরা

সাজিয়ে ব্যবসায়ীরা মাল বিক্রি করে। মেলায় আগত লোকের সংখ্যা প্রায় লক্ষের কাছাকাছি। দূরের মানুষরা পরিবার পরিজন নিয়ে গরুর গাড়িতে আসে। মেলার কাছেই কোথাও গাড়ি দাঁড় করিয়ে চড়ুই-ভাতি করে খায়। এখানে পীর একদিল শাহের নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাস্তা, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি রয়েছে। কাজীপাড়ার দরগা গৃহ ছাড়াও বারাসত, গোলা কাজীপাড়া, কাটারাইট, বাদু, বালিপুর, বটবীরপুর, জাফরপুর, গোপালপুর, আবদেলপুর, বড় পাটুলী, হুমাইপুর, গোবরা, ধলা প্রভৃতি স্থানেও পীর একদিল শাহের নামে নজরগাহ্‌ রয়েছে।

এরকম কথিত আছে: সাহানানগরের সওদাগর সাহানীর বিরাট ধনী। কিন্তু পুত্রের অভাবে সংসার অন্ধকারে ভরা। পুত্রলাভের জন্য সাহানীর স্ত্রী আশক নুরি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে সাধনায় মগ্ন। বারোটা বছর কেটে গেল। একদিন এই সাধ্বী রমণী অচেতন হয়ে পড়ল আল্লাহ্‌র কথা ভাবতে ভাবতে। শয্যা নিল ভক্তিমতী সেই রমণী। তাই দেখে শেষ পর্যন্ত খোদার বুঝি মেহেরবানী হল। তিনি তক্ষুনি জিব্রাইলকে ডেকে সমস্ত ব্যাপার জেনে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক লক্ষ আশী হাজার পীরের অন্যতম একদিল শাহ্‌কে বেছে আশক নুরির গর্ভে অধিষ্ঠিত করালেন। এই মানব জন্মে একদিল শাহ্‌র আপত্তি ছিল—কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁকে আশ্বাস দিলেন, আড়াই দিন পরই নিজের কাছে ফিরিয়ে আনবেন। একদিল শাহ্‌ রাজী হয়ে গেলেন। তুলাল নামক একরকম ফুলের রূপ ধরে একটি পাত্রের মধ্যে অবস্থান করে একদিল শাহ্‌ সান নদীতে ভাসতে লাগলেন। আশক নুরিকে রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিলেন। সকালে নদীর ঘাটে এসে আশক নুরি সেই ভাসমান ফুলের পাত্রটি দেখল। দোলায়মান চিত্তে সে পাত্রটি ধরল এবং ফুলের সৌগন্ধর আঘ্রাণ নিল। তাতেই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হল। সাহানীর তো খবর শুনে ভীষণ খুশি। গর্ভবতী আশক নুরি দশ মাস দশ অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাটান। যথাসময়ে সে পুত্র-সন্তান প্রসব করল। সাহানীর মিঞা এই আনন্দে দাইকে দক্ষিণাস্বরূপ

হাজার টাকা দান করল। আশক হুরিও নিজের গলার হার, মানিকের ছড়া, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি খুশি মনে দিয়ে দিল। সাহানীর ধনভাণ্ডার থেকে লক্ষ টাকা দান করা হল ফকিরদের। বিয়াল্লিশ রকম বাজনা বেজে উঠল। মসজিদে লক্ষ টাকার শিরনি দেওয়া হল। সে বলে উঠল :

এবে সে জানিনু মুই পুত্র বড় ধন—

প্রত্যেকে তার দানে খুশি হয়ে পুত্র একদিল শাহ্‌কে আশীর্বাদ জানিয়ে চলে গেল। পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে আড়াই রোজ কেটে গেল। প্রতিশ্রুতি মতো একদিল শাহ্‌কে ফিরিয়ে আনবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর দূতকে আদেশ দিলেন। দূত খওয়াজের পরনে বিচিত্র পোশাক। পায়ে খড়ম, হাতে সোনার আশবাড়ি। ফকিরের বেশে তিনি সাহানীরের বাড়ি এসে একদিল শাহ্‌কে দেখতে চাইলেন। আড়াই দিন বয়সের শিশুকে ঘরের বার করতে সাহানীর রাজী হলেন না। এতে খওয়াজ্ রেগে গিয়ে নানা ধরনের ভয় দেখালেন। শেষ পর্যন্ত সাহানীর ছেলেকে নিয়ে এলেন ফকিরের সামনে। সবার অগোচরে আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিয়ে খওয়াজও একদিল শাহ্‌র মধ্যে কথা হল। সাহানীরের চোখে ধুলো দিয়ে খওয়াজ্ আল্লাহ্‌র দরবারে একদিল শাহ্‌কে নিয়ে হাজির করলেন। আল্লাহ্ তখন নতুন করে আদেশ দিলেন, একদিল শাহ্‌কে মোল্লা আতার বাড়িতে রেখে আসতে। সেখানে একদিল শাহ্ কোরান শরীফের পাঠ নেবে। খওয়াজ্ তাই করলেন।

মোল্লা আতা আল্লাহ্‌র ফরমানের কথা শুনলেন খওয়াজের মুখ থেকে। শুনেই আতা সাহেব ও তাঁর পত্নী আনন্দে আপ্লুত হলেন। তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। আল্লাহ্ করুণা করে তাই একদিল-শাহ্‌কে পাঠিয়েছেন। মোল্লা আতার স্ত্রীর বক্ষে শিশুর খাদ্য দুধ উৎপন্ন হল। একদিল শাহ্ সেই দুধ পান করে বড় হতে লাগলেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতো কোরান শরীফ পাঠ নিতে লাগলেন।

সাহানীর তো মাথায় বাজ পড়ল। ফকিররূপী খওয়াজ্ অদৃশ্য হয়ে

যেতেই তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। চারদিকে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সবাই হাহাকার করে কেঁদে উঠল। আশক নুরি পাগলিনীর মতো বাড়ির মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড আরম্ভ করল। সাহনীর নিজের ভাগ্যকে বিদ্রূপ করে পাগলের মতো বীভৎস পোশাক পরে বিশ্রীভাবে সজ্জিত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল হারিয়ে যাওয়া শিশু-পুত্রের খোঁজে। নানা জায়গায় ঘুরে সে এসে পড়ল কাঞ্চনানগরে। কাঞ্চনানগর তখন ছিল সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। সেখানকার পরিচালিকা ছত্রজিতের একমাত্র কন্যা ডাকিনী। যেমন দেখতে শুনতে, তেমনি তার ব্যবহার। একমনে কোরান শরীফ পাঠ করে। রাজ্যের রাজকর্মচারী সকলেই মহিলা। সেজন্য মানুষেরা এই জায়গাকে বলে স্ত্রীমা পাটন। ডাকিনী অনেকদিন আগে সাহানীরকে স্বপ্নে দেখে তার প্রতি অনুরক্তা হয়েছিল। ডাকিনী মানসিকভাবে নিজেকে সাহানীর প্রতি নিবেদন করেছিল এবং অপেক্ষায় ছিল সাহানীরকে বিয়ে করবার জন্য। কিন্তু কোনো যোগাযোগ হয়নি। নিজ রাজ্যে সাহনীরের আগমন শুনে সে খুব খুশি হল। সঙ্গে সঙ্গে গণৎকারকে খবর দিতে বলল। গণৎকার খড়ি পেতে গুনে বলল, এই সেই ব্যক্তি। এবার ডাকিনী জিজ্ঞেস করল, কি করে একে পাওয়া যায়? মানুষটি এখন পুত্রশোকে পাগল। গণৎকার বলল, খুব সেজেগুজে গয়নাগাটি পরে সখীদের সঙ্গে নিয়ে তুমি সাহানীরকে ভোলাবার চেষ্টা কর।

ডাকিনী সেই উপদেশ গ্রহণ করে সখী পরিবৃতা হয়ে সাহানীর সামনে গেল। সে তাকে ভোলাতে সমর্থ হল। ফলে সাহানীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। সাহানীর কাঞ্চনানগরের রাজা হয়ে গেল। আর পুত্রহারা জননী আশক নুরি তার সখীদের সঙ্গে নিদারুণ শোকে বিহ্বল হয়ে অবিরাম কাঁদতে লাগল। তার সেই আকুল কান্নায় কেঁদে উঠল সমগ্র প্রকৃতি। কাঁদতে লাগল আকাশ বাতাস। এমন কি কান্না শুনে গাভীর গর্ভের বাছুর পর্যন্ত কেঁপে উঠল। বৃক্ষের লতা ঝরল। শিলা গলে গেল। সম্মিলিতভাবে কাঁদতে লাগল তরুলতা পশুপাখি। কান্নার মধ্যে আশক নুরি বলে উঠল: মরিব মরিব

জিরা নিশ্চয় মরিব। এই কথা বলে আত্মবিসর্জনের জন্য সে মাঝ নদীতে ঝাঁপ দিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অন্যরকম। সেই নদীর জল শুকিয়ে গেল। বিষধর সাপের সামনে সে নিজেকে তুলে ধরল। সাপ তাকে কাটল না, পাশ দিয়ে চলে গেল। গভীর জঙ্গলে আগুন লাগলে সেই আগুনে আশক নুরি ঝাঁপিয়ে পড়ল। হায় আল্লাহ্‌! আগুন নিবে গেল চোখের নিমেষে। বাঘের সামনে এগিয়ে গেল সে। বাঘ তাকে খাওয়া দূরে থাক, সেলাম জানিয়ে চলে গেল। পাগলিনী মৃত্যুকামী এই নারীর অনাহার অনিদ্রায় আর পথভ্রমণে এবার শরীর পাত হওয়ার অবস্থা দেখা দিল। এবার আল্লাহ্‌র আসন টলে উঠল। আল্লাহ্‌তায়ালা সব জানতে পেরে আবার খওয়াজ্‌কে ডেকে পাঠালেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পীর একদিলকে সাহানানগরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। খাওয়াজ্‌ সেই হুকুম মতো মোল্লা আতার ঘর থেকে একদিলকে নিয়ে হাজির করলেন তাঁর মায়ের কাছে। আশক নুরি প্রথমে ছেলেকে চিনতে পারল না। পরে সব জানতে পেরে অভিমানে দুঃখে বলে উঠল :

একবার দুধ মায়ের শুধা নাহি যায়
শত শত মসজিদ দিলে সমান না হয়॥

পীর একদিল এ কথা শুনে মনে ব্যথা পেয়ে গলবস্ত্র হয়ে মায়ের কাছে ক্ষমা চাইলেন। মার পা দুখানা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। মা ছেলেকে কোলে নিল। চারদিকে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আশক নুরি নিজের হাতে রান্না করে ছেলেকে খাওয়াল। তারপর মা ও ছেলে একসঙ্গে শুয়ে পড়ল। একদিল শাহ্‌ মার গলা জড়িয়ে ধরে গভীর আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল সকালে কোকিলের ডাকে। পীরের মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে কারণ পিতাকে স্বপ্ন দেখার পর থেকে। মার কাছে তিনি বাবার কথা জানতে চাইলেন। মা বেদনা মাখা কণ্ঠে সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানাল। পীর একদিল সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানে বসে পিতা কোথায় কি অবস্থায় আছে তা জেনে নিলেন। এবার তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন

তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। মাকে তাই তিনি বললেন, বাবাকে আমি ফিরিয়ে আনতে যাব। মা প্রথমে ছেলেকে ছেড়ে দিতে রাজী হল না, পরে অবশ্য মত দিল। পীর একদিল পিতার অনুসন্ধানে রওনা দিলেন। মার আশীর্বাদ মাথায় করে একজন ফকিরের বেশে নৌকা করে বেরিয়ে পড়লেন। সাতটি নৌকার ছোট একটা বহর। সেই নৌবহর ভেসে চলল। নানাদেশের নানা ঘাট হয়ে তিনি নৌবহর নিয়ে কাঞ্চনানগরে পৌঁছলেন। মাঝি মাল্লারা ডাঙায় নেমে যাওয়ার যোগাড়-যন্ত্র করতে লাগল। কাঞ্চনানগরে সাড়া পড়ে গেল তাদের আগমনে। দলে দলে বহু মানুষ তাদের দেখবার জন্য ছুটে এল। সবাই অবাক হয়ে দেখল :

পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি একদিল বরণ
রবির কিরণ নহে তাহার সমান ॥

একদিল এবার গলায় কাপড় দিয়ে জোড় হাত করে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সাহানীর প্রথমে ছেলেকে চিনতে পারেন নি। পরে তাঁর মুখে সব শুনে আনন্দের গভীর উচ্ছ্বাসে কেঁদে উঠল। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। পিতাপুত্রের মিলন হল। দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলেন। একদিল শাহ্ পিতাকে স্বদেশে ফিরবার জন্য অনুরোধ করলেন। সাহানীর রাজী হয়ে গেল। তিনি ছেলেকে সঙ্গে করে ডাকিনীর কাছে নিয়ে গেল। রাজদরবারে ছিল ডাকিনী। একদিল শাহ্‌র পরিচয় পেয়ে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাঁদের প্রস্তাবের উত্তরে বলল :

তুমি তো জান না স্বামী নারীর গোঁসাই
স্বামী বিনা নারীদের কোনো লক্ষ্য নাই ॥

ডাকিনী সালংকারা সুসজ্জিতা হয়ে স্বামী ও সতীন পুত্রের সঙ্গে স্বামীর দেশের দিকে চলল। সতীন পুত্র সম্পর্কে তার মনে তখনো সংশয় ছিল। একদিল তার মনের সেই সংশয়কে কাটিয়ে দিল। ডাকিনী নৌকোয় চেপে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসল। নিরাপদে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারা কাঞ্চনানগরে এসে পৌঁছল। আশক

নুরি অধীর আগ্রহে একদিল শাহ্‌র পথ চেয়েছিল। তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল প্রতীক্ষায়। দূর থেকে একদিলকে দেখেই তার দেহ মনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। একদিল প্রথমে নামলেন। মার কাছে গিয়ে তাকে খবর দিলেন পিতা ডাকিনীর আগমন বিষয়ে। এর কারণ যাতে সতীনকে আনার জন্য মা কিছু না বলে। পীর একদিল শাহ্‌ বললেন, সতীনকে কিছু বললে আল্লাহ্‌র দরবারে আমি গুনাহ্‌গার হব। উত্তরে আশক নুরি বলল, তুমি ফিরে এসেছ, এই আমার কাছে যথেষ্ট। তাছাড়া ডাকিনী আমার বোন, সে তোমার বাবাকে এতদিন সযত্নে রেখেছিল—অতএব সে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। ডাকিনী নেমে এলে দুজনে দুজনকে সহোদরার মতো সমাদর করল। একদিল শাহ্‌র অনুরোধে আশক নুরি বিনা আগুনে খাবার তৈরি করল। তারপর :

কোলে করি ডাকিনীর ধোয়াইল হাত
দুই বহিন একান্তরে বসে খায় ভাত।

খাওয়া-দাওয়ার পর যে যার ঘরে গেল ঘুমনোর জন্যে। রাত্রে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বপ্নে দেখা দিলেন। তিনি পীর একদিল শাহ্‌কে আদেশ করলেন চট্টগ্রামে গিয়ে মুরশিদের সেবায় নিযুক্ত হতে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই পীর স্বপ্নের আদেশ মতো চট্টগ্রামে যাবার উদ্যোগ করলেন। দেখতে দেখতে এই খবর রটে গেল। চারদিকে নেমে এল বিষণ্ণতা। আশক নুরি পরের রাতে একদিলকে পাহারা দিয়ে আটকে রাখতে চাইল। কিন্তু তার সেই চেষ্টা সফল হল না। এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়তেই একদিল শাহ্‌ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। রওনা দিলেন চট্টগ্রামের দিকে।

চট্টগ্রামে পৌঁছে একদিল শাহ্‌ দেখতে পেলেন বদর পীর রাখাল বালকের ছদ্মবেশে অন্যান্য রাখালদের সঙ্গে খেলা করছেন। রাখাল বলে উপহাস করতেই তিনি পালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অনেক খুঁজেও একদিল শাহ্‌ তাঁকে বার করতে পারলেন না। শুধু খবর পেলেন তিনি সরুয়া গ্রামের একজন লোকের বাড়িতে কবর নিয়েছেন।

একদিল শাহ্ ছাড়বার লোক নন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সরুয়ার সেই বাড়িতে গিয়ে তাকে নিয়ে বদর পীরের কবরে গেলেন। বদর পীরের দেখা পাওয়ার জন্য সেখানে তিনি অনেক কান্নাকাটি করলেন। কিন্তু বদর পীরের তরফ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। এবার কবর খুঁড়ে ফেললেন তিনি। কবর খুঁড়তেই পীরের গলিত শবদেহ পাওয়া গেল। একটা সিন্দুকে সেই গলিত শব ভরে একদিল শাহ্ মাথায় নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর প্রাণ শেষ হবার মতো অবস্থা। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু কামনা করে তিনি আগুনে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু হায়! সেই আগুন আল্লাহ্‌র মহিমায় ফুল হয়ে গেল। এবার বদর পীর সদয় হলেন। তিনি দর্শন দিলেন একদিলকে। সমস্ত কিছু শুনে একদিলকে তিনি শিষ্য করে নিলেন। দীক্ষান্তে তাঁকে আশীর্বাদ দিলেন।

গুরু শিষ্যে এক সঙ্গে ছমাস এক জায়গায় রইলেন। তারপর গুরুর আশীর্বাদ মাথায় করে একদিল শাহ্ বেরিয়ে পড়লেন। চলতে চলতে এক গভীর অরণ্যে গিয়ে হাজির হলেন তিনি। সেখানে এক হরিণী তার দুটি আড়াই দিনের শিশুকে নিয়ে বাস করছিল। একদিন পিপাসার্ত হয়ে হরিণী কালিন্দী নদীতে গেল। রাজা নছিরাম সেই অরণ্যে শিকারে এসেছিল। তিনি একা পেয়ে হরিণীকে বন্দী করলেন। 'হরিণ শিশুরা দীর্ঘক্ষণ মাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে লাগল। আকুল কান্নার মধ্যে তারা পীর একদিল শাহ্‌কে দেখতে পেল। তারা কেঁদে পড়ল পীরের পায়ে। পীর কথা দিলেন তিনি মা হরিণীকে খুঁজে দেবেন। এই সব বলেই তিনি রাজবাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। রাজা নছিরাম নিষ্ঠুর লোক ছিল। তার ভেতর মায়ামমতার কণামাত্র দেখা যেত না।

একদিল শাহ্ রাজবাড়িতে এসে জিগির ছাড়তেই নছিরাম রেগে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে কোটালকে আদেশ দিল, পীরকে বন্দী করবার জন্য। রাজা আরও বলল, পরদিন সকালেই কাছারিতে একদিল শাহ্‌র বিচার হবে। আদেশমাত্র কোটাল তাঁর হাতে পায়ে বেড়ী

পরিয়ে, গলায় পাষাণ চাপা দিয়ে বন্দীশালায় আবদ্ধ করে রাখল। সেই ঘরে হারানো হরিণীও বন্দী ছিল। পীর একদিল আল্লাহ্‌র কৃপায় নিজের দেহের বন্ধন খুলে ফেললেন। তাঁর দেহ-জ্যোতিতে বন্দীশালা আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি প্রভাতের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সকালে যথাসময়ে রাজসভা বসল। রাজার হুকুম পেয়ে কোটাল জেলখানা থেকে ফকিরকে আনতে গেল। কারাগারে গিয়ে তো কোটালের চক্ষুস্থির ! ফকিরের এ কি অপরূপ রূপ ! সে সহ্য করতে পারল না এই দৃশ্য। সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। খবর পেয়ে রাজা দৌড়ে নিজেই কারাগারে গেল। রাজাও নিজ চোখে পীরের জ্যোতির্ময়রূপ দেখে তাড়াতাড়ি জোড় হাত করে ভয় পেয়ে বলল, ক্ষমা কর, অপরাধ করিয়াছি ভারি।

পীর রাজার প্রতি সদয় হলেন। এরপর তিনি রাজাকে নানা ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে ধৃত হরিণীর মুক্তি চাইলেন। রাজা কিন্তু এ ব্যাপারে প্রথমে রাজী হল না। পরে অবশ্য একটা নির্দিষ্ট সময়ে হরিণীকে ফেরত দেবার অঙ্গীকারে তাকে মুক্ত করে দিল। হরিণী ছুটে চলে গেল শাবকদের কাছে। এবং নির্দিষ্ট সময় শেষ হবার আগেই বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে পুনরায় ফিরে এল। রাজা তাই দেখে পীর একদিল শাহ্‌র মহত্ত্ব বুঝে মুগ্ধ হয়ে গেল। নছিরাম কাঁদতে কাঁদিতে পীরের পায়ে গিয়ে পড়ল। পীর একদিল শাহ্ সেই সময়ে নছিরামকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। নছিরামের মুসলমানী নাম রাখা হল দিন মামুদ। দিন মামুদ লক্ষ টাকা খরচ করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করাল। আঠারোটি খাসি কোরবানী করে নছিরাম পীরের নামে শিরনি দিল। এবং সেই শিরনি আহারের পর পীর শয়ন করলে রাজা নিজে তাকে চামর দুলিয়ে বাতাস করতে লাগল। দেখতে দেখতে সকাল হল। পীর ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন।

নামাজ সেরে রাজা একদিল শাহ্‌র কাছে এসে দাঁড়াল। পীর এবার বিদায় চাইলেন। রাজা তখন বলল, এ রাজ্য আপনার,

আপনি এখানে থাকুন। তিনি এই অনুরোধ উপেক্ষা করে বললেন :

তেরা রাজ নাহি প্রয়োজন
পৃথিবী বিছায়ে রাজ্য দিছে নিরঞ্জন।

রাজা দিন মামুদের রাজত্ব থেকে বিদায় নিয়ে তিনি একটা সাদা মাছির রূপ ধরে উড়ে এসে উপস্থিত হলেন আনোয়ারপুর পরগনায়। সেখানে এবার তিনি এক বালক ফকিরের রূপ ধরলেন। আনোয়ারপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁকে মুগ্ধ করল। সেখানকার তদানীন্তন শাসনকর্তার নাম ছিল মন্দির রায়। তাঁর শাসনে এখানে সুখ ছাড়া দুঃখের খবর কেউ রাখত না। এখানে ভিক্ষা দেওয়া হত না কাউকে বরং তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। পীর একদিল শাহ্ ভিখারির ছলে মানুষের চরিত্র জানতে চাইলেন। কোথাও তিনি ভিক্ষা পেলেন না। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পথিমধ্যে রাখাল বালকদের দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কোনো মুসলমান আছেন কি? তারা একদিল শাহ্‌কে ছুটি মণ্ডলের বাড়ির কথা বলল। রাখাল বালকদের কাছে তিনি ধর্মপরায়ণা, অতিথিপরায়ণা ছুটি মণ্ডলের স্ত্রীর খবরও শুনলেন। ভর দুপুরবেলা। পীর একদিল শাহ্ ছুটি মণ্ডলের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালেন। ছুটি মণ্ডল গিয়েছিলেন রাজবাড়িতে। তার স্ত্রীর কাছেই পীর একদিল শাহ্ অন্নভিক্ষা করলেন। নিঃসন্তানা ছুটি মণ্ডলের স্ত্রীর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে রাখাল বালকের পরিচয় জিজ্ঞেস করল। পীর জানালেন, তাঁর কেউ নেই—যদি কেউ তাঁকে রাখালের কাজ দেয় তো তিনি তা করতে পারেন। এই কথা বলেই তিনি আবার তাঁর ক্ষিধের কথা ব্যক্ত করলেন। ছুটি মণ্ডলের স্ত্রীর হৃদয় কেঁদে উঠল। সে পীরকে হাত মুখ ধোবার জন্য জল দিয়ে সামান্য বিশ্রাম করতে বলে ভেতরে খাবারের বন্দোবস্ত করতে গেল।

পীর একদিল শাহ্ ছুটি মণ্ডলের আঙিনায় অপেক্ষা করলেন না। অন্যদিকে এগিয়ে গেলেন। মাঝপথে শুকনো এক কদমগাছ ছিল। সেই গাছতলাতে বসলেন একদিল শাহ্। সেখানে বসে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রার্থনা করতে লাগলেন। ছুটি মণ্ডলের স্ত্রী ক্ষীর

হাতে নিয়ে এসে দেখে সেই বালক নেই, কোথায় চলে গেছে। অনেক খোঁজ করেও তাঁকে পাওয়া গেল না।

ছুটি মণ্ডল ফিরলেন রাজবাড়ি থেকে। স্ত্রীর মুখে সব কথা শুনে তিনিও মনে ব্যথা পেলেন খুব। ছুটি মণ্ডল রাত্রে কয়েকজন অতিথি সৎকার করলেন। বিছানায় না শুয়ে মাটিতেই রাত কাটালেন। ওর স্ত্রীও রাত্রে না খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। স্বপ্নে সে পীরকে দেখতে পেল।

পরদিন সকালে এক কাণ্ড ঘটল। রাজদরবারে হিসেবের খাতায় দেখা গেল ছুটি-খাঁর নামে বাইশ হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে। এ ছাড়াও প্রজারা এসে হঠাৎ ছুটি খাঁর নামে নালিশ করল। অপরাধ ছুটি খাঁর নিজের নয়। তাঁর বড় ভাই বড়ু মণ্ডল নাকি জনগণের বিরুদ্ধে অত্যাচার করেছে। রাজা মুশকিলে পড়লেন। ছুটি খাঁর কাজে তিনি খুব সন্তুষ্ট. বহু ব্যাপারে রাজা ব্যক্তিগতভাবে ছুটি খাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে রাজা কিছুতেই কঠোর হতে পারছেন না। তাই দেখে প্রজারা বিরক্ত হয়ে রাজসভা ছেড়ে চলে গেল। অগত্যা প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাজা কালু কোটালকে বললেন, ছুটি খাঁকে বেঁধে আনতে। কোটালকে দেখে আশপাশের সকলে অবাক হয়ে গেল—ছুটি খাঁকে বেঁধে নিয়ে যাবে?

ছুটি খাঁর মাথায় আসছে না কি করে খাতায় বাইশ হাজার টাকা বকেয়া থেকে গেল! নিজের হাতে তিনি জমা লিখে দিয়েছেন। কালু কোটাল রাজার হুকুম পালন করল। ছুটি খাঁ তাঁর সঙ্গে হাত বাঁধা অবস্থায় রাজদরবারে চলেছেন। গ্রামবাসীরা তাই দেখে বলাবলি করতে লাগল, আনোয়ারপুরে ছুটি খাঁর কোনো শত্রু নেই, তাহলে তাঁর এমন অবস্থা কেন? গ্রামের মেয়েরা বলতে লাগল, ওঁর বড় ভাই বড়ু খাঁর এমন হওয়া উচিত ছিল। সে এই ব্যবহারের উপযুক্ত পাত্র।

পথে যেতে যেতে শুকনো এক কদম্বগাছ তলে ছুটি খাঁ এক রাখাল বালককে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই বালকটির কাছে গিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলেন। রাখাল বালক তাঁকে বলল, সে

কোনো পরিবারে পরিশ্রমের পরিবর্তে থাকতে চায়। ছুটি খাঁ সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রহণ করলেন। বালকটি তখন জানতে চাইল, ছুটি খাঁর এমন বন্দীদশা কেন? ছুটি খাঁ বালককে সব কথা খুলে বললেন। সব শুনে বালক বলল, ছুটি খাঁ যদি পীর একদিল শাহ্‌র নামে শিরনি দিতে প্রতিশ্রুতি দেন তবে তাঁর মুশকিল আসান হয়ে যাবে। ছুটি খাঁ শিরনি দিতে প্রতিশ্রুত হয়ে রাজদরবারে পৌঁছলেন।

পীরের অলৌকিক শক্তিতে খাতায় লেখা সেই বকেয়া উধাও হয়ে গেল। দেখা গেল সেখানে উসুল লেখা আছে। রাজা অবাক হয়ে গেলেন। নিজের ভুলে লজ্জায় তিনি মাথা নত করলেন। নিজের মাথার পাগড়ি খুলে নিয়ে পরিয়ে দিলেন ছুটি খাঁর মাথায়। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ক্ষমা চাইলেন অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য।

ছুটি খাঁ মুক্ত হয়ে রাজদরবার থেকে সোজা গেলেন সেই কদমতলায়। রাখাল বালকের কাছে। এইবার ছুটি খাঁর অবাক হওয়ার পালা। শুকনো কদম্বগাছ কোথায় গেল! তার পরিবর্তে সেখানে নবীন কিশলয়ে সজ্জিত এক সতেজ কদম্ববৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। যে বালকটির বয়স ছিল সাত বছরের মতো এখন তাকে দেখতে পেলেন বার বছরের কিশোররূপে। এই পরিবর্তনে ছুটি খাঁ কেঁদে উঠলেন। এ কি মায়া!

পীর সঙ্গে সঙ্গে আবার সাত বছরের কিশোর হয়ে গেলেন এবং সেই চেহারায় ছুটি খাঁর বাড়ি গেলেন। তিনি নানা রকম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ছুটি খাঁর বিশুদ্ধতা পবিত্রতা যাচাই করতে চাইলেন। ছুটি খাঁর ভাই বড়ু খাঁ মনের মধ্যে গোপন আশা নিয়ে বসে আছে, সন্তানহীন ভাই মারা গেলেই তার সম্পত্তি ভোগদখল করবে। এমন সময় পীর রাখাল বালক হয়ে ছুটি খাঁর বাড়িতে এলেন। তিনি পোষ্যপুত্র হয়ে গেলেন ছুটি খাঁর। তাই দেখে বড়ু খাঁ তাঁর প্রতি হিংস্র হয়ে উঠল। সে ভাবল কালে এই বালক তার আশার মুখে ছাই দেবে। সে ঠিক করল বনের মধ্যে যে-কোনো উপায়ে পীরকে হত্যা করবে। অন্তর্যামী পীর কিন্তু বড়ু খাঁর মনের বাসনার টের পেলেন।

একদিন গোধন নিয়ে পীর অন্যান্য রাখাল বালকদের সঙ্গে উখড়ার বনে গেলেন। সেখানে গরুদের ছেড়ে দিয়ে সবাই খেলায় মত্ত হল। একদিল শাহ্ও অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে লাগলেন। বার বার সকলে তার কাছে হেরে যেতে লাগল। ফলে তারা রেগে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আর খেলতে চাইল না। একজন রাখাল তো শ্লেষ মিশিয়ে মন্তব্য করল, একদিল নিশ্চয়ই ভোজরাজার জাদুবিদ্যার খবর রাখে। একদিল শাহ্ ওদের সঙ্গে মজা করবার জন্য নানারূপ বাঘ হাজির করলেন। বিচিত্র নাম বাঘদের ; খালদৌড়া, হালিয়া, নিহালা ইত্যাদি। রাখালরা ভীষণ ভয় পেয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করল। পীর একদিল শাহ্ ওদের কিছু বাঘের খেলাও দেখালেন। এই ঘটনার কথা পল্লবিত হয়ে বড় খাঁর কাছে পৌঁছল। সে রেগে গিয়ে পীরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করল। পীর তা গ্রাহ্য করলেন না। তিনি ইতিমধ্যে ছুটি খাঁ ও তার স্ত্রীর পবিত্রতার কয়েকটি পরীক্ষা করে তাদের ব্যাপারে খুশি হলেন। একবার কদমতলির বনে গরু চরাতে গেলেন তিনি। বনের পাশে ছিল একটি ধানক্ষেত। ধানক্ষেতের মালিক আনোয়ারপুরের মালিক কুঙর শাহ্। কুঙর শাহ্কে শিক্ষা দেবার জন্য একদিল শাহ্ সেই ক্ষেতের ধান গরু দিয়ে খাওয়ালেন। খবর পেয়েই ছুটে এল কুঙর শাহ্। সে একদিল শাহ্কে গালিগালাজ করতে লাগল। উত্তরে পীর বিনীতভাবে বললেন, তিনি অপরাধ করেছেন। তাঁকে ক্ষমা করা হোক। কুঙর শাহ্ লাঠি নিয়ে তাকে মারতে গেল। একদিল শাহ্ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করলেন। কুঙর শাহ্ নিজে না পেরে রাজদরবারে একদিল শাহ্র নামে অভিযোগ করল। রাজা সব শুনে ভীষণ রেগে গেল। তিনি একদিল শাহ্র পালক ছুটি খাঁকে ধরে নিয়ে কারাগারে বন্দী করলেন।

ছুটি খাঁ বুঝতে পেরেছিল তার এই বন্দীত্ব পীরেরই লীলার অঙ্গ। একদিল ছুটি খাঁর অবস্থা দেখে নানারকম কাণ্ড ঘটিয়ে সেই ক্ষেতের ধান আগের মতো করে দিলেন। ব্যাপারটা কেউ জানতে পারল না। পাঁচালীতে লেখা আছে :

পীরের দোয়ায় আর লক্ষ্মীর বরেতে।
যেমন আছিল ধান হইল সেই মতে॥

পরদিন বিচারের জন্য বাদী-বিবাদীর ডাক পড়ল রাজসভায়। পীর একদিল শাহ্‌ও গেলেন সেখানে। অভিযোগের উত্তরে তিনি ফসলের ক্ষতি অস্বীকার করলেন। রাজা তখন চাঁদ খাঁ, মনোহর খাঁ, মনোহর ও শুকদেব নামে চারজনকে সরেজমিনে তদন্ত করতে পাঠালেন। তদন্তকারীরা দেখল সত্যিই শস্যের কোনো ক্ষতি হয় নি। তারা রাজদরবারে গিয়ে যা দেখেছে তাই বলল। সব শুনে সভাশুদ্ধ সবাই অবাক। বাধ্য হয়ে একদিল শাহ্‌র কাছে রাজা ক্ষমা চাইলেন। তিনি ছুটি খাঁকে মুক্ত করে দিয়ে তার পায়ের বেড়ি কুঁওর শাহের পায়ে পরাতে আদেশ দিলেন। রাজার দেওয়া ঘোড়ায় চেপে একদিল শাহ্‌কে কোলে নিয়ে ছুটি খাঁ বাড়ি ফিরলেন। রাস্তায় বড়ু খাঁ তাকে খারাপ কথা বলায় ছুটি খাঁ পায়ের জুতো খুলে তাকে প্রহার করলেন। পরদিন রাজদরবারে বড়ু তার ভাই ছুটির বিরুদ্ধে নালিশ করতে গেল। রাজা আগে থেকেই বড়ুর কুকীর্তির কথা শুনেছিলেন। তিনি তক্ষুনি মহাপাত্রকে ডাকিয়ে দু ভাইর সম্পত্তি ভাগ করতে বললেন। সমস্ত মালপত্র ঘরের বার করা হল।

সেই সব জিনিসের মধ্যে পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর চরিত্র নিয়ে লেখা সুবৃহৎ পাঁচালী ছিল। যা ভাগের সময় খণ্ডিত হয়। পাঁচালীর শুরুতে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। পাঁচালীটি বহু ভাগে বিভক্ত। ডাকিনীর পালায় রাজকন্যা ও ডাকিনীর কথা, কাঞ্চননগরের পালায় সাহানীর ও ডাকিনীর প্রেমকথা, মুরশিদের পালায় বদর পীরের মাহাত্ম্য কথা, হরিণীর পালায় ও ছুটির পালায় ইসলাম ও একদিল শাহ্‌র অপূর্ব মাহাত্ম্য রচিত হয়েছে। এই পাঁচালীতে বাৎসল্য রসের সম্যক পরিচয় রয়েছে। জন্মপালায় পুত্রের জন্য আশক নুরির আকুল প্রার্থনা প্রতিটি মায়ের মনের কথা হয়ে প্রকাশিত। বার বছর আশক নুরি সন্তান বিহনে কিভাবে কাটিয়েছে তার বিবরণ কৃষ্ণ বিরহিণী শ্রীরাধার দশ দশার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই পাঁচালীতে

চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল কাব্যের দেব শিশুর মর্ত্যে আগমনের সঙ্গে আল্লাহ্‌র আদেশে পীর একদিল শাহ্‌র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের মিল রয়েছে। গর্ভবতী নারীর দশ মাসের দশ অবস্থার বর্ণনা এই পালায় পাওয়া যায়। নারীদের ব্যবহৃত সে যুগের অলঙ্কারের এবং প্রসাধনের যে ছবি আঁকা হয়েছে তা সত্যি উল্লেখযোগ্য। নিখুঁত বিবরণে পালাকার চোখের সামনে সে সময়ের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন :

চন্দনের বিন্দু দিল সিন্দুরের কোলে।
চন্দ্রমা উদয় যেন গগন মণ্ডলে॥

শিক্ষালাভ অংশে আল্লাহ্ নিজেই আপন মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন :

এলাহী বলেন খোয়াজ শোন মেরা ঠাঁই।
ত্রিভুবনের লক্ষ্য আমি আমার লক্ষ্য নাই।
কে বুঝিতে পারে খোয়াজ আমার চরিত্র।
মনুষ্য মরে মনুষ্য কান্দে সে হয় পবিত্র।
দয়ামায়া থাকিত যদি মেরা শরীরেতে।
দুনিয়ার কারবার পারি কি বানাতে॥
দয়া হইতে আমি যদি ফিরাই নয়ান।
খানখান হইয়া পড়ে জমিন আসমান॥

মা বাবার সঙ্গে ছেলের বিচ্ছেদ কি সাংঘাতিক অবস্থার তৈরি করে তারই করুণ চিত্র অতি অন্তরঙ্গভাবে এই পাঁচালীতে বর্ণিত। মা বাবার জন্য পীরের অন্তরের বেদনা মূর্ত হয়েছে হৃদয় বিদারক ভাষায়। কবি বাস্তব জীবনের সংগত চিত্রকেই তুলে ধরেছেন তাঁর কলমে। কবির কল্পনা শক্তির স্ফুরণ পাওয়া যায় ডাকিনীর পালায় নারী পরিচালিত রাজত্বের কথায়। একটি বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় হিন্দু রাজকন্যা ডাকিনী অথচ :

কোরান-কেতাব বিনে অন্যে নাহি মন।
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আল্লার কারণ॥

আবার এই ডাকিনীই ব্রাহ্মণের গণনায় বিশ্বাস করে। আগে থেকেই একজন বিধর্মীকে পতিরূপে গ্রহণ করেছেন। কোনো ধর্মীয়

রীতি নীতি বা সংস্কার তার এই ইচ্ছায় বাধা হয় নি। এই পাঁচালীর মধ্য দিয়ে পীর একদিল শাহ্‌র জীবন কথা যেমন বর্ণিত তেমনি সে যুগের হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সামাজিক চেহারাও পরিস্ফুট। সে সময়ের এই স্বাভাবিক অবস্থা কবির লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। যেন সব কিছু ঘটনা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হয়েছে। হিন্দু মুসলমানে বিবাহ, ধর্মান্তর গ্রহণ সব কিছুই ঘটেছে সহজ স্বাভাবিকতায়। এ থেকে তখন যে দু ধর্মের মধ্যে সামাজিক বিরোধ ছিল না তা স্পষ্ট। আজকের এই ধর্মের মধ্যে যেসব সংস্কার বিরোধ সৃষ্টি করে তার কোনো চিহ্ন এই পাঁচালীতে নেই। সামান্য থাকলেও কবি উভয় ধর্মের মিলনকেই বড় করে দেখিয়েছেন।

অন্যান্য বাঙালী হিন্দু কাব্যের মতো এই পাঁচালীতেই সমুদ্র যাত্রার বিবরণ রয়েছে। বর্ণনা রয়েছে নানা ধরনের জলযানের। তাদের বিভিন্ন নাম ; মধুকর চন্দ্র সেন ইত্যাদি। গ্রামের নাম দেওয়া আছে পরপর। লসমনপুরি, কাকুড়াই, টুঙিপুর, গাজীপুর, ঝাউডাঙা। তখনকার সংসারে মায়ে ছেলের সম্পর্ক, সতীন পুত্রের সঙ্গে বিমাতার সম্পর্ক সুন্দর রূপে বলা হয়েছে। এই সম্পর্ক কোনো কোনো জায়গায় যশোদার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। হিন্দু ধর্মকাহিনীর মতো বহু অলৌকিক ঘটনাও আছে এর মধ্যে। যেমন এক জায়গায় :

বিস্‌মিল্লা বলে বিবি চুলা ফুকে দিল।
বেগর আগুনেতে খানা তৈয়ার হইল ॥

মুরশিদের পালায় বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে পীর গোরাচাঁদ কাব্যের ঘটনার মিল দেখা যায়। মুরশিদ পীর শাহ্ জালালের কাছে কঠিন পরীক্ষা দেবার পর পীর গোরাচাঁদ যেমন আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি পীর একদিল শাহ্ গুরুভক্তির কঠোর পরীক্ষা দিয়ে পীর বদরের কাছে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। কাব্যের ভেতর পীর বদরের মুখ দিয়ে কিছু তত্ত্বকথা এবং মানুষের জন্ম-রহস্যের কথা অল্প কথায় বলা হয়েছে। হুরিণীর পালায় কবি ইসলাম ধর্মের গুণগান করেছেন।

ইসলামের ব্যাখ্যা শুনে মোহিত হয়ে ব্রাহ্মণ রাজা নছিরাম মুসলমান হয়েছে। হরিণী ও তার শাবকদের নিয়ে রচিত কাহিনীতে পীর একদিল শাহ্‌র মাতৃ বিচ্ছেদ অংশে বাৎসল্য রস কারুণ্য রসের সঙ্গে মিশে অদ্ভুত এক মাধুর্যকে তুলে ধরেছে। পীরের এক বিশেষ অলৌকিক শক্তি বনের পশুদের আদেশ পালন করানোর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত।

পীর একদিল শাহ্‌ পালায় ছুটির কাহিনী বোধ হয় সবচেয়ে বড়। পীর একদিলকে নিয়ে গড়া কাহিনীর মধ্যেও বাৎসল্য রসের প্রাধান্য। নানা দিক দিয়ে এই পালা বৈশিষ্টামণ্ডিত। যেমন রাখালরূপী একদিল শাহ্‌র সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিল। শ্রীকৃষ্ণ যেমন কংস বধ করেছিলেন, একদিল শাহ তেমনি বড়ু মণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। যশোদার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কর মতো সম্পতির সঙ্গে একদিল শাহ্‌র সম্পর্ক প্রায় একই ধরনের। একদিল শাহ্‌র জীবনী লিখতে গিয়ে কবি যেন প্রতি ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণর কথা মনে রেখেছিলেন। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুলি যেন ফুটে উঠেছে। ইসলামী আদর্শের বহু বিরোধী ঘটনাবলীও এই অংশে স্থান পেয়েছে কবির ইচ্ছেয়। রাজা মন্দির রায়ের দরবারে দেখানো হয়েছে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ নেই। রাজা সুবিচারক গুণীর সমজদার রূপে হিন্দু মুসলমান উভয়ের কাছেই প্রশংসিত। যশোদার কথা মনে রেখেই যেন পাঁচালীকার সম্পতির চরিত্র তৈরি করেছেন। পীর একদিল শাহ্‌কে বহু জায়গায়ই শ্রীকৃষ্ণের মতো করে এঁকেছেন। আনোয়ারপুরে পীর একদিল শাহ্‌র কার্যাবলী কোনো জনহিতকর কাজ নয় বুজরুকি গল্প মাত্র, তবু তাঁকে পাঁচালীতে রাখা হয়েছে অলৌকিকত্ব বোঝাবার জন্য। যেভাবে রাজদরবারকে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে করে সে যুগের রাজসভা এবং তার কাজকর্ম বুঝতে পারা যায়। রাজার সঙ্গে দেওয়ানের সম্পর্ক অনেক নিকট ছিল। ন্যায়বিচারের প্রতি রাজাদের নজর ছিল। দুষ্টরা কখনো রাজার প্রশ্রয় পেত না। ছুটি মণ্ডল মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ। তার পরিবারের এমন নিখুঁত আলোচনা

অন্য কোনো সেকালীন সাহিত্যে বিরল। আর বাংলাসাহিত্যে মুসলিম পরিবারের ছবি বোধহয় এই পাঁচালীতেই প্রথম চিত্রিত। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ ব্যাপারটি যে তখনকার সমাজজীবনে ছিল সে কথাও এই কাব্যপাঠে জানতে পারা যায়। রায় মঙ্গলকাব্যের ছাপ ফুটে উঠেছে বিভিন্ন বাঘের নামকরণের মধ্যে। বাঘকে কবি বেশ নাটকীয়তার সঙ্গে কাব্যে আমদানি করেছেন।

আর এক বাঘ এল কপালে তার চিত।
কেড়ে খায় কোলের ছেলে বসে গায় গীত॥
তার পাছে আসে বাঘ খেতের আলে শোয়।
এমন কিল মারে যেন বোরে ধান্য রোয়॥

সব বাঘদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খালদৌড়া। মনে হয় হয়তো এই নামটি ছিল আসলে খানদৌড়া। কোনো একসময়ে পরিবর্তিত হয়ে খালদৌড়া হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে এই পাঁচালীর কিছু কিছু কাব্যগত মিলও সুস্পষ্ট। পদাবলীতে রয়েছে :

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।

পীর একদিল শাহ্‌ কাব্যে :

আজ বাছা দূর বনে যেও নারে।
নিকটে নিকটে রহ আমারি অঙ্গিরে॥

শ্রীকৃষ্ণ রাখালরূপে গুরু চরাতে চরাতে কদম্ব গাছের তলায় বসে বাঁশি বাজাতেন। পীর একদিল শাহ্‌ কদম্ব গাছের ছায়ায় অন্য রাখাল বালকদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলতেন। এই অংশে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য কোনো কিছু করেছেন এমন কিছু ঘটনা নেই। কোনো হিন্দুর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ নেই। একমাত্র যা কিছু সংঘর্ষ রয়েছে তা অসদাচরণকারীর সঙ্গে। এই কাব্য জুড়ে কোথাও হিন্দু মুসলমানে বিরোধ নেই, তারা মিলেমিশে সমাজ জীবনে বাস করছেন। কবি পাঁচালীতে প্রাকৃতিক বর্ণনাকে কোনো প্রাধান্য দেন নি। ওদিকে তাঁর তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। যেটুকু আছে তা ঘটনার বিবরণ

দিতে গিয়ে অনিবার্যভাবে এসে গেছে। একটি ঘটনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার বিষয়ান্তরে যাওয়ার সময় নতুন ঘটনার সময় নির্দেশ করা হয়েছে কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে। যেমন: 'রাত্রি পোহাইয়া গেল কোকিলে করে রব—'

মধ্যবিত্ত বাঙালী গ্রাম্য মেয়েদের নারীত্ব জননীর স্নেহময়ী রূপ সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে এই কাব্যের সর্বত্রই।

শাড়ির আঁচলে বিবি মোছাইল গাও।
সোনামুখে চুম্ব দিয়া কোলে নিল মাও॥
পীর কোলে নিয়া বিবি বসিলেন দ্বারে।
মায়েরে কান্দিতে দেখে পুছিলেন তারে॥

একই রকম ছবি ডাকিনীর পালায়।

কোলে বসি একদিল ধুয়ে নিল হাত।
মায়ে পুত্রে একস্তরে বসি খায় ভাত॥
দুহস্তে মায়ের গলা একদিল ধরিয়া।
সুখে নিদ্রা যায় পীর রূপের বিন্দিয়া॥

কবি আশক মহম্মদ কাহিনী বুনতে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, বর্ণনায় বা কাব্যরস সৃষ্টিতে তেমন ক্ষমতার পরিচয় রাখতে পারেন নি। তারই মধ্যে দু একটি জায়গায় বর্ণনার মনোহারিত্বে পাঠকের মন ভরিয়ে দেয়। যেমন:

উপনীত হইল পীর রাজদরবারেতে।
আকাশের চন্দ্র যেন নামিল ভূমেতে॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনে একদিল বরণ।
রবির কিরণ নহে তাহার মতন॥
কাল মেঘের আড় যেন বিজলীর ছটা।
কাঁচা সোনা জলে যেন সা-নিরের বেটা॥

কবির ওপর সংস্কৃত প্রভাবও পড়েছে কাব্য রচনার সময় এই বর্ণনায় তার ছাপ স্পষ্ট।

দু-আঁখে কাজল অতি দেখিতে উত্তম।
চলন খঞ্জন পাখি পাইবে শরম॥

হাতে পদ্ম, পায়ে পদ্ম কপালে রতন জ্বলে।
পীরকে দেখিয়া প্রজা ধন্য ধন্য বলে॥

এত গেল সংস্কৃত লেখার উপমাগত মিল। বৈষ্ণব পদাবলীর ছাপও বাদ যায় নি এর কাব্যশরীর থেকে। পদ, শব্দের মিল দুই রয়েছে। যেমন :

মরিব মরিব সখি নিশ্চয়ই মরিব
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব!

ঠিক এই রকম :

মরিব মরিব হিরা মরিব নিশ্চয়।

অন্য এক জায়গায় :

তুমি তো জান না স্বামী নারীর গোঁসাই।
স্বামী বিনে নারীদের কোনো লক্ষ্য নাই॥
শীতের ওড়ন স্বামী গিরিষের বাও।
অসমের কাণ্ডারী স্বামী সোপরের নাও॥

একদিল পীরের অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাব পড়েছে হরিণীর ওপর। বনের স্বাধীন প্রাণী হয়েও সে পীরের একান্ত অনুগত। হলায়ুধ লিখিত সেক শুভোদয়া কাব্যে এ রকম ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে রয়েছে : মেঘের আদেশে সারস তার আহার্য একটা মাছকে তার মুখ থেকে ফেলে দিয়েছে। রসের বিচারে এই পাঁচালী বা কাব্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত পীর একদিল শাহ্‌র গর্ভধারিণী আশক নুরির কাছ থেকে শেষ বিদায়ের ঘটনায় বিয়োগান্ত সুর ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় অংশে পালয়িত্রী মাতা সম্পতির সঙ্গে একদিল শাহ্‌র সম্পর্ক কাব্যের শেষ পর্যন্ত বহাল থেকেছে। এদিক থেকে বলা যায় মিলনান্ত। আনোয়ারপুরের পীর একদিল শাহ্‌র বর্ণিত লীলার বিবরণের সঙ্গে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত বাংলা সরকারের গেজেটে এস. এস. এম. ওয়ালী লিখিত ঘটনার সঙ্গে বহু জায়গায় সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাবলে গেজেটে কোনো অলৌকিক বর্ণনার উল্লেখ নেই। কিছু মিল বা গরমিল দেখা যায় ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে

মিহির পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত পুরাতত্ত্ব বিভাগে মুদ্রিত গল্পের সঙ্গে। পীর একদিল শাহ্ কাব্যে তিন শ্রেণীর চরিত্র আছে। দেবতা, মানব ও পশু। এই কাব্যের আখ্যানভাগে হিন্দুদের দেবদেবী ইন্দ্র ও লক্ষ্মী পীর একদিল শাহ্‌র সাহায্যে এসেছেন। বোঝা যায় না কি কারণে পীর আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন নি। কবির এই কল্পনার পেছনে কি কাজ করেছে তা বলা অসম্ভব। এটা কি গ্রাম্য সরলতার জন্যই হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালার আদেশেই পীর মর্ত্যে এসেছিলেন লীলা করতে, অথচ তিনি আল্লাহ্‌কে ভুলে গেলেন! না কি সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু মুসলমান মিলিত জীবনযাত্রায় এর প্রয়োজন ছিল! কবি কি মুসলমান পীরের সঙ্গে লক্ষ্মী ও ইন্দ্রকে জুড়ে দিয়ে তাঁর বিশিষ্টতাই দেখাতে চেয়েছেন? কাব্যখানিতে অন্য এক আলোয় উত্তরণ করাতে চেয়েছেন? যাতে হিন্দুরাও কৌতূহলী হয়ে এই গ্রন্থ পাঠ করে। বাঘের আর হরিণের মুখে কথা বসিয়েও আরেক ধরনের বিশিষ্টতায় কাব্যখানিকে সাজিয়েছেন। লৌকিক অলৌকিকের সংমিশ্রণ যেন আপনা থেকেই হয়ে গেছে। বাঘ বলছে :

কেন্দু বলে ছোটো দেখে তুচ্ছ কর নাই।
ভেড়া ছাগল বিনা আমি অন্য নাহি খাই॥
বাছুর কুকুর আমি খাই এক চিতে।
ছেলে খেতে পারি পোয়াতির কোল হইতে॥
আমা চাইয়া চোর নাহি খালদৌড়া ভাই।
দশবিশের মধ্যে গিয়া ভেলকি লাগাই॥
কার বাপের শক্তি নাই মোরে বন্দী করে।
সন্ধ্যাকাল হইলে আমি ফিরি ঘরে ঘরে॥
কার্য ধর্মে বুঝিব কাহার কত বল।
শুনিয়া হাসিয়া উঠে বাঘ যে সকল॥

এক এক পালায় এক একটি কাহিনী। ঠিক এই রকম দেখা যায় কৃষ্ণ হরিদাসের বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যা নামক পুঁথিতে।

কৃষ্ণদাস বর্ণিত বড় সত্যপীরের মতো একদিল শাহ্ মর্ত্যে এসেছিলেন আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন করতে। পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত এই কাব্য রচনাটি বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। বারাসতের বাহার আলী সাহেবের কাছে যে একখানি গ্রন্থ আছে তা ছিন্নভিন্ন। তাতে কাব্যের রচনাকাল, কবির কাব্যরচনার সময় বা অন্য কোনো সাল তারিখের চিহ্নমাত্র নেই। তাই সঠিকভাবে এই পাঁচালী কবে রচিত হয়েছিল তা বলা প্রায় অসম্ভব। তবু ঐতিহাসিক-গণ অনুমান করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কিংবা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কাব্যটি লিখিত হয়। আবদুল করিম সাহেব তাঁর পুঁথি পরিচিতি গ্রন্থে 'একাদন' (একদিল নয়) বলে এর উল্লেখ করেছেন। এটা তাঁর ভুল না মুদ্রণ প্রমাদ তাও জানা যায় নি। এমন হতে পারে তিনি হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো পুঁথির কথা লিখেছেন। তাহলেও সকলে মুদ্রণ প্রমাদ বলেই একে অনুমান করেছেন। বহু জীবনীগ্রন্থ প্রণেতা আবদুল গফুর সিদ্দিকী এক জায়গায় লিখেছেন যে একদিল শাহ্ নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ ১২৪১ সালে রংপুর জেলার শীতলগড়া নিবাসী আশক মোহম্মদ রচনা করেছিলেন। যদি তাঁর কথা সঠিক ধরে নেওয়া যায় তো গ্রন্থটির রচনার সময় ১৮৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দে। এই সময়কে গুরুত্ব দেওয়া যায় না অন্য কারণে। এই কাব্যের রচয়িতা আশক মোহম্মদের বসতি শীতলগড়া গ্রামে ছিল না। কবি নিজে তাঁর কাব্যের কবিতায় লিখছেন :

আশক মোহম্মদ কহে জেনোহে সবায়
হরিপুর গ্রাম বিচে বসত যাহার—

এই হরিপুর যে কোন হরিপুর তার কোনো হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশে একাধিক হরিপুর ছিল। তাহলেও বারাসত মহকুমার ভেতরে হরিপুর গ্রাম আছে তাকেই এই উল্লিখিত হরিপুর বলে ধরে নেওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। কারণগুলির মধ্যে প্রথমেই দেখা যায় একদিল শাহ্ কাব্যে রায়মঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যের প্রভাব রয়েছে বিশেষভাবে। অর্থাৎ রচয়িতা আশক্ মোহাম্মদ এই

দুটি হিন্দু পাঁচালী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রায়মঙ্গল কাব্যের কবি কৃষ্ণরাম দাসের বাড়ি ছিল নিমতা গ্রামে এবং মনসা বিজয় কাব্যের রচয়িতা বিপ্রদাস পিপলাই থাকতেন ছোট জাগুলিয়ায়। এই হরিপুর নিমতা ও ছোট জাগুলিয়া গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। দু গ্রামের খুব কাছেই। দ্বিতীয় কারণ হরিপুর গ্রামের আদি বাসিন্দা বিনোদ মণ্ডল বহু পূর্বে যশোহর ত্যাগ করে হরিপুরে এসে আশ্রয় নেন। তিনি পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ আজিজার রহমান সাহেব জানিয়েছেন, তাঁদের পরিবারে মধুমিঞা নামে একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন। মধুমিঞা তাঁর ছদ্মনাম। মধুমিঞা হেলুমিঞা অথবা আশক মোহাম্মদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। তিনটি নামই একজনের। হেলু একটি ফরাসী শব্দ যার মানে ধ্বংস। আবার মিষ্টি কোনো জিনিসকেও হেলু বলে। মধু ও হেলু দুটি শব্দই সেদিক দিয়ে সমার্থক। মধুমিঞা হয় তো তার ডাকনাম। এই মধুর পরিবর্তে তিনি কোনো এক সময়ে হেলুতে পরিবর্তিত হয়ে যান। তাঁর মুসলমানী পোশাকী নাম ছিল আশক মোহাম্মদ। কবি নিজেই এক জায়গায় স্পষ্ট লিখেছেন :

রচে আশক মোহাম্মদ একদিলের পায়।
ওরফেতে হেলু মিঞা জানিবে সবায়॥

তৃতীয়ত হরিপুর গ্রামের সবাই ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত বিনোদ মণ্ডলের পরবর্তী বংশধর। মাত্র অল্প কিছুদিন আগে এক হিন্দু পরিবার এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। মধুমিঞা ছিলেন সেই হিন্দু বংশের সন্তান। সেইজন্যই হয়তো তিনি হিন্দু সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। যার ফলে তাঁর কাব্যের পাতায় পাতায় কৃষ্ণ মাহাত্ম্য মনসা মাহাত্ম্য ও চণ্ডী মাহাত্ম্যর প্রভাব খুব সোজাসুজি এসে পড়েছে। তিনি মানসিকভাবেই এইসব কথা লিখেছিলেন। চতুর্থত এই কাব্যের ব্যবহৃত ভাষায় বারাসত অঞ্চলের বহু স্থানীয় শব্দ দেখা যায়। বরখা গাজী নামে আর একখানি পুঁথির রচয়িতার নাম জানা গেছে সৈয়দ হালু মিঞা। ওই পুঁথি অষ্টাদশ শতকে রচিত।

পীর একদিল শাহ্ কাব্য রচয়িতা হেলু মিঞা আর বড় খাঁ গাজী পুঁথি রচয়িতা হালু মিঞা একই লোক বলে পীর একদিল শাহ্ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেই রচিত। প্রথম বাংলা মুদ্রিত পুস্তক উইলিয়ম কেরীর কথোপকথন ১৮৫১ সালে প্রকাশিত। সুতরাং উনবিংশ শতক থেকেই বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজী শব্দ ঢুকে পড়ে। পীর একদিল শাহ্ কাব্যে কোনো ইংরেজী শব্দ নেই বরং আরবী ফারসী শব্দ প্রচুর রয়েছে। যা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাংলা ভাষা থেকে কমে যেতে থাকে। এসব দেখে অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর ভেতরেই কাব্যখানি রচিত হয়েছিল যখন আমাদের সাহিত্যে ইংরেজী হাওয়া এসে পড়ে নি। একদিল শাহ্র একটি কাহিনী ১৮৯২ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত মিহির পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগে প্রকাশিত এই কাহিনীর সঙ্গে কাব্যজনিত যেমন মিল আছে তেমনি অমিলও রয়েছে। দুই কাহিনীর ভাষার মধ্যে প্রচুর দূরত্ব। উনবিংশ শতকে বাংলা ভাষা আধুনিক হতে চলেছে। মিহিরে প্রকাশিত কাহিনীর ভাষা এ রকম। এক সময়ে শাহ্ দিল নামক এক রাজা বাস করিতেন। তিনি আশক নুরি নামক একজন স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁরা অপুত্রক ছিলেন। (মিহির পত্রিকা)। অথচ একদিল শাহ্ কাব্যের ভাষা :

আল্লার দোহাই লাগে তোমার উপরে
এমত শুনিয়া খিদা নিবিল উদরে
এদিন করিয়া সাধন করিতে লাগিল
রুপি জিরে ডাকি পত করিতে লাগিল। (পীর একদিল্ কাব্য)।

ধর্মীয় সংস্কারের প্রেরণায় কবি আরবী ফারসী শব্দর ব্যবহার করেছেন। কাব্য রচনার মতোই এই গ্রন্থ লিখেছেন। গাজী সাহেবের গীত যেমন গায়কের মুখের গান শুনে লেখা এ কাব্য তা নয়। ভাষাগত বৈশিষ্ট্য কালগত বিচার বিবেচনায় এটা স্পষ্ট যে এই কাব্য ১৮৯২-এর অনেক আগেই লেখা হয়েছিল। সুতরাং কারো কারো মতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বা বিংশ শতাব্দীর প্রথমে কাব্যটি রচিত বলে মনে করা

হলেও তা যুক্তিনির্ভর নয়। এ ব্যাপারে এই যুক্তিগুলি প্রযোজ্য। বড় খাঁ গাজী গ্রন্থ প্রণেতা কালু মিঞা ও পীর একদিল শাহ্ গ্রন্থর কবি যে এক ব্যক্তি নন এমন কোনো প্রমাণ নেই। অতএব দুজনে যদি এক ব্যক্তি হন তো এ গ্রন্থের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীতেই। আরবী ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার, ইংরেজী কোনো শব্দের অনুপস্থিতিতে কাব্যখানি অষ্টাদশ শতকের বলেই বেশি করে অনুমিত। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মিশনারীদের খ্রীস্টধর্মের প্রসারকে বাধাদানের জন্য ইসলাম ধর্মের কঠোর রীতিনীতি কিছু শিথিল করা হয়। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যাতে সমন্বয় হতে পারে তেমন ভাব ফেরাতে আল্লাহ মাহাত্ম্য ও শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার মতো কাহিনীবহুল কাব্যের প্রয়োজন ছিল বলেই মনে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী ভারতীয় ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল সুতরাং এই সময়কে ধরে রাখবার জন্যই এই কাব্য রচিত। কিন্তু তখনো দেশে ছাপাখানা আসেনি, তাই পুস্তকাকারে এই কাব্য ঊনবিংশ শতকে প্রকাশিত হয়ে থাকবে।

পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর জন্ম দেহত্যাগ বা জীবিতকালের সময়ের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আনোয়ারপুরে কখন যে তিনি লীলা প্রকাশ করেছেন তারও সঠিক সময় নির্ণয়ের উপায় নেই। আবদুল গফুর সিদ্দিকী রচিত পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন, পীর একদিল শাহ্ রাজী আনোয়ারপুরে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য পীর গোরাচাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। পীর হজরত গোরাচাঁদ গাজী যতদূর সম্ভব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগের বা শেষভাগের মধ্যে জীবিত ছিলেন। সেই অনুসারে পীর একদিল শাহ্‌র জীবনকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ থেকে পুরো চতুর্দশ শতক পর্যন্ত। চতুর্দশ শতাব্দীতেই তিনি আনোয়ারপুরে অবস্থান করেছিলেন।

পীর একদিল শাহ্ সম্পর্কে অলৌকিক বেশ কিছু কিংবদন্তী লোকের মুখে মুখে আজও ঘুরে বেড়ায়। এই কাহিনীগুলো গভীর বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন বলেই পীরকে তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত বলে ধরে নেন।

আনোয়ারপুরের খ্যাতনামা শাসক চাঁদ খাঁ বারাসত থানায় শ্রীকৃষ্ণপুর মৌজায় থাকতেন। পীর একদিল একদিন এক যুবকের বেশে এই শাসকের গৃহে যান এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আহার্য ভিক্ষা করলেন। চাঁদ খাঁর ভাইয়ের নাম ছিল নূর খাঁ। সে সবল এক যুবককে ভিক্ষা দিতে রাজী হল না। বরং উপদেশ দিয়ে বলল, তুমি যথেষ্ট শক্তিশালী যুবক, এভাবে ভিক্ষা না করে শ্রমের বিনিময়ে আহার্য উপার্জন করো না কেন? একদিল শাহ্ এই কথার উত্তর দিলেন না। নূর খাঁ আবার বলল, এক কাজ করো। আমাদের একটি মসজিদ তৈরি হচ্ছে, ওখানে গিয়ে কাজ করো, তোমাকে অবশ্যই পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। তাহলে তোমার আর ভিক্ষার প্রয়োজন থাকবে না। যে কোনো কারণেই হোক নূর খাঁর এই কথায় পীর সাহেব খুশি হতে পারলেন না। তবু তিনি মসজিদের কাজে গিয়ে যোগ দিলেন। মনে মনে ঠিক করলেন নিজের অলৌকিকত্বর পরিচয় এখানে রাখতে হবে। তিনি কাজের ফাঁকে বিরাট ওজনের বিশাল এক পাথরকে মসজিদের ওপর এমনভাবে কায়দা করে রাখলেন যে তার ওপর আর একটাও ইট রাখা সম্ভব হল না। ফলে মসজিদের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। আর কেউই সেই মসজিদ সম্পূর্ণ করতে পারে নি। স্থানীয় মানুষরা এই ঘটনায় অবাক হয়ে গেল।

আর এক কাহিনীতে জানা যায় বারাসত থানার পাটুলী গ্রামে একদিল শাহ্‌র একটি স্মৃতি মাখা স্থান আছে। সেখানকার বটগাছ আর বাঁশঝাড়ে বাস করত অসংখ্য বাদুড়। একদিল শাহ্‌র প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ ওই বাদুড় কেউ হত্যা করে না। একবার এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের কোনো এক সন্তান কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। কোনো ডাক্তার কবিরাজ তাকে সারিয়ে তুলতে সক্ষম না হওয়ায় ভদ্রলোক আর কোনো আশা না দেখে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল। তখন সে স্বপ্নে একটি ওষুধের সন্ধান পেয়ে গেল। অদ্ভুত মজার ওষুধ! যার অনুপান হল বাদুড়ের মাংস। সে আবার যে কোনো জায়গার বাদুড় হলে চলবে না। পাটুলীর বটগাছের বাদুড়

চাই। এই ওষুধ খাওয়ালে ছেলেটির জীবন বেঁচে যাবে। ভদ্রলোক একদিন বন্দুক নিয়ে পাটুলীতে ছুটল। বাদুড় শিকারের জন্য সে পৌঁছে গেল যথাস্থানে। এ জায়গার বাদুড় অবধ্য—এটাই স্থানীয় অধিবাসীদের মনে গেঁথে আছে। তাই তারা তাকে দেখে অমন কাজ করতে বারণ করল। সব শুনে ভদ্রলোক তার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাল একদিল শাহ্‌র প্রতি। তারপর উপস্থিত জনতাকে বলল, অসুস্থ পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য স্বপ্নে আমি এই ওষুধ পেয়েছি অতএব সেও তো আল্লাহ্‌র নির্দেশ, তাহলে এতে অপরাধটা কোথায়। এই কথা বলে আর একবার একদিল শাহ্‌র প্রতি তার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে সে পুনরায় বাদুড় মারতে উদ্যত হল। উপস্থিত জনতা তাই দেখে বলল, এ কাজ করলে অচিরেই আপনার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। ভদ্রলোক তাদের নিষেধ শুনল না। বার বার পীর একদিল শাহ্‌কে শ্রদ্ধা জানিয়ে বন্দুক বাগিয়ে বাদুড় শিকার করল।

বাদুড় সংগ্রহর পর সে মিষ্টান্ন সংগ্রহ করে পীর সাহেবের নামে লুঠ দিল। তারপর ফিরে গেল নিজ বাড়িতে। অদ্ভুত কাণ্ড! অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল! ওই বাদুড়ের মাংস অনুপান হিসেবে খেয়ে তার ছেলে ভাল হয়ে গেল। তার কোনো ক্ষতিও হল না। অনেকে হয় তো ভাববেন এর মধ্যে অলৌকিকত্ব কোথায়! কিন্তু ওখানের মানুষের ধারণা এই ঘটনায় পীর একদিল শাহ্‌রই শক্তির পরিচয় বহন করছে।

পীর একদিল শাহ্ যখন কাজীপাড়ায় ছুটে খাঁ ও তাঁর পত্নীর আশ্রয়ে ছিলেন তখন তিনি একদিন ওঁদের তাঁর প্রতি ভক্তি পরীক্ষার জন্য এক কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। গরুর পাল নিয়ে মাঠে চরাতে গিয়েছিলেন তিনি। এক আধটা গরু নয়—বিরাট গোধন। সবশুদ্ধ প্রায় সাতশো হবে। তিনি জিগীর ছেড়ে হঠাৎ সেই সাতশো গরুকে সাতশো বক করে শূন্যে উড়িয়ে দিলেন। সেই বকগুলো বড় মণ্ডলের বাড়ির আশে পাশে গিয়ে বসল। পীর শূন্য হাতে ধুলোবালি মেখে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলেন। দম্পতি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করল। পীর উত্তরে বলল, খেলা

করতে করতে এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ঘুম ভেঙে দেখেন গরুগুলো কোথায় চলে গেছে। তিনি একটাকেও আর খুঁজে পান নি। রাজদরবার থেকে ফিরে ছুটি খাঁও সেই কথা শুনলেন। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর কেউই এত বড় দুঃসংবাদে বিচলিত না হয়ে ভক্তিভরে পীরকে জানালেন :

ঘর দ্বার গরু যাক তার নাহি দায়।
আমরা বিকিয়েছি তোমারই যে পায়॥

কিন্তু বড়ু মণ্ডল রাগে অন্ধ হয়ে ছুটি খাঁকে তিরস্কার করতে লাগল। ছুটি খাঁ বিরক্ত হয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করে তাকে বিদায় দিলেন। রাত গভীর হতে লাগল। সবাই খাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত আরো গভীর হলে পীর ঘরের বাইরে এসে কদম্ব গাছের তলায় দাঁড়াতেই সেই সমস্ত বক শূন্য থেকে মাটিতে নেমে এল। পীর আবার দিলেন এক হুঙ্কার। এবার বকেরা রূপ নিল বাঘের এবং এক এক করে গোয়ালে ঢুকে পড়ল। পরদিন পীরের এই কাণ্ড-কারখানা দেখে সবাই হতবাক হয়ে গেল। বাঘগুলিকে পরে আবার গরুতে পরিণত করে দিলেন পীর সাহেব। ভক্তি পরীক্ষায় ছুটি খাঁ ও তাঁর স্ত্রী উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।

পীর হজরত একদিল শাহ্ হাতে একটা বাঁশের ছড়ি রাখতেন। ছড়িটি প্রস্তুত হয়েছিল বিশেষ এক জাতের বাঁশ দিয়ে। জায়গীরপ্রাপ্ত আনোয়ারপুরের দিকে হাতে এই ছড়িটি নিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। এবং সেখানে পৌঁছে যান। তার নির্দিষ্ট দেশে এসে পড়েছেন জেনে জায়গাটাকে চিহ্ন দেবার জন্য হাতের সেই খেড়ু বাঁশের কঞ্চিটি মাটিতে গভীর করে পুঁতে দেন। সেই ছড়ি থেকে দেখতে দেখতে খেড়ু বাঁশের বংশবিস্তার হয় এবং ঐ স্থান রূপ নেয় বিরাট এক বাঁশবনের। সবাই পীরকে শ্রদ্ধা ভক্তি করত। তাই ওই বনের বাঁশ কেউ কাটত না। এই সেদিন, গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু সৈনিক ঐ বাঁশঝাড়ে তাঁবু ফেলেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন অবহেলায় বাঁশবনের প্রচুর ক্ষতি করল এবং পীরের কথা শুনে তাঁর

প্রতি অশোভন উক্তি করল। যে সৈনিক বাঁশবনের ক্ষতি করেছিল সে মারা গেল সাপের কামড়ে। এই খেড়ু বাঁশবন এখনো দেখা যায় মহকুমা শাসকের বাংলোর পেছনে।

একদিল শাহ্ সব সময়েই একটা ছড়ি হাতে রাখতেন। এই ছড়ির একটা নামকরণও ছিল। এটাকে বলা হত আশবাড়ি। জাতুকর যেমন জাতুদণ্ড ছুঁইয়ে নানারকম ম্যাজিক দেখায়, পীর সাহেবও তেমনি এই ছড়ি দিয়ে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাকে প্রকাশ করতেন। তিনি আনোয়ারপুর আসবার সময় গঙ্গানদী পার হবার জন্য এই ছড়ির সাহায্য নিয়েছিলেন এমন কথিত আছে। ওই ছড়িটাকে তিনি গঙ্গানদীর ওপর আড়াআড়ি ফেলে দেন। ছড়িটা নৌকোর কাজ করে, তিনি ছড়ির ওপর চড়েই অনায়াসে নদী পার হয়ে যান।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন নামকরা অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। বারাসতে একদিল শাহের নজরগাহের একপাশে তাঁর বসতবাড়ি তৈরি করাচ্ছিলেন। প্রধান রাজমিস্ত্রীর নাম ছিল উজীর আলি। একদিন মিস্ত্রী ছাদ ঢালাই করাচ্ছে। সেদিন খুব উৎসাহের সঙ্গে মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ চলছিল। এর ফলে পীর একদিল শাহ্র নজরগাহে যে লোক প্রতিদিন ধূপ জ্বেলে দেয় সে তার কাজ ভুল করে। সেদিন ছিল চমচমে জ্যোৎস্না। চারপাশে আলোর প্লাবন। গভীর রাত হয়েছে। চারদিক ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। এমন সময় উজীর আলির পেটে কেমন একটা ব্যথা উঠল। সে ঘুমতে পারল না কিছুতেই। একটু বাদেই তাকে উঠে পায়খানায় যেতে হল। আগেকার দিনে সাধারণতঃ লোকে বাড়ির বাইরে মাঠে ময়দানে পায়খানা করত।

বাইরে এসে হঠাৎ সে দেখতে পেল, দূরে সাদা আলখাল্লা পরে দীর্ঘকায় একজন ফকির পীর সাহেবের নজরগাহের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ভয় এবং কৌতূহল তুইই একসঙ্গে উজীর আলির মন ছেয়ে ফেলল। ভাল করে দেখবার জন্য সে দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করল। ফকিরের অবয়ব এবার স্পষ্ট তার চোখে ভেসে উঠল। টকটকে

ফরসা রঙ। মুখভরা সাদা দাড়িগোঁপ। এবার তার নিচু পর্দার গলা শোনা গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন এখানে এরা আজ ধূপবাতি জ্বালতে নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। মনে হয় কাজে খুব ব্যস্ত ছিল। একটুক্ষণ থেমে আবার তিনি বললেন, যাকগে, ভুল তো হতেই পারে। তাতে কি হয়েছে। এইটুকু বলে তিনি সেই এক দরজার নজরগাহের মধ্যে ঢুকে পড়লেন মাথা নিচু করে। উজীর আলি এতক্ষণ সম্মোহিত হয়েছিল। দরবেশ চোখের আড়াল হতেই জ্ঞান ফিরে পেল। তাঁকে দেখবার জন্য দ্রুত সে নজরগাহের কাছে গেল। ঘরের মধ্যে খুঁজল তাঁকে। কোথায় কে! ঘরটা ফাঁকা পড়ে আছে। বাইরে এসে চারপাশে খোঁজ করতে লাগল উজীর আলি। কিন্তু অনেক খুঁজেও কাউকে সে আবিষ্কার করতে পারল না। ঘটনাটা তাকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিল।

উজীর আলি তাঁর সঙ্গী মানুষদের ডেকে ঘুম থেকে ওঠাল। এক এক করে সবাইকে সে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল সেদিন অত রাত পর্যন্ত কাজ হওয়ায় কেউই নজরগাহে ধূপবাতি জ্বালে নি। তক্ষুনি উজীর আলি সেখানে ধূপবাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা করল। তার সেই ব্যথা ততক্ষণে সেরে গেছে।

পরদিন সকালে এই ঘটনার কথা সে সবাইকে বলল। ডাক্তার বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও সব কথা জানতে পারলেন। তিনি তাঁর বাড়ি তৈরির সঙ্গে সঙ্গে নজরগাহের কাঁচা বাড়িটা পাকা করে দিলেন। সেখানে নিয়মিত ধূপ জ্বালবারও বন্দোবস্ত করলেন। আজো এত বছর বাদেও সেই রীতি চলে আসছে।

বারাসতের একজন বর্ধিষ্ণু মানুষ মহিম রায়। তিনি তাঁর গোধন দেখবার জন্য একজন রাখালকে বহাল করেছেন। সেই রাখাল অন্য কেউ নয়—ছদ্মবেশী পীর একদিল শাহ্। কেউই তা বলে ব্যাপারটা জানত না। গরুগুলোর অযত্ন হত। তাদের থাকবার মতো উপযুক্ত গোয়ালঘর ছিল না। এর জন্য পীর একদিল শাহ্ প্রতিবাদ করেছিলেন। ফলে মহিম রায়ের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর কথা কাটাকাটি

হয়। শেষ পর্যন্ত সেই ঝগড়া হাতাহাতি হবার উপক্রম দেখা দেয়। মহিম রায় রাখালকে মারতে যান। যদিও তাঁকে মহিম রায় নাগালের মধ্যে পাননি। লোকে বলে পীর তখন খড়ম পায়ে একটা পুকুরের জলের ওপর দিয়ে দৌড়ে চলে যান। রাত্রে মহিম রায় স্বপ্ন দেখলেন। পীর একদিল শাহ্ তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে নিজের পরিচয় প্রদান করেন। এই স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে পড়তেই রায় স্টেটের লোকদের ভেতর একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ফলে পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন রায়ের স্টেট থেকে পীরের স্মরণে বহু জমি পীরোত্তর করে দেওয়া হয়।

পাটুলী গ্রামের মধ্যে রয়েছে বিশাল এক জলাভূমি। এর পাশেই একদিল শাহ্‌র স্মৃতিস্থান। সবাই বলে ঐ জলাশয় ও তার ওপারে ভূতের আড্ডাখানা। রাত তো কোনো ব্যাপারই নয়, ভর দুপুরেও এখানে ভূতের ভয়ে মানুষ দূরে থাক কোনো কুকুর পর্যন্ত যায় না।

এদিককার ওঝাদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ওঝা হল কলিমুদ্দিন। ভূত প্রেত দৈত্য-দানো নাকি লোকে বলে তার হুকুমের চাকর। সবাই তার কথায় ওঠে বসে। গভীর রাতে নির্ভয়ে সে যে কোনো জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সে ভূতেদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। সে নাকি কথাও বলে।

একবার মাছের সময় ওই ভূতের পুকুরে সে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তা আবার দিনে নয়—গভীর রাতে, সঙ্গে ছেলেকে নিয়ে। ছেলের নাম আসগর। ছেলেও বাপের মতো। যেমন শরীরে শক্তি রাখে তেমনি তার মনের সাহস। বাপবেটায় জাল ফেলছে তো ফেলছে। কোথায় মাছ! জালে কোন মাছই পড়ছে না। কলিমুদ্দিনের মনে হল মেছো ভূত তার পেছনে লেগেছে। সে কষে ধমক লাগাল। কিন্তু মেছোভূত বোধহয় ধমক গায়ে মাখল না।

আসগরের মেজাজ চড়ে গেল, সে জালে পড়া একটা মাছকে লাঠি দিয়ে আঘাত করল। ওই মাছটার মধ্যেই ভূতটা ভর

করেছিল। ভাণ্ডার বাড়ি পেয়ে কঁকিয়ে উঠল সে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওদের সামনে দিয়ে জলাশয়ের ওপারে চলে গেল। এবার সেই ভূত তার অগণিত সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মারদাঙ্গা করার ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে ওদের কাছে এসে পড়ে। সেই রাতে কলিমুদ্দিন হঠাৎ কি যেন এক দুর্বলতায় শিউরে ওঠে। তার দেহ মন অসাড় হয়ে যায়। সে ভয় পায়। ভয় পেয়ে ছেলেকে বলে, আসগর আজ রাতটা খুবই খারাপ। চল আমরা পীর সাহেবের দরগাহে আশ্রয় নি।

তারা দুজনেই দৌড়ে এসে দরগাহে ওঠে এবং একদিল শাহ্‌র নাম স্মরণ করতে থাকে। ভূতের দল নাকি তাদের তাড়া করে পেছন পেছন এসেছিল কিন্তু পীরের থানে ঢুকতে পারে নি। তারা রেগে ওদের উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলে, দরগায় না উঠলে আজ তোদের কাদায় পুঁতে রাখতাম।

ভোর হলে বাপবেটা বাড়ি ফিরে সবাইকে এই ঘটনার কথা জানায়। সবাই শুনে থ হয়ে যায়। তারা অনুভব করে ওঝার ওঝা কলিমুদ্দিনকে পীর একদিল শাহ্‌ই রাতে বাঁচিয়ে দিয়েছে। পীর সাহেব ছিলেন হিন্দু মুসলমান সবার শ্রদ্ধেয়। তাঁর নামে মাথা নত না করে এমন মানুষ এ অঞ্চলে নেই। তাঁর নামের প্রভাব এমন যে ভূতরাও কিছুতেই তাঁর দরগায় পা দিতে সাহস করে নি।

প্রত্যেক বছর পাটুলী গ্রামের কাজীপাড়ায় মেলা বসে। ঐ মেলায় প্রথম দিনে সব রাখাল ছেলে মিলে পীর সাহেবের স্মৃতিস্থানে চড়ুইভাতি করে। কথিত আছে জীবিতকালে পীর একদিল শাহ্ নিজে রাখালরূপে অন্যান্য রাখাল ছেলেদের সঙ্গে ওই স্থানে চড়ুইভাতি করতেন। রাখাল ছেলেরা চড়ুইভাতির জন্য দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরে উপকরণ যোগাড় করত। একবার দেশে আকাল দেখা দিল। অভাব-অনটনে গ্রামবাসীরা রাখালদের সাহায্য করতে পারল না। সবাই ভাবল পীরকে স্মরণ করে এতদিন যে প্রথা চলে আসছে এবার তা বন্ধ হবে। সবাই যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারপর তারা দল বেঁধে বারাসত মহকুমা শাসকের আদালত প্রাঙ্গণে জমায়েত

হয়ে চেঁচামেচি করে শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁর নাম ছিল অমৃতলালবাবু। তিনি তাড়াতাড়ি সেই গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরকে ডেকে পাঠালেন। তাদের বললেন, আপনারা সকলে যতটুকু খাবার একদিন খেয়ে বেঁচে থাকেন সেটুকু পীরের নামে উৎসর্গ করুন। তা দিয়ে চড়ুইভাতি করা হলে সকলেরই যশ বাড়বে যেমন, তেমনি সরল কিশোর বালকরা খুশি হবে আনন্দের জোয়ারে। অমৃত-বাবুর কথা সবাই শুনল এবং সেই থেকে আজও বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ওই প্রথা চালু রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদার চাঁদ খাঁর সেই অসমাপ্ত মন্দিরের বিশাল ও নিদারুণ ভারী পাথর কালের নিয়মে একদিন ভেঙে মাটিতে পড়ল। মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে পাশের পুকুরের কাছে চলে আসে। পীর একদিল শাহ্‌র ছোঁয়া লাগা এই পাথর খণ্ডটি নাকি সচল ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় পাথরটি নাকি ওই পুকুরের জলে ভেসে বেড়াত। সাধারণ মানুষরা তাকে কখনো এ ঘাটে কখনো ও ঘাটে দেখতে পেত। অথচ কেউই পাথরটাকে ধরতে পারত না। কথিত আছে জনৈক রমণীর অশৌচ আচরণে পাথরটির এই অলৌকিক ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। পাথরটিও কি ভাবে কে জানে দু টুকরো হয়ে পড়ে। আজো কোনো লোক ওই পাথরের টুকরোকে ধরে কোমরের ওপরে তুলতে পারে নি। চৈত্র বৈশাখ মাসে পুকুরের জল শুকিয়ে গেলে আজো তার মধ্যে এক টুকরো পাথর দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৬৪ সালে কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দেখা দিয়েছিল তার প্রভাব বারাসতের কোনো কোনো অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। সেই বিষাক্ত বিভেদের হাওয়াকে দুষ্ট লোকেরা কাজী-পাড়ার মধ্যেও প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু কাজীপাড়ায় তাদের অভিসন্ধি সফল হয় নি। কাজীপাড়া ও তার সন্নিহিত গ্রামের দু সম্প্রদায়ের মানুষই একটা কোনো আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়ল। এই বিপদে পথ কি তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। হিন্দুরা মনে মনে বলল, পীর বাবা একদিল শাহ্‌ আছেন, সুতরাং আমাদের কিসের ভয়।

মুসলমানরাও মনে মনে বলল, পীর একদিল শাহ্‌র দোয়ায় আমরা আছি। অতএব দুর্বৃত্তরা দূর হঠো। একরাতে দু দলই প্রস্তুত আত্মরক্ষা করতে। সেই রাতে দুর্বৃত্তরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কাজী পাড়ায় ঢোকবার চেষ্টা করেছিল। হাসপাতালের উত্তর পূর্বদিকে মাঠ আছে। তারা সেই মাঠের পথ ধরেই এগোতে থাকে। কাজীপাড়ার কাছে এসে হঠাৎ তাদের মনে হল যেন বহু লোক বীরদর্পে সীমারেখা বরাবর ঘোরাঘুরি করছে। একটু বাদেই তাদের চোখে পড়ল সাদা আলখাল্লা পরে এক দীর্ঘ যোদ্ধা পুরুষ বিরাট এক বাহিনীকে যেন কুচকাওয়াজ করাচ্ছে। তাদের কানে সেইসঙ্গে ভেসে আসে রাইফেলের গুলির কয়েকটা আওয়াজ। এবার তারা ভয় পেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি কাজীপাড়া আক্রমণ না করেই পালিয়ে যায় অন্ধকারে। পরে লোক-মুখে ঘটনাটি সকলের কানে গিয়ে পৌঁছায়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাই বুঝতে পারে পীর সাহেবই তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন নিজের অলৌকিক মহিমা বিস্তার করে।

পীর একদিল শাহ্‌র এখন যে স্মৃতিসৌধ দেখা যায় প্রথম দিকে তা একটা খড়ের ঘর ছিল মাত্র। পীর নিজে এই ঘরেই থাকতেন পরে এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। সেই খড়ের ঘরটি মাঝে মাঝেই মেরামত করতে হত। একবার ঘরের চালের খড় এবং খুঁটি বদল করার সময় এক আশ্চর্য অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। ঘরের মিস্ত্রী মাপমতো বাঁশ কেটে নিল। অন্যান্য কাজ শেষ করে সেই মাপ ঠিক আছে কিনা আর একবার যাচাই করতে গিয়ে সে দেখল, নির্দিষ্ট মাপে কাটা সেই বাঁশখণ্ড কোনোটা বড় কিংবা কোনোটা ছোট হয়ে গেছে। সে তখন হতবাক হয়ে গেল। বিমূঢ় অবস্থা তার! কেন এমন হল? উপায় না দেখে সে পীর একদিল শাহ্‌র শরণ নিল। যখন বাঁশ খণ্ডগুলো চালে লাগাতে গেল সে দেখল সেগুলো আবার মাপসই হয়েছে। পীর একদিল শাহ্‌র অলৌকিক শক্তির প্রভাব এমন যে ওই দরগাহ্‌র তিনটে বাঁশের খুঁটি বহুদিন কাঁচা অবস্থায় থেকে গিয়েছিল। সাধারণ লোক তাই দেখে অবাক হয়ে গেছে। ক বছর আগে পাগলা

একজন লোক অশৌচ অবস্থায় বাঁশ তিনটে ছুঁয়ে ফেলে। ফলে তা শুকিয়ে যেতে থাকে। তিনটে বাঁশের দুটি এখন দরগাহ্‌র একপাশে পীর একদিল শাহ্‌র কীর্তি হিসেবে পড়ে রয়েছে।

বারাসত মহকুমার জগৎপুর গ্রামে পীর একদিল শাহ্‌র নজরগাহ্‌র নামে কিছু জমি ছিল। জমির ভেতর ছিল প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ গাছ। একবার চৈত্রের ঝড়ে ওই বিরাট গাছের বহু ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ে। একজন মজুর দেখতে পেয়ে সেই শুকনো ভাঙা ডাল নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। রাত্রে সেই কাঠ পুড়িয়েই রান্না করে। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে, একটি বাগদি মেয়ে তাকে বলছে, পীরের অশ্বত্থ গাছের ডাল পুড়িয়ে তুমি রান্না করেছ। কাজটা ভাল হয় নি। মহা অন্যায়ের দায়ে পড়েছ তুমি। এখন বাকী কাঠটুকু ফিরিয়ে দাও। না হলে তোমার সাংঘাতিক ক্ষতি হবে। স্বপ্নের এই কথা শোনামাত্র তার ঘুম ভেঙে গেল। বাকী রাত সে না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল। ভোরের আলো ফুটতেই সে বাকী যা কাঠ ছিল তা বোঝা করে নিয়ে ওই গাছের তলায় রেখে এল।

জাফরপুর গ্রামের পাশের গ্রামের নাম কিলিশপুর। মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ওই গ্রামে বাস করে। সে একবার ওই মজুরের মতো অন্যায় কাজই করেছিল। পীরের কাঠ নিলে ক্ষতি হবে একথা মানতে মকবুল রাজী ছিল না। সকলকে দেখিয়ে অবহেলায় অশ্বত্থ গাছের কাঠ সে বাড়ি নিয়ে যায়। সে খুব খুশি। ভাল জ্বালানি হবে। কয়েকজন তাকে বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, ওই কাঠগুলি বাড়ি নিও না। কিন্তু অহংকারী মকবুল হোসেন কারো কথাকে গ্রাহ্য করে নি।

আগেরদিন বিকেলে কাঠ বাড়ি নিয়েছিল মকবুল। পরদিন সকালে দেখা গেল সে কাঠের বোঝাটা গাছের নিচে কখন রেখে গেছে। সবাই তাকে প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার? উত্তরে মকবুল বলল, সারারাত কেউ একজন তাকে বারবার ভয় দেখাতে লাগল। রাত ভর ঘুম হল না। তাই সকালেই ওই বোঝা গাছের নিচে নামিয়ে রেখে গেলাম।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই গোলাম রববানি নামে একজন স্থানীয় লোক পীরের নামে পতিত কয়েক কাঠা জমিতে চাষ করবে ঠিক করল। তার এই ইচ্ছার কথা শুনে অন্যেরা তাকে বারণ করল। কিন্তু সে কারো কথাই কানে তুলল না। পীরের জমিতে সে নারকেল চারা পুঁতল। সেই চারা রোপণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে মারাত্মক ক্ষয় কাশ রোগে ধরল। এবার ভয় পেয়ে জমি থেকে গাছগুলি সে তুলে ফেলল। মনে মনে ভাবল, আর না ঢের শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল বুঝতে। তাই গাছ তুলে ফেললেও রোগের হাত থেকে সে বাঁচল না। ক্ষয়কাশেই তার জীবনদীপ নিবে গেল।

জাফরপুরের নজরগাহে বহুদিনের পুরনো একটা বাবলা গাছ ছিল। বহুদিন থাকবার পর গাছটা শুকিয়ে মরে যায়। একজন লোক ওই গাছের গোড়ায় হঠাৎ একদিন এক ভাঁড় রুপোর টাকা পায়। সে কাউকে কিছু বলে না। গোপনে ঐ টাকা দ্বারা বড়লোক হয়ে যায়। সাধারণ লোক হঠাৎ তার পরিবর্তন দেখে বিস্ময় বোধ করে। কিন্তু বেশিদিন রহস্যটা চাপা রইল না সাধারণের কাছে। অল্প কদিনের মধ্যেই সে কঠিন রোগে পড়ল। এবং নিজের পাপের পরিণাম এই রোগ বুঝতে পেরে পীরেরই শরণাপন্ন হল। এখানেও দেরি হয়ে গিয়েছিল তার। ফলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই অপরাধের মুক্তি হল তার।

একদিল শাহ্ রাখাল বেশে আনোয়ারপুরে গরু চরাতেন। মেঘমেদুর বরষার দিনে গরু নিয়ে তিনি খুব দূরে যেতেন না। কাজীপাড়ার সীমানার কাছে মাঠের মধ্যেই বর্ষণক্লান্ত দিনগুলি কাটিয়ে দিতেন। মাঠে গরুরা চরত। তিনি আলের পাশে উঁচু ঢিপির উপরে বসে তা দেখতেন। ওই ঢিপি ছাড়া বসার অন্য কোনো জায়গা ছিল না। মাঠের সর্বত্রই প্যাচপেচে কাদায় ভরা। স্থানীয় লোকরা উঁচু ঢিপিগুলোকে আঁইট বলত। একদিল শাহ্ বসতেন বলে পরবর্তী রাখাল বালকরা ঢিপিগুলোকে তাঁর স্মরণে খুব ভক্তি

করত। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীরাও ঢিপিগুলোকে একদিল শাহ্‌র আঁইট বলত। শোনা যায় কোনো কোনো ভক্ত এই আঁইটে মানত বা শিরনি দিত।

আগেই বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলেছি। তার ছেলের নাম কনককুমার চট্টোপাধ্যায়। একদিন তিনি দোতলার ঘরে বসে পড়াশুনো করছিলেন। পড়তে পড়তেই কখন তার ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ সেই ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালা দিয়ে তাকাতেই বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। সামনে নজরগাছের ছাদের ওপর সাদা আলখাল্লা পরে দীর্ঘকায় এক ফকির বসে। ভয় পেয়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন। চীৎকার শুনে তাঁর মা দৌড়ে এলেন। মাকে চীৎকারের কারণ বললেন কনককুমার। ততক্ষণে সেই মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে। সব শুনে মা ছেলেকে বললেন, 'বাবা আলখাল্লাধারী ওই ফকিরই পীর একদিল শাহ্‌। তাঁকে তুমি দেখেছ। উনি সকলের কল্যাণের জন্য মাঝে মাঝে আসেন।

পীর একদিল শাহ্‌ তাঁর সঙ্গী রাখাল বালকদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলতে ভালবাসতেন। এক থেকে দেড়হাত লম্বা একটা কাঠের লাঠিকে ড্যাং বলা হয়। গুলি বলতে দু মুখ ছুঁচলো চার পাঁচ ইঞ্চি একটা কাঠের টুকরো। পীর ছিলেন ড্যাংগুলি খেলায় দক্ষ। তিনি তাঁর ড্যাং-এর সাহায্যে গুলিকে মেরে বহুদূর পাঠিয়ে দিতেন। এতদূর পাঠাতেন যা শুনলে মনে হবে অসম্ভব কথা। শোনা গেছে তাঁর ড্যাং-এর বাড়িতে কোনো কোনো গুলি অনায়াসে পাঁচ ছ মাইল পথ পেরিয়ে যেত। এখনো লোকের মুখে গল্প শোনা যায় জাফরপুরে একবার খেলতে খেলতে তিনি তিনটি গুলিকে এমন আঘাত করেছিলেন যে তা যথাক্রমে আদেলপুর, পাটুলী ও হুমাইপুর গ্রামে গিয়ে পড়েছিল। ওই তিন গ্রামের যেখানে যেখানে গুলি পড়েছিল সেই সেই জায়গায় একদিল শাহ্‌র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উঁচু মাটির ঢিপি এতকাল মাথা উঁচু করেছিল। কেবল হুমাইপুরের ঢিপিটা কে বা কারা নষ্ট করে ফেলেছে। ড্যাংগুলি খেলার সময়ে ড্যাংএর সাহায্যে

গুলিকে দূরে আঘাত করাকে খেলার পরিভাষায় বলে অ্যানামারা। অ্যানামারাকে উদ্দেশ্য করে ছড়া প্রচলিত আছে :

অ্যানাগুলি ব্যানার যা
যেদিক পারিস সেদিকে যা
নিলাম নাম একদিল পীর
চলল গুলি হুমাইপুর··· ।

পুস্তিকা রচনা করেছেন কাজীপাড়া নিবাসী কাজী খাদেকউল্লাহ্। এই পুস্তিকার ভূমিকা ও নিজের কিছু বক্তব্যের কাছে তিনি নিচের নাম দেওয়া কাহিনীগুলিকে সন্নিবেশিত করেছেন। যথাক্রমে : ১। রাখালগিরি ২। চাষীর বিস্ময় ৩। জাহাজডুবি ৪। বারাসতের বুকে ৫। জীবিত বাঁশের কাহিনী ৬। পবিত্র পুকুরের কাহিনী ৭। চোরের সাজা ৮। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষদের দ্বারা জমি দান ৯। প্রাণ পেল ধড়ে ১০। সজাগদৃষ্টি। তাঁর পুস্তিকার কয়েকটি কাহিনী জনৈক বইয়ের মুদ্রিত ঘটনার ছায়া নিয়ে রচিত বলে মনে হয়। বর্তমানে একদিল শাহের ঘটনা কিংবদন্তিতে ভরে গেছে। বিকৃত বর্ণনা তার মূলের প্রকৃত ঘটনাকে চাপা দিয়েছে। সূফী দরবেশ বা পীরকে স্বস্থানে রাখলে সকল মানুষেরই আত্মোন্নতির বিকাশ ঘটে।

আর একটি প্রচলিত ঘটনার কাহিনী দিয়ে পীর একদিল শাহ্‌র মহান জীবনী শেষ করছি। পীর সাহেবের দরগাহে অনেক পায়রা বাস করে। গরীব ভক্তরাও শত অভাব অনটনের মধ্যে এইসব পায়রার আহার্যের জন্য ধান বা গম দিয়ে থাকে। পায়রাগুলি একদিল শাহের পায়রা বলেই পরিচিত। পীরের পায়রা বলে কেউ তাদের হত্যা করে না। একবার একজন অহংকারী পায়রালোভী ব্যক্তি দরগাহ্ থেকে একটা পায়রা ধরে হত্যা করে সেই মাংস রান্না করে খাবার জন্য প্রস্তুত হয়। কড়াইতে তেল গরম করে তাতে মাংস দিতেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে যায়। এমন আগুন যা তার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়ে ধারেকাছের সমস্ত খড়ের চালে আগুন

লাগিয়ে দেয়। সামান্য সময়েই সমস্ত খড়ো বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, পীরের খড়ের চালের দরগাহ্ গৃহটির কোনো ক্ষতি হয় নি। এ থেকেই বোঝা যায় পরলোক-গমনের পরও যুগযুগান্ত ধরে পীর সাহেবের পবিত্র আত্মা আমাদের কল্যাণার্থে আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন ও দুষ্কৃতকারীকে তার হঠকারিতার শাস্তি দিচ্ছেন।

মৌলানা সৈয়দ নিসার আলী

সৈয়দ নিসার আলীকে সকলেই তিতুমীর বলে জানে। পোশাকী নামটা চাপা পড়ে গেছে নথিপত্রের আড়ালে, ইতিহাসের পাতায়। ভারত বিখ্যাত পীর হজরত শাহ্ জালাল এয়মনির অন্যতম শিষ্য পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর একত্রিংশ অধঃস্তন পুরুষ। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার অধীন হায়দারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাধারণ মধ্যবিত্ত কৃষক ছিলেন। ছোটবেলায় সৈয়দের প্রায়ই ঘুসঘুসে জ্বর লেগে থাকত। গ্রাম্য টোটকা চিকিৎসা হিসেবে তাকে তেতো খাওয়ানো হত—শিউলী পাতার রস—এসব খেতে তাঁর কখনো আপত্তি ছিল না। তাঁর দিদিমা জালাল খাতুন আদরে নাতিকে তিতা মিঞা বলে ডাকত। এ থেকেই পরবর্তীকালে মীর তিতা মিঞা তিতুমীর নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

কিশোর বয়সে চাষের কাজে লেগে যাওয়ায় তার স্বাস্থ্য খুব সুন্দর হয়ে ওঠে। এই সময়ে শরীরচর্চা করতেন তিনি। মল্লযুদ্ধ, সড়কি-চালনা লাঠিচালনা প্রভৃতি ব্যায়াম ও খেলায় পারদর্শী হন। তিতুমীরের বাল্যকালে দেশে চোর ডাকাতের দৌরাত্ম্য ছিল, সেই সঙ্গে জমিদারের ভাড়াকরা পাইকদের অত্যাচার। তিনি মনে মনে সংকল্প করেছিলেন এইসব অত্যাচারের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করবেন। নদীয়ায় তিনি এক জমিদারের অধীনে চাকরি করেন। এই সময়ে অন্য এক জমিদারের বিপক্ষে দাঙ্গা করার জন্য তিনি অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁর জেল হয়। জেল থেকে মুক্তিলাভ করে বেদনাহত মন নিয়ে তিনি মক্কায় গমন করেন। সেখানে শাহ্ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর সাহচর্য লাভ করে মানসিক শান্তি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি ওয়াহাবী ধর্মাদর্শে দীক্ষা নেন। তার কিছুদিন বাদেই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে তিনি ওয়াহাবী ধর্ম-

প্রচারে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প নিলেন। তখনকার দিনে যারা হিন্দু বা বৌদ্ধ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করত তাদের আচার-আচরণ ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী ছিল না। ওয়াহাবীরা চেয়েছিলেন তা দূর করতে। আর এজন্য আন্দোলনও শুরু করলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তখন অরাজক অবস্থা চলছিল। জমিদার ও নীলকরদের তাণ্ডবে সাধারণ মানুষের দুর্দশার সীমা ছিল না। কৃষক সমাজের জীবনে সবচেয়ে বড় দুঃখ দেখা দিয়েছিল। প্রায়ভাগ অত্যাচারিত কৃষকই ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের। জমিদার ও ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের পাশে দাঁড়াবার মতো একজন লোকের খুবই অভাব-বোধ করছিল চাষীরা। যে ন্যায় ও সত্যের জন্য কৃষকদের সংঘবদ্ধ করবে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা দেবে। ওয়াহাবী ধর্মান্দোলনকারীদের সামনে নিপীড়িত জনসাধারণের ন্যায্য দাবী রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্যকর্ম রূপে দেখা দিল। শুধু মুসলমান চাষীরা নয়, হিন্দু চাষীরাও তাই আপন স্বার্থরক্ষার জন্য নিজেদেরকে আন্দোলনের শামিল করল। এই হিন্দুরা ছিল নীচুজাতের, সামাজিক দিক দিয়ে যারা উচ্চবর্ণের হিন্দুর অবজ্ঞা আর ঘৃণার নির্যাতন সয়ে আসছিল জন্মসূত্রে। ফলে হিন্দু উচ্চবর্ণের প্রতিও তাদের সহজাত বিদ্বেষ ও ক্ষোভ জমা ছিল।

তিতুমীর নিজে ছিলেন কৃষক সন্তান। ফলে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতায় তিনি চাষীদের সুখ দুঃখের খবর জানতেন। সহজ কারণে তাই তিনি তাদের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন। এবার তিনি নেতৃত্ব দিয়ে ব্যাপক এক কৃষক আন্দোলনকে সংঘটিত করলেন। নীলচাষ ছিল সাহেবদের কাছে বিরাট লাভজনক ব্যবসা। তাই নীলকর সাহেবরা এসব অঞ্চলে প্রভূত নীলের চাষের জন্য ভীষণ তৎপর ছিল। স্থানীয় জমিদাররা স্বার্থ সিদ্ধির আশায় সাহেবদের মদদ যোগাতে ব্যস্ত হত। তাঁরা তাঁদের জোর খাটিয়ে আরো বেশি নীলচাষ করাতে চাইল। সাহেবরাও খালি নীল বোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। জমিদাররা চেয়েছিল ইংরেজদের তাঁবেদারী করে নিজেদের ভাগ্য

ফেরাতে। তাই তারা সাহেবদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে স্বাগত জানাল না। উল্টে এই আন্দোলন দমন করবার জন্য অত্যাচারের মাত্রাকে চরমে তুলল। তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত আইন বানাল। হুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদের রায়ও মুসলমানদের দাড়ির ওপর কর বসালেন। এগিয়ে এলেন তিতুমীর। তিনি এবার দৃঢ়ভাবে তাঁর প্রতিবাদ জানালেন। তিতুমীর স্পষ্ট বুঝলেন এইসব জমিদাররা ইংরেজদের কাছ থেকে উসকানি পেয়েই এমন জোর দেখাচ্ছে। সুতরাং সবচেয়ে আগে দরকার ইংরেজদের হাটানো। তারা শক্তিহীন না হলে জমিদারদের দম্ভ কমবে না। দেখতে দেখতে কৃষক আন্দোলন ইংরেজ বিতাড়ন আন্দোলনের রূপ নিল। তিতুমীর সংকল্প নিলেন : ১। এদেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে হবে ২। দেশে স্বাধীন সার্বভৌম সরকার গঠন করতে হবে ৩। ইংরেজ শাগরেদ জমিদারদের দমন করে কৃষকদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে হবে।

তিতুমীর পরিচালিত ওয়াহাবী আন্দোলনকে কেউ কেউ ধর্মসংস্কার ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নামে আখ্যা দিয়েছেন। যাঁরা তা করেছেন বেশ বোঝা যায় তাদের বক্তব্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত। নিচের কারণগুলি থেকে তা বোঝা যায়। যেমন :

হান্টার সাহেব 'ভারতের মুসলমান' নামে বিখ্যাত পুস্তকে লিখেছেন, কায়েমী স্বার্থপর বা যে কোনো সম্পদ ব্যক্তির কাছেই ওয়াহাবীদের উপস্থিতি ভীতি উৎপাদন করেছিল। ওয়াহাবী আন্দোলন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুসলমানদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিহিত ছিল না, নিম্নশ্রেণীর অবহেলিত হিন্দুরাও এর শামিল হয়েছিল। ক্যান্টায়েল স্মিথ তাঁর ভারতে আধুনিক ইসলাম পুস্তকে বলেছেন,— ...ওয়াহাবী বিদ্রোহ ছিল পূর্ণমাত্রায় শ্রেণীসংগ্রাম। এ থেকে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়েছিল। 'শহীদ তিতুমীর'কে আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেছেন, তিতুমীর অন্য মতাবলম্বী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাদের বহু মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার অন্যদিকে ভূষণার জমিদার মনোহর রায় তিতুমীরের পক্ষে ছিলেন এবং নানাভাবে

তিতুমীরের আন্দোলনের সহায়তা করেছিলেন। ইংরেজ ভক্ত ও তিতুমীরের প্রথম বাঙালী জীবনীকার বিহারীলাল সরকার আজ থেকে একশ বছর আগে ইংরেজ আমলের স্বর্ণ যুগে 'তিতুমীর ও নারিকেল বাড়িয়ার লড়াই' বইতে লিখেছেন, তিতুমীর এইসব অঞ্চলের বিভিন্ন জমিদারীর অধীনস্থ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে জমিদারের খাজনা বন্ধ করবার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে প্রজারা খাজনা বন্ধ করে। দেখতে দেখতে সন্নিহিত কয়েকটি গ্রামের চাষীরা তিতুকে স্বাধীন বাদশাহ্ বলে মেনে নেয়।

ভারত থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তিতুমীর ছিলেন অগ্রগণ্য শহীদ ও নেতা। সংগ্রাম করতে করতেই তিনি বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেন—একথা লিখেছেন অধ্যাপক শান্তিময় রায়। তিনিই প্রথম শহীদ হবার সম্মান লাভ করেন পরাধীন ভারতে। তাঁর আন্দোলনকে তাই কোনো কারণেই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যায় না। যারা তা বলেন তারা ইতিহাসের সত্যকে স্থির করে আপন উদ্দেশ্য সাধন করতে চান। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক প্ররোচনায় তারা এইসব কাহিনীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলঙ্ক বিষ বুনে দিতে প্রস্তুত।

সূফী আদর্শের ন্যায় লৌকিক ইসলামের আদর্শানুযায়ী তিতুমীর বর্তমানে পীরের পর্যায়ে উন্নীত বলে কেউ কেউ মনে করেন। ডঃ এনামুল হক লিখেছেন, 'শহীদ তিতুমীর ওয়াহাবী পন্থী, সূফী মতবাদী নন। তবু তাঁর আদর্শ ছিল প্রায় সূফী আদর্শের মতো লৌকিক আদর্শ।' তিতুমীরের বহু ভক্ত ও অনুরাগীরা তাঁকে সূফী পীর ফকিরের মতোই শ্রদ্ধা করেন। আজ দুশো বছর কেটে গেছে, এখনো যশোহর খুলনা নদীয়া চব্বিশ পরগনার জনসাধারণ তাঁর ঐতিহাসিক মৃত্যুর জন্য অন্তরে এক গৌরব অনুভব করেন। তিনি ছিলেন জনগণের প্রাণের মানুষ তাই তাঁর কর্মগাথা লোকমুখে প্রচারিত হয়ে উদ্দীপনার জোয়ার আনে। ১৯৭২ সালে এই মহামানবের দ্বিশতজন্মবার্ষিকী স্মরণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংহতি সমিতির

উদ্যোগে নারিকেলবাড়িয়ায় একটি শহীদ স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীপ্রভাতকুমার পাল যে গান গেয়েছিলেন তা হল :

তুমি বীর বিপ্লবী বীর সালাম লহ সালাম
নিপীড়িত কৃষকের কাছে বীর তিতুমীর একটি নাম।
জমিদার জোতদার ইংরাজ বেনিয়া
বুভুক্ষু কৃষককে মেরেছিল দলিয়া
বলেছিলে তুমি সহিও না আর এ অত্যাচার অবিরাম ॥
লড়ে যাই ধরি ভাই হাতিয়ার সকলে
অধিকার আপনার কেড়ে আনো দখলে
রক্তলোলুপ শ্বাপদে নাশিতে কর আপসহীন সংগ্রাম ॥
কৃষকের সরকার করেছিল গঠন
ছিল নাক জুলুম অবসান শোষণ,
মুক্তি আনন্দে করে ঝলমল এই এলাকার প্রতি গ্রাম ॥
তব ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে স্বাধিকার রক্ষায়
সহস্র জান কোরবান নারিকেলবেড়িয়ায়
মুক্তি পথের তুমি যে শহীদ লহ মোর ছোট্ট সালাম ॥

মোহাম্মদ মুজিম বিশ্বাস প্রমুখ সেবায়েতগণ তিতুমীরের স্মৃতি বিজড়িত মসজিদে ধূপবাতি প্রদান করেন। প্রতি বছর বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত সলুয়া নামক গ্রাম থেকে মহরমের সময় এক তাজিয়া বেরয়, সেই তাজিয়া শোভাযাত্রা সহকারে নারিকেলবেড়িয়ায় তিতুমীর স্মৃতি স্থলে আসে। পথে নানা গ্রামের লোকেরা তিতুমীরের প্রতি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তিতুমীরের জন্মস্থান হায়দারপুরেও মহরমের সময় বিরাট উৎসব হয়। এই উৎসবে আট দশ হাজার লোক যোগদান করে। দশদিন ধরে উৎসব চলে। শেষদিনে জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

দরিদ্র জনগণকে অত্যাচারিত কৃষককুলকে বাঁচাতে সাধক তিতুমীরকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। তিনি এক ঐতিহাসিক ক্রান্তি-

কালে পশ্চিমবঙ্গের অবহেলিত সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থে ও নাটকে তিতুমীরের জীবন ও সংগ্রাম এভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর জন্মভূমি হায়দারপুর অঞ্চলে ইংরেজ অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে। চাষী সদানন্দের ছেলে রতন গুলি খেয়ে মারা গেছে। খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ দানা বাঁধছে। কালি সুবেদার সিং ইংরেজদের হয়ে বিদ্রোহের নেতা তিতুমীরকে বন্দী করবার জন্য ব্যস্ত। জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যে কোনো মূল্যে তাঁর জমিদারী রক্ষায় ব্যস্ত। তাঁর কর্মচারী হীরালাল জমিদারীটা কেড়ে নেবার মতলব ভাঁজছে। ব্যবসায়ী দীনবন্ধু হাতি তৎপর মুনাফা লুণ্ঠনের চিন্তায়। এদেশে ধর্মীয় স্থান গড়ে তুলবার ও তার সর্বেসর্বা হবার প্রচেষ্টায় মিশকিন ফকির উঠে পড়ে লেগেছেন। দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সর্বত্র হতাশা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তিতুমীরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান হলে ষড়যন্ত্র করে। জমিদারের ভাগ্নে অনাদি দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তিতুমীরের পাশে এসে দাঁড়াল। এই ঘটনায় মিশকিন ফকির ক্রুদ্ধ হলেন। হিন্দু মুসলমানে মৈত্রী থাকলে তাঁর স্বপ্ন বাস্তব হবে না। তাই তিনি তিতুমীরের মৃত্যুই চান। কায়দা করে তিতুমীরের ছেলেকে তিনি সুবেদার সিং এর কবলে পাঠালেন। সেই সুবেদার সিং এর স্ত্রী তিতুমীরের কাছে ইচ্ছে করে ধরা দিলেন। সুবেদার সিং ভুল বুঝলেন তিতুমীরকে। এই ঘটনায় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিতুমীরের পুত্র বাদশাহ্‌কে গুলি করে মারলেন প্রতিশোধ নেবার জন্য। তিতুমীর কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখলেন। হিংসার প্রতিরোধে মহত্ব জেগে উঠল। তিতুমীরের সহযোগী অনাদি। অনাদিকে ভালবেসে তিতুমীরের বোন পিয়ারা তাকে বিয়ে করতে চাইল। অথচ রুস্তম বলে একজন পিয়ারাকে ভালবেসে পাগল। অনাদিও পিয়ারাকে ভালবাসে। তবু রুস্তমের কথা মনে করে সে সরে দাঁড়াল দুজনের মাঝখান থেকে। অনাদি দেশত্যাগী হল। অথচ রুস্তম ধরা পড়ে গেল ইংরেজের হাতে। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল।

চারদিকে অশান্তির আগুন। স্বার্থান্ধ মানুষের সঙ্গে সরল কৃষক

শ্রেণীর সংগ্রাম। তিতুমীর নারিয়ালবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা করে শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। কালীপ্রসন্নর মতো মানুষরা ইংরেজদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলেন। কিছু লোকের বেইমানী এক এক করে সকলের চোখে স্পষ্ট হল। অনাদি গুলি খেয়ে প্রাণ দিল। বল্লমের আঘাতে মিশকিনের জীবন শেষ হল। গুলির ঘায়ে সুবেদার সিংও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। বুকে গুলি খেলেন তিতুমীরও। কালীপ্রসন্ন নিজের ভুল বুঝে তিতুমীরের কাছে ক্ষমা চাইলেন তিতুমীর তখন মৃত্যুমুখে। তিনি শেষবারের মতো বললেন, বিদেশী শত্রুর হাত থেকে গরিব দেশবাসীকে বাঁচাতে গ্রামে গ্রামে যেন এই বাঁশের কেল্লা গড়ে ওঠে।

তিতুমীরের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। প্রশস্ত উদার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন এই সাধক সংগ্রামী। ধর্মের ওপরেও তিনি স্থান দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতাকে। যদ্দারা তাঁর চরিত্রের বিশেষ একটি মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

পরাধীনতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে, নির্যাতিতের আর্তনাদে সাড়া দিয়ে সূফীত্বকে সাময়িকভাবে ত্যাগ করে যে সাধক শক্তিশালী ইংরেজকে বিব্রত করে তুলেছিলেন, সত্য-ন্যায়ের আদর্শ পতাকা কাঁধে তুলে যিনি লড়াই করেছিলেন, নিজের কলিজার তাজা তপ্ত খুন ঢেলে দিয়ে যিনি দেশমাতৃকার জন্য শহীদ হলেন তার ধর্মীয় আদর্শকে রক্ষা করার জন্য উৎসর্গীত প্রাণ একদল লোকের দরকার। জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই হবেন এর শামিল। এর ফলে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ত্বরান্বিত হবে।

মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় আদর্শকে সঠিকভাবে বুনে দিয়েছেন তিতুমীর। তিনি ছিলেন সাধক, ধর্মপ্রচারক। কিন্তু সাধারণ নিপীড়িত মানুষের সেবার তাঁকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগঠক হয়ে পড়তে হয়। তাঁর নেতৃত্বে গরিব চাষী হিন্দু মুসলমান শুধু লাঠি হাতে করে মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওয়াহাবী আদর্শকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন তিতুমীর। কিন্তু তাঁকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে হল

অত্যাচারিত মানুষের আর্তনাদ শুনে। পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ তাই এই মহান মানুষটিকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে। শুধু মুসলমানরাই নয়, হিন্দুরাও তিতুমীরকে জানে একজন বীর মহান পুরুষরূপে। একজন সমাজসংস্কারক শ্রেণীর জন্মদাতারূপে। তিনি বিশাল ছিলেন বলেই সামান্য অস্ত্র নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, হিন্দু মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করে ইংরেজ এদেশ শাসন করবে। তাই তাদের হটানোই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি যে মন্ত্র পড়তে পড়তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তার মূল্যায়ণ হলে আমরা হিন্দু মুসলিম পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে কুণ্ঠিত হব না। তিনি ঘন ঘন উচ্চারণ করতে থাকেন—'আল্লাহ্ আল্লাহ্।' অর্থাৎ তিনি তাঁর অনুসারীদের জানালেন: ধন্যবাদ সেই মহান আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ। মহাশক্তিময়, করুণাময় ও ন্যায়ময় বিচারককে ধন্যবাদ। সৃজন তার মহিমা, জীবন তার করুণা। ত্রাণ তার গরিমা, তাকে ধন্যবাদ। কোটি কোটি ভুবন জীবের মহাস্বামী,—ইঙ্গিতে তার লক্ষ সূর্য, গ্রহ চলে, গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় জীবনের জ্যোতি খুলে, অন্তহীন তার দয়ার ধারা সাধু সজ্জন পাপী তাপীর তৃষিত কণ্ঠে সমানভাবে সুধা ঢালে, চরমে তারই করুণা কোনো লোকের কাম্য মাণিক জ্বলে—তাকে ধন্যবাদ। আল্লাহ্ তুমি আমার, আমি তোমার। তুমি আ · মা···র! তাবৎ বাংলাদেশের মানুষের কাছে একাধারে সাধক, সংগ্রামী নেতা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ হয়ে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি অমর ও শ্রদ্ধাভাজন।

শাহ্ সূফী ইনায়েত আলি

শোকসন্তপ্ত মানবজীবনকে যদি মরুভূমির সঙ্গে তুলনা করা যায় তো সাধকরা হলেন সেই মরুভূমির মরূদ্যান। তাঁদের প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত জীবন তৃষ্ণার্ত রুক্ষ জীবনের সন্তাপ হরণ করে। তাঁরা বিভ্রান্ত জীবনকে সোজা পথে নিয়ে আসেন। মলয়পরশে হৃদয়কে আরাম দেন। সাধক আবদ্ধ থাকেন না ক্ষণকালের বন্ধনে, তিনি উন্মুক্ত। তাঁর মুক্তি কবির ভাষায়, আলোয় আলোয় এই আকাশে। সাধক সমস্ত মানুষের মুক্তি চান, ঈশ্বর সন্নিধান চান, আমরা চাই কামনার আবিলতা। তাই আমরা যেখানে সঙ্কীর্ণ, সাধক সেখানে পরিপূর্ণ। সাধকের জীবন তাই ব্যাপ্ত ও অনন্ত প্রসারিত।

সাধারণ মানুষও সাধকের এই মুক্তি ও ব্যাপ্তিতে পৌঁছতে পারে। সেও আকাশের মতো সীমাহীন হয়ে ছড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য চাই ব্যাকুলতা। আত্মসুখকে বিলুপ্ত করে দেবার সাধনা। নিজের ভেতর যে আমি আছে তার সংহারের মধ্যেই নিখিল চরাচরের বিরাট আমি জেগে উঠবে। সাধক ছড়িয়ে পড়বে সবার প্রাণের সমন্বয়ে। তখন জীবন অমৃত মনে হবে। ঈশ্বরানুভূতি জীবনকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তৃপ্তির সাগরে নিয়ে অবগাহন করাবে। এই ব্যাখ্যা অনুভবের, বাণী দিয়ে একে বোঝানো যায় না। পরমেশ্বর কি তার যেমন বর্ণনা হয় না, তেমনি বলা যায় না কি রকম তাঁর করুণার আস্বাদন।

শাহ্ ইনায়েত আলি এই অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিলেন জীবনে। লাহোর জেলার অন্তর্গত কাসুরে শাহ্ ইনায়েত আলি ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বাগবান (মালী)। কথিত আছে ইনায়েত আলি নিজেও শালিমার বাগের প্রধান বাগবান ছিলেন। সাধকেরা মূলত বাগবান। তাঁদের প্রকৃতি সুন্দর, প্রিয়তমের যা কিছু মধুর ও সুন্দর তাই চয়ন করা ও চোখ ভরে তাকেই দেখা তাঁদের কাজ।

তাই শাহ্ ইনায়েত কৈশোর জীবনে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন কাশ্মীরী গুলাবের নধর চিক্কন গাছে ফুল ফোটা দেখে। যেদিন প্রথম ধরেছে কলির মতো প্রথম ফোটা ফুল, দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তা দেখেছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে অপূর্ব এক দার্শনিক চিন্তার জন্ম নিয়েছিল। মলিন মাটির রসে অভিষিক্ত কাঁটাভরা ডালপালার ভেতর থেকে কেমন করে এমন অপরূপ দৃষ্টিনন্দন রূপের স্ফূর্তি হল? এ কি তাজ্জব! এই শোভা সুষমার জন্মলাভের মূল উৎস কোথায়? তাঁর এই চিন্তায় শুধু দর্শনতত্ত্ব ছিল না, সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা ছিল তা হলপ করে বলা সম্ভব নয়। তবু মনে হয় তিনি সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে স্রষ্টার খোঁজ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অন্তর্মনে এক অগোচর বিপ্লব দোলায়িত হয়েছিল রূপকে কেন্দ্র করে অরূপকে ছোঁয়ার জন্য। মনের মধ্যে এক আনন্দঘন রসের সঞ্চার হয়েছিল এই দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে। নিচের কবিতায় সে কথাই স্পষ্ট প্রতিফলিত।

> আমার কাননে এই গুলাবের সুগন্ধ সুরভি,
> এই যে প্রথম ফুল, তোমার রচনা যেন কবি।
> কে তুমি জানি না, শুধু স্পর্শসুধা অন্তরে সঞ্চিত
> ফুলের, আমার বুকে। এত কাছে তবুও বঞ্চিত
> তোমার সুষমা থেকে। আজ শুধু চোখ চেয়ে দেখা,
> বিশ্বের লাবণ্যকান্তি ভাবরস চিন্তা একা একা
> মনের গভীর দেশে, অনুভূতি এখনো অস্ফুট,
> তোমার করুণা মাগে চিনারের কচি পত্রপুট।

প্রথম জীবনের অনুভূতির কথা তাঁর পরবর্তী জীবনে এই পত্রপুট করুণা ও প্রেমের বর্ষণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সন্দেহাতীতভাবে।

শাহ্ ইনায়েত ছিলেন আরংগজেবের সমসাময়িক। শাহ্‌জাহানের রাজত্বের কিছুটাও তিনি দেখেছিলেন। কালের প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। আরবী ফারসী দু ভাষাতেই তাঁর দখল ছিল। বাল্যকাল থেকে মরমী ভাবাপন্ন ছিলেন তিনি। গুলাবের গন্ধে তাঁর মনের দল পাপড়ি মেলতে শুরু করেছিল। সে যুগের বিখ্যাত

সূফী ছিলেন মোহাম্মদ আলি রফশতানী। এই মনীষী সাধককে গুরুরূপে গ্রহণ করেন ইনায়েত। তারপর কাসুর থেকে লাহোরে চলে আসেন। হয়তো গুরুর আদেশেই জন্মভূমির মায়া কাটিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের কাদিরীপন্থী সূফীরা বিখ্যাত তাঁদের দার্শনিক তত্ত্ব ও ব্যাখ্যার জন্য। নতুন এক আলোচনার দিগন্ত উন্মুক্ত করেন তাঁরা। যার প্রভাবে শাহজাদা দারা শিকোহ্ কাদেরী সূফী মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। শাহ্ ইনায়েত এই নতুনপন্থীদের দার্শনিকতাকে বিশেষভাবে জানতেন। এমনকি তাঁর কাছে হিন্দু দর্শন ও যোগ সাধনাও অপরিচিত ছিল না। প্রাচীন হিন্দু সাধকরা মুক্তির জন্য কিভাবে সাধনা করতেন, তাঁদের সাধনক্রিয়ার প্রক্রিয়াবিধি কেমন ছিল তার বর্ণনা শাহ্ ইনায়েত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দস্তুর উল আলম' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে সাতটি ভিন্ন পন্থার বিবরণ রয়েছে। ইনায়েতের মতে শেষ পন্থাটিই পরমহংস স্তর লাভের জন্য বিশেষ উপযোগী। এই গ্রন্থটি ছাড়াও তিনি সূফী মতবাদ, তার ক্রমোন্নতির ধারা ও বিশ্লেষণ নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে 'ইসলাহ্-উল আলম', 'লতায়িফ গাইরিয়া', 'ইরশাদ-উল তালিবীন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোরআন শরীফের একটি তফসীরও তিনি রচনা করেছিলেন।

শাহ্ ইনায়েত ছিলেন শিক্ষিত পরিমার্জিত সাধক। তাঁর নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার ছিল। শিখদের উত্থানের সময়ে তাদের বিদ্রোহের দাবানলে যে আগুন জ্বলে ওঠে তাতেই গ্রন্থাগারটি পুড়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। এটা শিখদের ইচ্ছাকৃত অপকীর্তি বলে অনেকেই অনুমান করেন। ১৭৩৫ সালে সাধকজীবন শেষ করে শাহ্ ইনায়েত লোকান্তরিত হন। তাঁরই ভাবরসে উদ্বুদ্ধ হয়ে বুলেহ শাহ্ উচ্ছ্বাসের আবেগে বিস্ময়কর কাব্যগাথা ও গান রচনা করেন। তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে শাহ্ ইনায়েতের কাছে তাঁর মনের কথা স্বীকার করেন। একটি স্তবকে সেই শ্রদ্ধা উদ্ভাসিত।

'বুলেহ শাহ্ কি সুনো হেকায়েত
হাজী পাকড়িয়া হোগ হেদায়েত
মেরে মুরশিদ শাহ্ ইনায়েত
উহ লংঘাই পার।'

স্তবকটির ভাষা পাঞ্জাবী হলেও সরলতার জন্য তার অর্থ বেশ স্পষ্ট। শাহ্ ইনায়েত বন্দনার বাণীতে যে প্রেমের রস বর্ষণ করেছিলেন তাই বিরহমিলনের চোখের জলে ভিজে বুলেহ শাহ্র কাব্য ও জীবনকে প্লাবিত করে। ভক্তের মনে সে প্লাবনের ঢেউ আজও অব্যাহত, চির প্রবাহিত রসপিপাসু কবি সাধকের মনে। যেমন তার নিরাসক্ত আনন্দের ঝংকার।

তোমারি ঝরণাতলার নির্জনে বসে আমরা তার রসপ্লাবনের অফুরন্ত ধারায় অবগাহন করি। চারিদিকের তিক্ততা ও রুক্ষতার মধ্যে আমরা চাই সামান্য একটু শীতলতা ও আনন্দের আশ্রয়। মরুর মধ্যে ছায়াঘেরা সুন্দর মধুর একটি মরূদ্যান।

হে মহান সূফী! আমরা তোমাকে জানাই সালাম-আস্‌সালাম, হৃদয়ভরা প্রণাম।

মাধোলাল হুসাইন

শীতার্ত রাত। ঘন কুয়াশার চাদরে চারপাশ ঢাকা হিমেল উত্তরের হাওয়া বইছে। তারই ভেতর রাভি নদী বয়ে চলেছে শীতল বরফগলা জল বুকে নিয়ে। হিমালয়ের কোথাও হয়তো বরফের ধস নেমেছে। সেই বরফ গলে গলে আসছে নদী বেয়ে। ক্ষীণ নদী হলেও রাভি খরস্রোতা। শীতকাল হওয়া সত্ত্বেও তার তনুতে অকাল যৌবনের আমেজ।

রাভি, বিয়াস আর সাটলেজ প'ঞ্জাবের তিন নদী। হঠাৎ হঠাৎ হিমানী প্রবাহে এই তিন নদীই যৌবনপ্রাপ্ত হয়। উচ্ছল হয়ে শীতল জল বহন করে। নদীর জলে তখন কেউ অবগাহন করে না। এই মারাত্মক হিমস্রোত সইতে পারবে কেন মানুষ! বিশেষ করে রাতে। অথচ কি আশ্চর্য, এক দীর্ঘদেহী প'ঞ্জাবী যুবক এই শীতার্ত রাতে রাভির মধ্যে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সবল তাঁর বাহু, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত বক্ষ আর তেমনি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। সেই উদাত্ত কণ্ঠে তিনি কোরআন শরীফের আয়াত আবৃত্তি করে চলেছেন, একটার পর একটা। অকম্পিত কণ্ঠস্বরে চতুর্দিক গমগম করছে। যুবকটি আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী উচ্চারণ করে তাঁরই বন্দনা করছেন। বিচিত্র তার সুর ছন্দ লালিত্য ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকার, কুয়াশার জাল, নিস্তব্ধতার হিম ঢাকনাকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। একটি পরম প্রশান্তি বিস্তারিত হচ্ছে পবিত্র কোরআন শরীফের বাণীতে। এই রাত, আকাশভরা নক্ষত্র, নিস্তব্ধতা এই সবই তো তাঁর সৃষ্টি। তিনিই তো চক্রের মতো দৃশ্যের পর দৃশ্যপট ঘোরাচ্ছেন।

শুধু একটি রাত নয়। রাতের পর রাত নির্জন মুহূর্তে রাভি নদীর বুকে দাঁড়িয়ে তাঁর আরাধনা চলে। পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে তখন এই যুবক খোদার বন্দনা করেন। তিনি তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য, সান্নিধ্য লাভের জন্য পরম পবিত্র বাণী উচ্চারণ করতে

থাকেন। কে এই যুবক! কি তার পরিচয়? যে তাঁর তরুণ জীবনকে আল্লাহ্‌র পায়ে নিবেদন করে বসে আছেন? এর নাম মাধোলাল হুসাইন। পাঞ্জাবের অমৃত পুত্র শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক। ১৫৩৯ সালে লাহোরে এই পরম সাধক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন রাজপুত হিন্দু। হুসাইন যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁদের পরিবারে চলছে চরম দুরবস্থা। পিতা শেখ উসমান ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন তাঁতী। খুব অল্প বয়সে হুসাইন হাফিজ হন। ঝাং জেলার চিনিয়ট শহরে বিখ্যাত সূফী সাধক শেখ বাহলুল তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। বাহলুল ছিলেন একজন প্রকৃত সিদ্ধ সাধক। তাঁকে সবাই কামেল-সূফী রূপে জানত।

ছাব্বিশ বছর বয়সে হুসাইন পীরের সঙ্গ ত্যাগ করে মনীষী শা'হুল্লার কাছে সূফী সাধনা বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থাদি পাঠ করেন। ছাত্র থাকাকালীন তিনি একদিন গুরুগৃহ থেকে যখন ফিরছিলেন, তখন তাঁর হঠাৎ মনে হল তিনি আল্লাহ্‌র গোপন তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। সাফল্যে অধীর হয়ে আবেগবশত তিনি কোরআন শরীফ কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন। অন্যান্য ছাত্ররা তাঁর এই অন্যায় কাজে তাঁর উপর ভীষণ রেগে গেলেন। তাই দেখে হুসাইন সবাইর চোখের সামনে নিমেষে কূপ থেকে অলৌকিক উপায়ে নিক্ষিপ্ত কোরআন শরীফ উদ্ধার করলেন। সঙ্গী সাথীরা হতবাক। তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা সবাই দেখলেন সেই কোরআন শরীফ শুকনো এবং অক্ষত। হুসাইনের এই সিদ্ধিলাভের ঘটনাটি 'তাহাকিকাত-ই-চিশতি' গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। এই বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার পর থেকে তিনি সমস্ত রকম সামাজিক আইনকানুন ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে নাচ গান ও সুরাপানে মত্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সেই হুসাইনই পরবর্তীকালে মরমী সাধকরূপে পরিগণিত হয়ে পড়লেন। কোনো কোনো সূফী সাধক শরাব পান করেছেন, নেশার ঘোর ও রঙ্গ তাঁদের অন্তরে পরম আরাধ্যকে পাবার জন্য মত্ততা ও

প্রেমোন্মাদনা নিয়ে এসেছে। কিন্তু হুসাইনের মত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতা লোকমুখে প্রচারিত হয়ে কলঙ্কের অপবাদ ছড়িয়ে দিয়েছিল। পল্লবিত সেই অপবাদ পৌঁছল শাহ্ বাহলুলের কানে। তিনি প্রিয় শিষ্যের এই পদস্খলনের কথায় গভীরভাবে মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। লোকমুখের কথায় আস্থা না রেখে স্বচক্ষে দেখবার জন্য লাহোরে এসে পড়লেন। নিজে একান্তে কথা বললেন হুসাইনের সঙ্গে। আলোচনার মাধ্যমে তিনি স্থির নিশ্চিন্ত হলেন হুসাইনের সিদ্ধিলাভ ও সন্তপদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে। মনে আর কোনো ক্ষোভ রইল না। বাহালুল ফিরে গেলেন চিনিয়টে।

লাল রঙের পোশাক পবতেন হুসাইন। এজন্য তিনি লাল হুসাইন নামে পরিচিত ছিলেন। রাভি নদীর অন্য তীরে শাহদারা নামক গ্রামে মাধো নামে এক ব্রাহ্মণপুত্র ছিল। তার প্রতি হুসাইন অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। সূফী সাধকদের মধ্যে এ ধরনের অনুরাগ খুবই স্বাভাবিক। সুন্দর কোনো মুখের ভেতর তাঁরা পরম রমণীয় আল্লাহ্‌র অনন্ত সুষমা ও অনুপম সৌন্দর্যরাশির মাধুরিমাকে প্রতিফলিত হতে দেখতে পান। এর ভেতর কদর্য আসক্তি বা ভোগবিলাসের সামান্যতম বাসনা নেই—শুধু থাকে অফুরন্ত সৌন্দর্য পিপাসার অনাসক্ত আকুলতা —যা সেই পরম সুন্দর, অনন্তকেই স্মরণ করায়। মাধো সুন্দর এক কিশোর। ভোরের গোলাপের মত তার অবয়ব। হুসাইন তাই ভালবাসার চোখে তাকে দেখতে পেতেন ও তার ভেতর শাশ্বত বিকাশশীল সমস্ত সৌন্দর্য ফুটে উঠত। সূফী সাধকরা নারী পুরুষ নির্বিচারে সুন্দর মুখশ্রী ও অপরূপ দেহলতায় অসীমের মধ্যে সীমিত সৌন্দর্যকে দেখতে পেতেন।

হুসাইনের ভালবাসায় কিশোর মাধোও তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। হুসাইনের আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে সে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। পরবর্তী জীবনে শেখ মাধো নামেই সে সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। দুজনের প্রতি দুজনের অবিচ্ছিন্ন ভালবাসার কারণে সাধক হুসাইন-এর নামের সঙ্গে মাধো

নাম জড়িয়ে যায়। এইবার হুসাইন পরিচিত হন মাধোলাল হুসাইন নামে। এদের দুজনের মধ্যেকার প্রীতির সম্পর্ককে ঘিরে বহু গল্প কাহিনী অতিরঞ্জিত হয়ে দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে পড়ে। সেই সব গল্প পাঞ্জাবে আজো মুখে মুখে ছড়ানো আছে।

মাধোলাল হুসাইন বিখ্যাত মুঘল বাদশাহ্ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর জন্ম থেকে এন্তেকাল আকবরের রাজত্বকাল জুড়ে বিস্তৃত। বাদশাহ্ আকবর এই সাধককে জানতেন। শাহ্জাদা দারা এই সাধক সম্পর্কে কোনো এক জায়গায় লিখেছেন: তিনি শাহজাদা সেলিম ও আকবর বাদশাহের অন্তঃপুরিকাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁরা এই সাধকের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাহকি কাত-ই-চিশতী গ্রন্থে বলা হয়েছে, শাহজাদা সেলিম (পরে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর) মাধোলাল হুসাইনের একজন অনুরাগী, ভক্ত ছিলেন। তিনি হুসাইনের জীবনের রোজনামচা লেখবার জন্য বাহার খান নামে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিয়োগ করেন। তার লেখা সেই রোজনামচা পড়ে একত্র সংকলিত হয়ে 'বাহারিয়া' নামক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। 'বাহারিয়া' গ্রন্থটি একই সঙ্গে একজন সাধকের অলৌকিক শক্তি ও তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে।

মাধোলাল হুসাইন তখনকার হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে সমানভাবে শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন। বহু মানুষ তাঁর কাছে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য মনে করেছে। ১৫৯৩ সালে (১০০৮ হিজরী) মাত্র তিপান্ন বছর বয়সে শাহদারায় হুসাইন পরলোক গমন করেন। মাত্র কয়েক বছর পরেই রাভি-নদীর এক প্লাবনে তাঁর পবিত্র সমাধি ভেসে যায়। সমাধিটি রচিত হয়েছিল শাহদারাতেই। এই ঘটনার কথা তিনি আগেই বলে দিয়েছিলেন। শেখ মাধো তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে আবার বাগবানপুরায় জাঁক-জমকের সঙ্গে নতুন করে সমাধিস্থ করেন। সেই সমাধির পাশেই সাধকের প্রিয়পাত্র মাধোর সমাধি রচিত হয়। সমাধির উত্তর দিকে
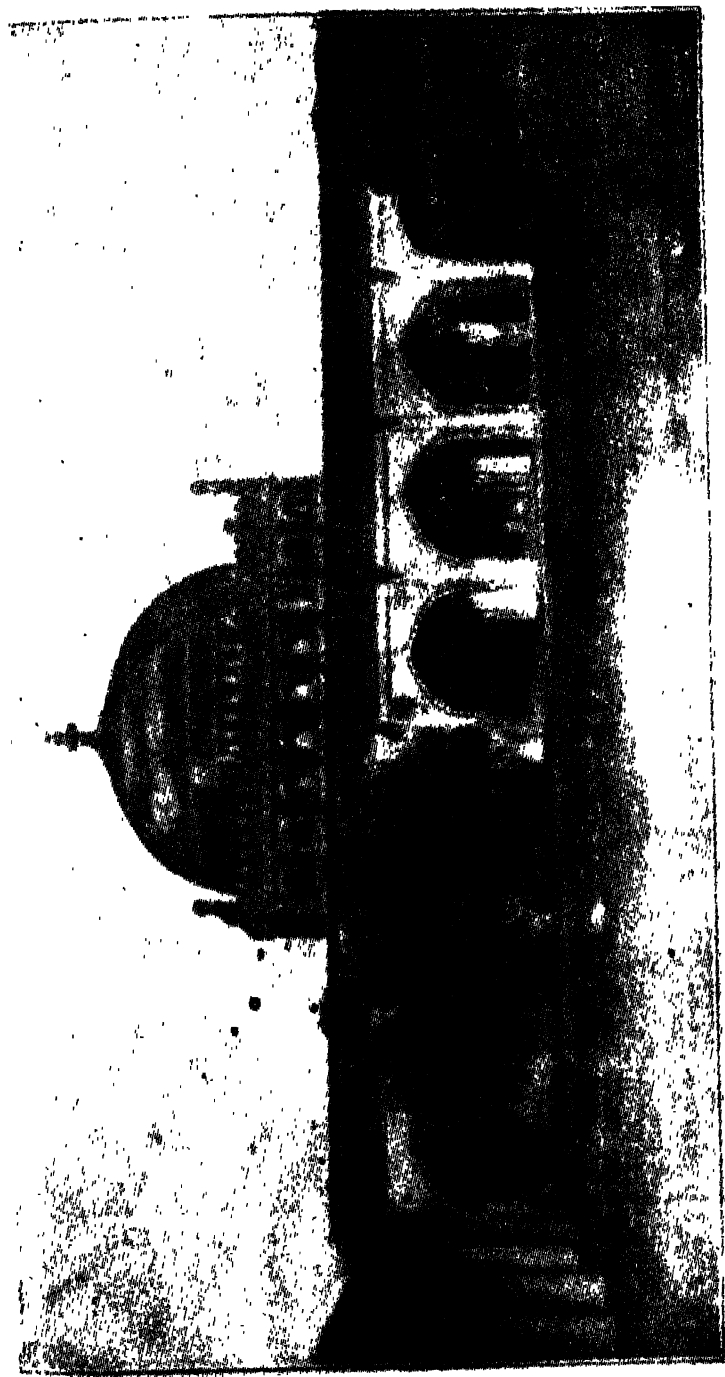
মাধোলাল হুসাইনের জিয়ারতগাহ্

রয়েছে সুউচ্চ একটি মিনার। এই মিনারে কদম-ই-রসুল (রসুলের পদচিহ্ন) পবিত্র স্মৃতি হিসেবে সুরক্ষিত। রণজিৎ সিংহের অন্যতমা পত্নী মোরা পশ্চিমদিকে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। মাধোলাল হুসাইনের পরিচয় ছিল বিখ্যাত শিখগুরু অর্জুনের সঙ্গে। গুরু অর্জুনই শিখ ধর্মের আদি গ্রন্থ গ্রন্থসাহেব সঙ্কলিত করেন। যদিও গ্রন্থটিতে হুসাইনের কোনো কবিতা স্থান পায়নি, তবু শিখরা হুসাইনের কবিতা ও কাফিয়া গভীর ভক্তির সঙ্গে ধর্মগ্রন্থালোচনার সময়ে আবৃত্তি করে থাকেন। উদ্ধৃত করেন তাঁর রচনাকে। আদি গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় ডুপজীর ইংরেজী অনুবাদের প্রথমেই রয়েছে দুলাইন হুসাইনের কবিতা। ইংরেজী ভাবান্তরিত লাইন দুটি :

Without, within us, is the lord,
To whom in silence we address us,

হুসাইনের নিঃসঙ্গতা-প্রীতি খুবই বিস্ময়কর। নির্জনতায় নিজেকে স্থাপন করেছিলেন তিনি। তাঁর এই নিঃসঙ্গতার কিছুটা ভরাট করেছিলেন মাধো। যার মূলে ছিল যৌবনের প্রতি সাধকের অপরিসীম ভালবাসা। যৌবনকে ভালবাসার ভাবধারাটি গ্রীকদের কাছ থেকে পারসিকরা পেয়েছিলেন। সেখান থেকেই তা পরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। শিল্পীর যেমন শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন একটি মডেলের, তেমনি চির সুন্দরের ধারণা ও তার পূর্ণ উপলব্ধির জন্য মানুষের সবচেয়ে মহিমাময় ও সুন্দর বিকাশ যৌবনের শরণ কোনো কোনো সূফী গ্রহণ করেছিলেন। যারা সূফীবাদের বিরোধীপক্ষ তাঁরা অবশ্য এই তত্ত্বের অপব্যাখ্যা করে থাকেন।

হুসাইনের সূফীবাদ বৈচিত্র্যবহুল। পারসিক ও পাক-ভারতীয় সূফীবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। হৃদয়গ্রাহী মানসিকতা ও ভাবধারার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ভারতীয় কিন্তু দৈনন্দিন জীবন প্রণালী ও পদ্ধতিতে তিনি পারসিক সূফীদের অনুসরণ করতেন। মদ্যপানে তাঁর বিস্ময়কর আসক্তি ছিল কিন্তু বস্তু প্রণোদিত মত্ততাকে তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমোন্মাদনায় পরিপ্লাবিত করতে পারতেন।

এবং সেই পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমের প্রচার ও প্রকাশের ভেতর দিয়ে অপূর্ব এক সংহত ও প্রেমাসক্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই আচরণ ছিল পুরোপুরি পারসিক ভাবধারায় প্রভাবিত। অথচ অন্যত্র স্নিগ্ধ ভারতীয় ভাবধারা তাঁর ভেতর ছিল বিশেষভাবে সক্রিয়।

হুসাইন লিখিত কোনো নাম রেখে যান নি। এদিক ওদিক ছড়ানো কাফিয়া থেকেই তাঁর সূফীত্ব ও কবি জীবনের মরমী হৃদয় ও ভাবধারা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা গান যা তিনি রচনা করেছেন তা সহজ পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত। অথচ তারই মধ্যে তিনি সুন্দরভাবে বহু আরবী ও ফারসী শব্দকে ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর কবিতা পেয়েছে গতিশীলতা। ভাব হয়েছে সাবলীল। চিন্তায় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁর কবিতা বিশিষ্ট এক প্রাণ পেয়েছে। তাই ইব্রাহীম ফরিদ সানির পাঞ্জাবীর তুলনায় তা অনেক সহজ সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। হুসাইনের কাব্যে উর্দু কবিতার জৌলুস বা চাকচিক্য নেই ঠিকই কিন্তু শব্দের নিখুঁত ব্যবহার পরিমিতি বোধ ছন্দের বলিষ্ঠ গতি কবিতাগুলিকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। আলাদা করেছে অন্যান্যদের রচনা থেকে।

হুসাইনের কবিতা পড়লে পাঠকের মনে মরমী ভাবরস জেগে ওঠে। তেমনি মন ভরে যায় তীব্র এক বেদনার দাহনে। হুসাইন ছিলেন ফানা ফিল্লাহ্‌র মতবাদে বিশ্বাসী। অহং-এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র জগৎসত্তায় করতেন অবগাহন। আবার অন্যভাবে আনাল হক মতবাদের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না. তিনি আনাল হকের 'আমিই সেই সৃষ্টিশীল সত্য'-কে মানতেন না। তাঁর সমগ্র জীবন সাধনা ছিল অন্বিষ্ট। তাঁর প্রিয়তম আল্লাহ্‌র উপস্থিতি রয়েছে সমস্ত সৃষ্টিকে জুড়ে অথচ তাঁকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> কাছ থেকে দূরে রচিলে কেন গো আঁধারে,
> আমার এ জীবন রবে কি কেবলি আধা রে।

কাছে থেকেও এই যে অনন্ত দূরত্ব রচিত হয়েছে, এর জন্য কবির

অন্তর্হৃদয় বিরহজ্বালায় বেপথু হয়ে উঠেছে। যিনি সর্বব্যাপী, সব কিছুতেই যাঁর অস্তিত্ব, তাকে না পাওয়ার দুঃখই ঘন বেদনার মেঘ হয়ে সাধকের চিত্তাকাশকে আবৃত করে রেখেছে; ফকির লালন শাহ্‌র গানে এই রকম বিরহের অশান্ত কান্নাকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

'আমার বাড়ির পাশে এক আরশিনগর
সেথায় এক পড়শী বসত করে।
* * * *
সে আর লালন এইখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

প্রিয়তমের সঙ্গে সাধকের এই যে লক্ষযোজন ব্যবধান, তাকে ঘোচাতে হুসাইনের সারা জীবন কেটেছে। এই জন্যেই তিনি বুলেহ শার মতো প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন নি। এর ফলে হুসাইনের কবিতা ও সঙ্গীত হৃদয়ের বেদনায় থোকা থোকা আঙুর ফলের মতো করুণ রসে ফলন্ত হয়ে উঠেছে। হুসাইনের কবিতার আবেদন কতখানি মর্মস্পর্শী, তিনি কবিতার মধ্য দিয়ে আপন ব্যাকুলতাকে কি আশ্চর্য নিবেদন করেছেন তার উদাহরণ পাওয়া যায় এইসব ছত্রের মাধ্যমে:

দরদ বিছোড়ে দা হলে নী মাঈ
কে-হ-নুঁ আক্ খাঁ—
সুলাঁ মার দিওয়ানী কিত্তি বিরহুঁ পিয়া খিয়াল
নী মাই কেহনুঁ আক্ খাঁ।
জঙ্গল জঙ্গল ফিরাঁ ঢুঁডেঁ দী অজে না আয়া
মাহিয়াল, নী মায় কেহনুঁ আক খাঁ,
ধুকখণ ধুয়ে শাহীঁ ভালে জাঁফোলাঁ তাঁ লাল
নী মায় কেহনুঁ আক্ খাঁ।
কহে হুসাইন ফকির রাব্বানা বেগ নিমানিয়া দা হাল
নী মায় কেহনুঁ আক খাঁ।

মূল এই ছত্রের অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

বিরহের এই ব্যথার কথা বলব কারে হায়
যে ব্যথা আমাকে এমনি করেই দিওয়ানা বানায়।
খেয়ালী আমার এই বিরহ বলব কারে হায়
বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মরি আমি শুধু সন্ধানে
মাহিয়াল মোর এল না আজিও—কোথায় তা কে জানে!
ধিকি ধিকি জ্বলে আগুনের শিখা কালো শিস্ ওঠে তার
নেড়েচেড়ে দেখি লাল রঙ তার যেন বা আমার প্রাণ
কহে হুসাইন ফকির যে এক বিশ্বপিতা আল্লাহ্‌র
চিরচঞ্চল অথচ বিনত, ভাগ্যের হাহাকার।

আগুনের শিখার মতো বেদনা-বিরহ সাধককে ঘিরে ধরেছে। সাধক তার ভেতরই তাঁর লালকে অর্থাৎ অজ্ঞান মায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রিয়তমকে খুঁজছেন। পরম প্রিয়তম আর সাধকের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সীমিত জ্ঞানের জন্য, দুর্বলতার জন্য। সাধকরা আজীবন এই ব্যবধান দূর করবার জন্য জীবনের পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সাধক বনে বনে পথে পথে তাঁকে খুঁজে বেড়ায়। বহু ঘোরাঘুরির পরও মাহিয়ালের দেখা পাওয়া গেল না। চিরদিন একাকী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে রইল সুহিনী। সুহিনী ও মাহিয়াল সিন্ধু পাঞ্জাবের বিখ্যাত লোকগাথা। এই গাথার নায়ক মাহিয়াল ও নায়িকা সুহিনীর মিলন বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে ওই অঞ্চলে সূফীরা বেদনাবিধুর প্রাণের কারুণ্য ও আবেগকে প্রকাশ করেছেন। হুসাইন তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর অনুসন্ধানস্পৃহা, নিঃসঙ্গতাবোধ ভাবরসের বৈচিত্র্যে সিক্ত হয়ে কাব্যে ও সঙ্গীতে বহুভাবে ফুটে উঠেছে।

হুসাইন প্রিয়তমের প্রেমভাবে মত্ত হয়ে উঠতেন। সেই সময় তাঁর প্রচণ্ড আবেগ ও চাঞ্চল্য নৃত্যময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ত নাচের ছন্দে ছন্দে তিনি যেন সহজ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতেন। নিজের এই অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করে তিনি নিজেই বলেছেন :

শক গিয়া বেশকী হোঈ
তাঁ মাই অগন নাচ্চি হাঁ,
জে শাহু নাল মাই ঝুমুর পাওয়াঁ
সদা সুহাগন সাচ্চি হাঁ,
ঝুঠে দা মুঁহ কালা হুয়া
আশক দী গল সাচ্চি হায়।
শক গিয়া বেশকী হোঈ
তাঁ মাই অগন নাচ্চি হাঁ।

অনুবাদ করলে এই রকম শোনাবে :

শখ দূরে গেছে বেশখী মাতাল গুণহীন নাচি আমি
প্রিয়তম সাথে এই খেলা তাই সুফী সোহাগিনী আমি
ঝুট বলে যার মুখ কালো হলো আশিক অন্তর্যামী
দ্বিধা হল দূর দ্বিধাহীন তাই গুণহীন নাকি আমি।

এই অবিরাম নাচের মধ্যে দিয়েই সূফীশ্রেষ্ঠ রুমী মাশুকের প্রেমে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই উন্মত্ততা পাক-ভারত ও পারসিক নৃত্যকলার মূলে বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছে। এর ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে আধ্যাত্মিক ভাবরস ও অদৃশ্য প্রিয়তমের প্রতি উৎসারিত ভক্তজনের হৃদয়াবেগ ও আনন্দ-বিহ্বলতা। পাক-ভারতের কথাকলি ও পারস্যের মৌলভী সম্প্রদায়ের নৃত্যের সঙ্গে এই ভাব তুলনীয়। হুসাইন সোজা ঋজু রাজপথ দিয়ে চলেন নি। অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া অন্তরের তীব্র বেদনায় যে পথ রচিত সেই পথ তিনি নিজে আবিষ্কার করে নিয়েছেন। তাঁর সবকিছুই ছিল একটা স্বতন্ত্রতার সুরে বাঁধা। সাধকদের চালচলন কথাবার্তা প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে কোনো মিল নেই। যাঁরা সাধক তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য প্রিয়তমের সন্ধান, তাঁদের জীবননির্বাহ প্রণালী যে সাধারণের মতো নয় তা বলাই বাহুল্য। ফলে বহু সময়ই তারা সাধারণ আচারপন্থীদের বিদ্রূপ ও উপহাসের পাত্র হয়ে পড়েন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্যাতনের কবলেও তাঁদের পড়তে হয়। হুসাইনও এর হাত থেকে রেহাই পান

নি। তবুও বিরোধিতা ও বিরূপতা যত তীব্র হয়েছে তত যেন তাঁর প্রিয়তমের সন্ধানের স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠেছে। অদম্য সেই অনুসন্ধানে প্রিয়তমের জন্য আকাঙ্ক্ষা আরো গভীরভাবে দেখা দিয়েছে। তিনি নিবেদিত প্রাণ হয়ে গেয়ে উঠেছেন :

রব্বা মোর অগন চিট্‌ঁ না ধরীঁ
অগন হারি কো গুণ নায়ি আদরোঁ ফয়ল করীঁ
দুনিয়াঁ বালিয়াঁ নুঁ দুনিয়াঁ দা মানা
নংগাঁ নুঁ নংগ লোঙ্গি,
না আঁসী নংগ না দুনিয়াঁ বালে সান্নুঁ
হাস দি জনী কনী
কহে হুসাইন ফকীর সাঁঈ দা সাডি,
ডাঢে নাল বনী।

ভাষান্তর করলে যায় অর্থ দাঁড়ায় :

রাব্বি আমার দোষ ধরিও না, দোষভরা আমি গুণহীন
অন্দর থেকে করুণা আলোক দেখাও আমি যে অর্বাচীন।
দুনিয়াদারীর কাছে এই যত গর্ব ভার অহঙ্কার
যেজন নাংগা সংস্কার ত্যাগ এই জীবনের পর্দা তার।
বৈরাগী নই, সংসারী আমি তাই যদি হাসে ওই সাধারণ
কহে হুসাইন খুদার ফকির বন্ধু আমার ভীষণ জন।

যিনি ভীষণ জন, যিনি ভয়ংকর, অসাধারণ বন্ধুত্ব তার সঙ্গেই সম্ভব। আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাতের সঙ্গে সাধক তাঁর আঘাতকেও কামনা করেন। কারণ, একদিকে তিনি যেমন অনন্তসুন্দর করুণাময়, অন্যদিকে তিনি তেমনি ভয়ংকর ধ্বংসসৃষ্টিকারী। প্রেমের দায়ে সাধক তাঁর নির্মমতাকেও সহ্য করেন, ভালবাসার দায়ে প্রিয়তমের দেওয়া আঘাতও যে প্রেমের মতো মধুর ও কাম্য। এভাবে তাই কবি বলতে পারেন :

প্রিয়তম এখন আমি একা
আমার বুকের পাঁজরগুলি ভেঙে দিয়ে

নির্মমভাবে চালাও তোমার রথ।

তোমার দেওয়া আঘাত যে মধুর আমার কাছে।

সাধকদের জীবনবোধ আলাদা এবং সম্পূর্ণভাবে নতুন। তাই তাঁদের জীবন সাধারণের কাছে অপরিচিত খাতে প্রবাহিত। ফলে বহু সময়ই সাংসারিক জনগণ বুঝে উঠতে না পেরে তাদের সন্দেহ করে, পরিহাস করে। সাধকদের বন্ধুত্ব সখ্যতা এমন একজনের সঙ্গে, যিনি তাঁদের এই অপমান অবহেলায় ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। সেই ভয়াল দৃশ্য দেখে সাধারণ তাকে ভুল বোঝে।

হুসাইন মূলত বিরহের কবি। বিরহের গাঁথাকে তিনি কথার মালা দিয়ে সাজিয়েছেন। বিচ্ছেদের সাধনা তাঁর সাধকজীবনকে এত ব্যাকুল ও বিহ্বল করে তুলেছে যে তিনি মিলনের কথা যেন ভুলেই গেছেন। তীব্র বেদনাবোধ তাঁর হৃদয়কে এমন গভীরভাবে উদ্বেলিত করেছে, যার ফলে এর মধ্যেই তিনি প্রবল আনন্দ লাভ করেছেন। প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা তিনি কখনোই করেন নি। প্রিয়তমের সাক্ষাতেই তাঁর জীবনসাধনা ও ব্যক্তিসত্তার শেষ, তাঁর সুদীর্ঘ অপেক্ষিত বিরহরাতের চির অবসান। তাই তাঁর প্রেমার্ত চিত্তের বেদনা ও আবেগ মর্মস্পর্শী ভাষায় করুণরস ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়েছে। মিলন তাঁর জন্য নয়। এটাই চরম সত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তার আচরণে। তিনি অনন্ত দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিলেন। যতক্ষণ এই দুঃখ ও প্রিয়তমের ব্যবধানের দূরত্বে আত্মনিগ্রহ বজায় থাকত ততক্ষণই তিনি এক ভিন্ন প্রকাশে ফুটে উঠতেন, প্রেমিক হয়ে পড়তেন। প্রেমিক হবার সাধনাই তাঁর সাধনা। প্রেমিকের এই গৌরব ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিয়েই তাঁর মহিমাময় অবস্থান। সেই অবস্থানের অবসান প্রিয়তম মিলনে, যেমন নদীর সমস্ত প্রবাহের শেষ সাগর সঙ্গমে। তাই তিনি খুঁজেছেন, প্রিয়তমকে সন্ধান করেছেন আকাশে বাতাসে, খুঁজেছেন প্রকৃতির স্তব্ধতায় চঞ্চলতায়। জীবন উজাড় করে উন্মুখ হয়েছেন তারই ধ্যানে। চির বিরহ ও এই অনুসন্ধানের সাধনায় হুসাইন যে স্বাতন্ত্র্য ও একনিষ্ঠতায় আত্মনিবেদনের পরিচয় রেখেছেন

তা আর কোনো সূফী সাধকের জীবনে দেখা যায় নি। ভাষায় যেন বিরহ মূর্ত হয়েছে সমস্ত বিষণ্ণতা নিয়ে।

সজ্জন বিন রাতাঁ হোইয়াঁ বাড্ডিয়াঁ
মাঁস ঝড়ে ঝড়ে পিঞ্জর হোইয়া কংকন
গেঁইআঁ হাড্ডিয়াঁ
ইশক ছপন্দা না হীঁ বিরহোঁ তনাভাঁ গড্ডিয়া
রাঁঝা যোগী মাঈ যোগিয়ানী মাইকে করছডডিয়াঁ
কহে শাহ্ হুসাইন ফকির সাঈ দা তেরে দামণ
লগগেই আঁ।

বাংলা ভাষায় যার অর্থ :

সজন বিনে রাতগুলি যে দীর্ঘতর আমার কাছে
ঝরেছে মাংস, শীর্ণদেহ, কংকন বাজে হাতের মাঝে
ইশক নেই, লুকিয়ে আছে তাঁবু যে তার
রানঝা যোগী, আমি যোগিনী আহা কি সে যে করে আমারে।
ফকীর হুসাইনের কথা, ধর বসন প্রান্ত তাঁর।

মাধো হুসাইনের এইসব কাফিয়া পাঞ্জবী হিন্দু মুসলমান শিখ সকলের হৃদয়ে অপূর্ব এক অনুরণন তুলেছিল। শিখদের কাছে তিনি পরিচিত শাহ্ হুসাইন নামে। শিখ সাধকগণ তাঁদের জীবন ও কাজের মধ্যে শাহ্ হুসাইনের জীবনসাধনার কথা উল্লেখ করেছেন গভীরভাবে। বিরহকাতর ও প্রতীক্ষায় ভরা ছিল তাঁর জীবন। সেই বয়স জীবনের স্বাদ কর্মক্লান্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে আমরাও যেন মাসে মাসে অনুভব করি। হুসাইন তাঁর জীবনলীলা শেষ করেছেন আল্লাহ্র ইচ্ছায়। কিন্তু তাঁর অমর সাধনা ও কাব্যসঙ্গীত আজও গুঞ্জরিত হয়ে মহত্ত্বের জীবনের প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করে।

সূফী আলী হায়দার

সিফাত-ই-আবদ কি করে আল্লাহ্‌র সিফাতে মুবাদ্দিল বা পরিবর্তিত হয়, তারই সন্ধানে সূফীদের অবিরাম সাধনা ও আমরণ জীবনপাত। আধ্যাত্মিক জীবনের এই একাগ্র সন্ধানের ফলে এক পরম শুভ লগ্নে সাধক উপলব্ধি করেন তাঁর আমিত্বের মৃত্যু, সেই সঙ্গে তিনি আল্লাহ্‌র অনন্ত সত্তার মধ্যে চিরকালের জন্য বিস্ময়কর এক আনন্দময় অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করেন। সূফী শ্রেষ্ঠ রুমী এই অবস্থার এক চমৎকার উপমা দিয়েছেন। সূর্যের প্রচণ্ড কিরণের আড়ালে আকাশের কোটি তারা আলোর উল্টোদিকে ডুবে যায়। হারিয়ে যায়, যদিও তাদের অস্তিত্ব তখনো বিদ্যমান, তবে তা না থাকার মতোই। তা বলে নেই একথা বলাও ভুল হবে। সূফীরা যেভাবে অনন্ত জীবনের অধিকারী হন, তাঁদের সেই গোপন তত্ত্ব ও তথ্যের আভাস তাঁদের কথার মধ্যে পাওয়া যায় না। তার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁদেরই গীত বা রচিত সঙ্গীত ও কাব্যে। কারণ সঙ্গীতের সুরের ভেতর দিয়েই সেই অফুরাণ প্রাণলোভের অনুভব সম্ভবপর। জগতের সমস্ত সৃষ্টির মূলে অবিরাম ধ্বনিত যে সুর, সুরের ভেতর যে মাধুর্য বিস্তার, তানমাত্রা লয়ে যা হৃদয়কে স্পর্শ করে তার মারফতই সূক্ষ্ম কোনো কিছুকে ছোঁয়া বা অনুভব করা যায়। প্রায় সূফী সাধকই তাই সঙ্গীত সাধনাকে জীবনে গ্রহণ করেছেন। রুমী এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন :

> হে বন্ধু তুমি শুধু একা তুমি নও
> তুমি যে আকাশ আর সমুদ্র গভীর ;
> তোমার অসীম তুমি, তুমির সাগরে
> লক্ষ তুমি নিমজ্জিত অশান্ত অধীর।

পাঞ্জাবের সূফী কবি আলী হায়দার এই লক্ষ্য 'তুমি'র মধ্যে অন্যতম একজন। সূফী নামের সঙ্গে যে বিচিত্র আনন্দ-বেদনা, মধুর এক ভাবধারা জড়িয়ে আছে তার সন্ধান আমরা হায়দারের মরমী ভাবপূর্ণ গানের ভেতর পাই। ১১০১ হিজরী সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৬৯০

খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের মুলতানের অন্তর্গত কাজিয়া গ্রামে আলী হায়দার জন্মলাভ করেন। পঁচানব্বই বছরের দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে ১১৯৯ হিজরী ইংরাজী ১৭৮৫ সালে স্বগ্রামেই তিনি পরলোকগমন করেন। আলী হায়দার ছিলেন কাদিরী তরিকার সূফী। তিনি নিজেই নিজের কথা বলেছেন : আলী হায়দার কেয়া পরওয়াহ্ কি সে দী জে

শাহ্ মুহীউদ্দীন অসা ভাড়া আই।

বাংলায় এর অর্থ করলে দাঁড়ায় : আলী হায়দার পরওয়া কিসের শাহ্ মুহীউদ্দীন যখন আমাদেরই।

বহু কবিতা ও গান রচনা করেছেন আলী হায়দার। তাঁর রচনার মধ্যে গানের ভাগই বেশি। তাঁর সমগ্র রচনায় ভাষা ও শব্দের ব্যবহারে যে মাধুর্য ও অলঙ্করণ পাওয়া যায়, তার তুলনা একমাত্র বুলেহ্ শাহ্ ছাড়া অন্য পাঞ্জাবী সূফীদের মধ্যে বিরল। অলঙ্কার ব্যবহারে, অনুপ্রাস প্রাধান্যে তিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতার প্রমাণ হিসেবে ধরা যাক্ :

শীন শরাব দে মসত্ রইহান
কীন ইন তহীদে মত বালড়ে নী
সুরখ মুফায়েদ সিয়াহ্ দো বানা লাড়ে
বাজ কজ্জল আইবে কালড়ে নী।

সূফী হায়দারের রচনার অন্যতম আরেক বৈশিষ্ট্য হল তিনি অন্য ভাষা থেকে শব্দ বাক্য এমন কি প্রকাশ ভঙ্গীকে পাঞ্জাবী ভাষার মধ্যে সহজে স্থাপন করেছেন। তাঁর এইসব শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার এতই সুসঙ্গত ও শ্রুতিমধুর হয়েছে যে তাকে আর বিদেশী বলে চিনতে পারা যায় না। নিচের উদাহরণটি একথা প্রমাণ করবার জন্য যথেষ্ট বলে মনে হয় :

জান বাচাকে বাঝো চা'কে রখী কিউঁ
কর হোঙ্গ মাঁ।
ইয়ারগ মসিবঅল মাহবুব রহা গয়র
না কোঙ্গ মাঁ।

ইয়ারগ মসিবঅল মাহবুব একটি আরবী বাক্যাংশের বিকৃত রূপ। তাকে তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় কী সুন্দর কাজে লাগিয়েছেন। পার্থিব বস্তুর অধিকারকে মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী বলে আলী হায়দার আখ্যায়িত করেছেন। শুধু আল্লাহ্ ও রসুলের প্রেম প্রীতি ও আনুগত্যের সম্পদকে একমাত্র নিত্য ও সত্য বলে তিনি স্বীকার করেছেন। বস্তু জগতের আলাদা অস্তিত্ব ও বিভেদের মধ্যেই বহুত্বের জন্ম হয়েছে। রুমী যেভাবে বলেছেন: প্রদীপ বহু রকমের, আলাদা আলাদা গড়ন। কিন্তু তাদের আলো একই। এই আলো আসে অতীত লোক থেকে। যদি প্রদীপের দিকে তাকিয়ে থাক, তাহলে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে কারণ সেই সময়েই জন্ম নেবে সংখ্যা ও বহুত্ব।

সত্য সূফী সাধক হিসেবে আলী হায়দার এই বহুত্বকে অস্বীকার করেছেন। আর এই অস্বীকারের ফলশ্রুতি হিসেবে পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁর সীমাহীন বিরক্তি। কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি বলছেন:

কূড়া ঘোড়া কূড়া জোড়া কুড় শাউ অসওয়ার
কূড়ে ব'াশে কূড়ে শিকারে কূড়ে মীর শিকার।
কূড়ে জোড়ে কূড়ে বেড়ে কুড়ে হায় শংগার
কূড়ে কোটঠে কূড়ে মনমিট কুড় এহ্ সংসার।
হায়দার আকথে সব কুঝ্ কুড়া
সচ্চা হিক করতার
দু'জা নবী মোহাম্মদ সচ্চা সচ্চে উস দে ইয়ার।

পুরো বাংলা না করে বিশেষ কয়েকটি শব্দের অর্থ বললেই কবিতাটি বোধগম্য হবে। কুড়া অর্থ মিথ্যা। জোড়া মানে পোশাক। সাউ অসওয়ার অর্থাৎ শাহী সওয়ার। বাশে মানে বাজপাখি, শিকার শিকারী বাজপাখি, বেড়-নৌকা, শংগার—প্রসাধন দ্রব্য কোটঠে—ঘরবাড়ি, মনমিট—আমোদ-প্রমোদ, হিক করতার—এক কর্তা মানে এক আল্লাহ্। কর্তার শব্দ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত এই শব্দ শিখরা ব্যবহার করে। আলাওলের প্রথমে প্রণাম করি এক করতার। দুজা দ্বিতীয় (মত), ইয়ার-বন্ধু। সূফীবাদের

মূল বক্তব্য হল প্রেম। কার সঙ্গে এই প্রেম? এই প্রেম সেই একের সঙ্গে যে একের তুলনা বা দ্বিতীয় নেই। হায়দারের বিশ্বাস, একের ওপর তাঁর আশা ভরসা ও নির্ভরতা মনকে ছুঁয়ে যায়। হায়দার বলেছেন :

আলিফ এতথে ওতথে অসাঁ আস তাই ডী অটে
আ'সরা' তাই ডরে জোর দা'ঙ্গ।
মহী সভ হবালড়ে তই ডারে নে
অসাঁ খওফ না' খনডারে চোর দাঙ্গ।
তুঁঙ্গ জা'ন সওয়াল জওয়ার সভোঁ সানু
হওয়াল ন হি. অউ খাড়ী গোর দাঙ্গ।
আলী হায়দার মুঁ সিখ তাই ডাড়ী আই
তই ডই বাঝ না সাইয়ল হোর দাঙ্গ।

আলিফ, এখানে এবং ওখানে তুমিই আমার আশা, তোমার শক্তিই আমার আশ্রয়। সকল মহিষই (সন্ধানরত আত্মা) তোমার তত্ত্বাবধানে তাই ভয় করি না আমি দুর্বৃত্ত চোরকে (শয়তানের প্রলোভনকেও)। তুমি জান সকল প্রশ্ন, জান তার সমস্ত উত্তর। তাই ভয় করিনে বিপজ্জনক কবরকে। আলী হায়দার অনুভব করে তোমার অভাবকে —তোমাকে ছাড়া আর কারো খোঁজ সে করে না। মাহী অর্থাৎ মহিষের দল পাঞ্জাব আর সিন্ধুদেশের মুক্ত প্রান্তরে চরে বেড়ায়। তাদের দেখাশোনা করার জন্য সঙ্গে থাকে রাখাল। উপরিউক্ত কবিতা রাখালের মুখে।

আলী হায়দারই কবিতার বিচিত্র শব্দ নিয়ে তাঁর গানে ও কবিতায় বিচিত্র ঝঙ্কার তুলেছেন। সেই ঝঙ্কারে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন রঙীন ফোয়ারা ও ঝরোকা। পাঞ্জাবী মহিলাদের রঙীন দোপাট্টার মতো ভাবের উচ্ছ্বাস ও প্রেমোন্মত্ত চিত্তের আবেগকে থরে থরে সাজিয়ে দিয়েছেন। শব্দের ব্যবহারে ভাবের প্রকাশে যে পাণ্ডিত্য ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই অবাক করে দেয়।

শান শকর রঞ্জী ইয়ার দী মাই মুঁ
তলখ কীতা সভ শীর শকর

গঞ্জ শকর দী শকর দান ডাঁ
জে করে রব শীর শকর।
রাঁঝা খীরতে হীর শকর রব
ফের করে ঝব শীর শকর,
জো লববিয়াই লব লবতে হা'জির
পিও পয়ালা শীর শকর।
হায়দার গুস সা পীবে তাঁ অকখে
পীয়াও মিটঠা লব শীর শকর।

এই কবিতার অনুবাদরূপ :

বন্ধুর রাগ আমার কাছেতে লাগে তেতো
আমাদের মৈত্রীবন্ধনকে করেছে বিরূপ।
আমি বিলিয়ে দেব গঞ্জ-ই-শকরের চিনি
আল্লাহ্ যদি করেন শান্তির বন্দোবস্ত।
রানঝা চাউল, হীর যে চা চিনি
আল্লাহ্ যেন তাদের মিলিত করেন।
আমরা যা চাই তা আল্লাহ্‌র নাম
উচ্চারিত প্রতি ঠোঁটে ঠোঁটে
পান করো সে বন্ধুত্বের পেয়ালা,
হায়দার যদি তার ক্রোধ করে সংবরণ
তবে বলবে, মিষ্টি চিনির ঠোঁট দিয়ে
পান করো সেই বন্ধুত্ব।

আগেই বলা হয়েছে সূফী সাধকদের ভাব প্রকাশের প্রধান অবলম্বন তানলয় সহ সঙ্গীতের গভীর বিস্তার। হায়দার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কবিতায় তাই যে সাবলীল গতি ও ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে তা পাঠকের মনকে সুরের আবেশে ভরিয়ে দেয়। পড়ার চেয়ে এই কবিতা গান গেয়ে উপভোগ করবার একটা চেষ্টা আপনা থেকে মনে জাগবে। যে কোনো একটা কবিতা ধরলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তে তড়িয়াঁ লাড়িয়াঁ তই ভিয়াঁ নী
মইনু লাড়িয়া কা'ড়িয়া মা' রিয়াঁনী
হীর জহিয়াঁ সই গোলিয়াঁ গোলিয়াঁ নী
সদকে কীত্ তিয়াঁ তই থোঁ বারিয়াঁ নী।
চওপড় মা'র তরোণ না পা'সে
পাসে দিতিয়াঁ হুডডিয়া সারিয়াঁনী।
হায়দার কো'ন খলাড়িয়া তই থো
অসী জিতিয়া বা জিঁয়া হারিয়াঁ নী।

হায়দার পাঞ্জাবের উপভাষা মুলতানীকেও তাঁর গীত রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্থানীয় অঞ্চলের মানুষরা যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষার সাহায্যেই তিনি চিরকালীন কথাকে নতুন রূপ দিয়েছেন। হারানো প্রেমের কথাকেই উজ্জীবিত করেছেন। হারানো বলেই তাতে নেশা জমে বেশি। নতুন পাত্রে পুরনো মদের যে মৌজ হয়, দেহমন নীল রঙে যে রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি অন্য কিছুতেই হয় না। সূফী সাধকরা এই খবর রাখেন বলেই নিজের ভাষায় প্রিয়তমের কথা বলেন। হায়দারও বলেছেন, খে খলক খুদা কী ইলম্ পড়হ্ দী সনু ইক্কা মুগ'লিয়া ইয়ার দা' আই।

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীব জড়ো করে জ্ঞান
আমরা পাঠ করি শুধু প্রিয়তমকে।
জিহনে গোলকে ইশ্‌ক কিতাব দিট্‌ঠি সিগে
সরফ দে সভ বিসা'র দা' আই।
যে খুলেছে ও দেখেছে প্রেমের বই
সে প্রস্তুত তার সব খরচ করতে।
জিনহে ইয়ার দে নাম দা সবক পড় হিয়া
এতথে যায় সবর করার দা' আই।
প্রিয়তমের নাম পাঠ যে নিয়েছে,
তার এখানে আসা উচিত নয়।

এখানে শুধু শান্তি ও সন্তুষ্টি।

হায়দার মুল্লা নুঁ ফিকর নামাজ দা' আই

এহনা আশ্‌ক তলব দিদার দা আই।

হায়দার, মুল্লারা নামাজের চিন্তা করে, কিন্তু প্রেমিকরা কামনা করে প্রিয়তমের প্রকাশ। এই কামনা করেন বলেই সাধকদের জীবনে শান্তি নেই। সন্তুষ্টিও নেই। তাদের অনন্ত দুঃখ প্রিয়তমের অনুসন্ধানের মধ্যে। প্রিয়তমের বিরহজ্বালায় তাঁদের দেহ মন আগুনে পুড়ে খাক হতে থাকে। বিচ্ছেদের দূরত্ব তাঁদের জীবনে অসহ বেদনাকে ঘনীভূত করে। সেই বেদনার আগুনে পুড়ে পুড়ে নিখাদ সোনার মতো হয়ে ওঠে তাঁদের শ্বেতশুভ্র পবিত্র আত্মা। অন্তহীন আকাশে সাধক তখন ভারমুক্ত হয়ে নিষ্কলঙ্ক পাখা মেলে দেন। তাঁরা তখন অসীমের সন্ধান পাবার আশায় উজ্জীবিত হন। সে আশা কবে এবং কোথায় পূর্ণ হবে তা কে জানে!

সূফী সুলতান বাহু

রহস্যময়তায় কবি সূফী সুলতান বাহু পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ ও মরমী সাধকদের মধ্যে একজন। এই বিরাট উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সূফীরূপেও সুলতান বাহু সর্বজনস্বীকৃত। তিনি ছিলেন সে সাথী। আল্লাহ্ উচ্চারণের শেষের দীর্ঘ বিলম্বিত হু সূফী সাধকদের কাছে খুবই প্রিয় ও মধুরতম ধ্বনি। এছাড়া শুধু হু শব্দটিও সর্বনামের 'সে' প্রিয়তমকে বোঝায়। তাই কোরান শরীফের কয়েকটি আয়াতে শুধু এই শব্দটির দ্বারা আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়েছে। যেমন : হুয়াল লাহুল খালিকুল বারীউল মুসাওবেরু। ১৬৩০ সালে সুলতান বাহু আভানে জন্মগ্রহণ করেন। একষট্টি বছর বয়সে ১৬৯১ সালে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

সুলতান বাহুর পিতা পশ্চিম পাঞ্জাবের ঝাংজেলার অন্তর্গত শোরকোট শহরে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন শান্ত ধীর স্বভাবের। বাহুর মা বিবি রাসতি কুদস সারাও ছিলেন স্থির, গভীর নম্র স্বভাবের উদার প্রকৃতির মহিলা। সুলতান বাহুর শৈশব সম্পর্কে বহু বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কথা শোনা গেছে। খুব ছোট থেকেই তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। সবাই বলত, এজন্য তার মুখমণ্ডলের চারপাশে একটা জ্যোতির মণ্ডলী সবসময় দেখা যেত। কোনো অন্য ধর্মাবলম্বী যে মুহূর্তে ওই দীপ্ত উজ্জ্বল জ্যোতিদর্শন করত তৎক্ষণাৎ সে তার নিজের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে মুসলমান হয়ে যেত।

সুলতান বাহুর শিক্ষা শুরু হয় নিজের বাড়িতেই। তাঁর মা-ই পুত্রের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মায়ের আদর্শ সত্যনিষ্ঠা এবং সার্থক সাধিকা জীবন ছেলের ওপর দিগন্তব্যাপী এক প্রভাব সৃষ্টি করে। ছেলেমেয়ের জন্মের পর মাকেই তিনি পীর বা মুরশিদরূপে গ্রহণ করতে আগ্রহী হন। কিন্তু মা ছেলের ইচ্ছেয় সায় দিলেন না। এর কারণ ইসলাম ধর্মে নারী কখনই আধ্যাত্মিক গুরুর স্থান লাভ
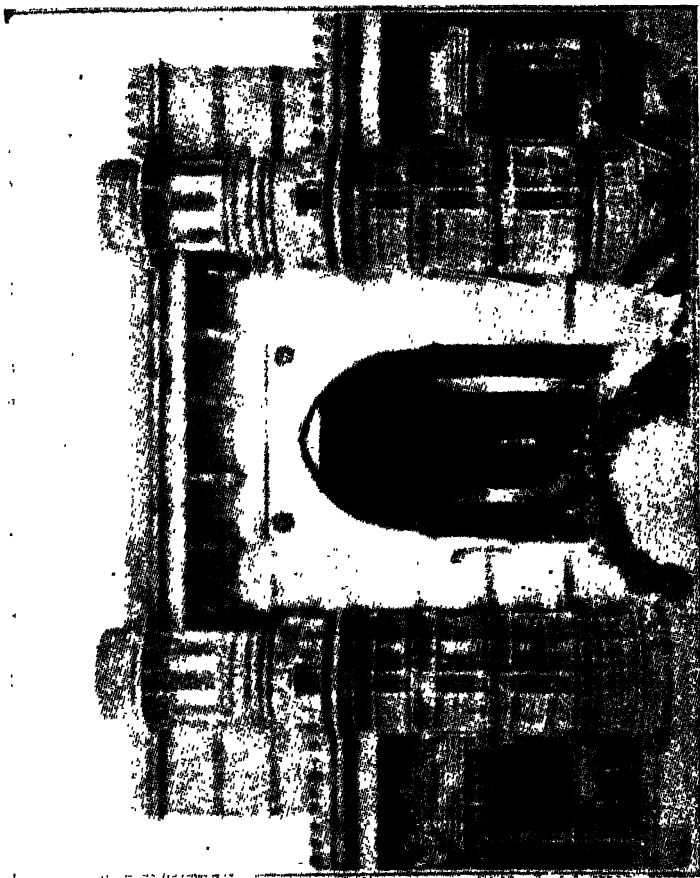
সূফী বাহুর পবিত্র সমাধিক্ষেত্র

করে নি। মা-ই তাকে নির্দেশ দিলেন বাগদাদের সূফী হাবীবুল্লাহ্ কাদিরীর কাছে দীক্ষা নিতে। সুলতান বাহু বাগদাদ যান দীক্ষা নেবার জন্য। এই বাগদাদ (ইরাকের রাজধানী নয়।) রাভী নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম। সেখানে কিছুদিন থাকবার পর অলৌকিক ক্ষমতায় মুরশিদকে হারিয়ে দিয়ে তিনি অন্য মুরশিদএর খোঁজে দিল্লি এসে পৌঁছান। সেখানে তিনি সৈয়দ আবদুর রহমানের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সম্রাট শাহজাহানের একজন মনসবদার ছিলেন এই পীর রহমান সাহেব। মনসবদার হলেও আধ্যাত্মিক জগতে এক অনন্য ক্ষমতাব অধিকারী ছিলেন। সুলতান বাহু নতুন গুরুর কাছে তাঁর প্রার্থিত আত্মিক ক্ষমতা ও সম্পদ লাভ করেন। মৃত্যুর পর চিনাব নদীর কাছেই কাহার জানানে তাঁর সমাধি রচিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে চিনাবের ধারা পরিবর্তনে সেই সমাধি ভেসে যায়।

১৭৭৫ সালে অলৌকিক এক ঘটনা ঘটে। অদ্ভুতভাবে সুলতান বাহুর মৃতদেহ একটি শিমুল গাছের নিচে পাওয়া যায়। সেখানেই সগৌরবে তিনি পুনরায় সমাস্থি হন।

সাধক সুলতান বাহু আরবী ও ফারসী ভাষায় মোট একশ চল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে বর্তমানে ত্রিশটি গ্রন্থর হদিস পাওয়া যায়। পাঞ্জাবী ভাষায় তিনি একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যার নাম মজ্মুয়া আবিয়াত। এতে ১৭৯ টি চতুষ্পদী কবিতা আছে। ঝাং জেলার স্থানীয় পাঞ্জাবী ভাষায় তা লেখা। এই একটি গ্রন্থই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে মরমী ভাষা ও বক্তব্যের জন্য। এই গ্রন্থ দ্বারা তিনি ভারতীয় সূফীসমাজে সর্বকালের এক গৌরবময় আসন লাভ করেছিলেন।

সুলতান বাহু কাদিরী তরীকার অনুসারী বা ভাবপন্থী ছিলেন। মনীষী শ্রেষ্ঠ সূফী হজরত আবদুল কাদির জিলানীর মুরশিদরূপে সাধককে পথ প্রদর্শনের কথা আবিয়াতের নানাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। সূফী সাধকরা আল্লাহ্কে 'হুয়া' বা সে নামে ডেকেছেন। সাধক বাহু তাঁর কবিতার প্রতি চরণের শেষে এই হুয়ার এবং আল্লাহ্র শেষে

দীর্ঘ বিলম্বিত ধ্বনি হুকে ব্যবহার করেছেন। আবিয়াতের মূল সিহারফি থেকে কিছু কবিতা অনুবাদ প্রাসঙ্গিক বলে তুলে ধরছি।

চে চার চান্না তু কর বোশ্‌নাঈ
কারেঁ দে তারে হু।
তেরে জীহে চান কাইসে চাঢ়দে সাম্নুঁ।
সাজ্‌জানা বাঝ আনধেরা হু।
জিত্তে চান অসেড়া চাঢ়দা উঠি
কদর নাহি বুঝঁ তেরা হুঁ।
জিসদে কারণ আসাঁ জনম গাবায়া
বাহু ইয়ার মিলিঁ ইক বেরি হুঁ।

অনুবাদ করলে এ রকম শোনাবে :

চাঁদ উঠে দেয় আলো বিস্তর
তারাদের চোখে লাগায় ধাঁ ধাঁ ওগো সে
এমন হাজার চাঁদ উঠলেও
প্রিয়তম বিনা আকাশ আঁধার ওগো সে
মোর চাঁদ ওঠে, তোমার অভাব বাজে নাতো বুকে
পূর্ণ চাঁদ ওগো সে।
বাহু বন্ধুর জন্যে জীবন হারায়ে মিলবে।
তাঁহার প্রসাদ ওগো সে!

সিহারফির কাব্যিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরসের মধ্যে বেশ একটা আচ্ছন্নতা, রহস্যময়তা ও সম্মোহন রয়েছে। তাই আলিফ থেকে ইয়ে পর্যন্ত নির্বাচিত কিছু কবিতা ভক্তগণের আনন্দলাভের জন্য তুলে ধরা যাক্। প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষে হুয়া অর্থাৎ 'ওগো সে' ওই কথাটি ধরে নিলেই চলবে। তাহলে বার বার আর এই একই কথা লেখার দরকার হবে না।

আলিফ : আল্লাহ্ যেন চামেলি লতা
মুরশিদ মনে রোপণ করে
হাঁ ও না, এভবে জলের মতন
চলাচলে দেহসত্তা ভরে

গন্ধে ও বাসে মৌসুম আসে
ফুল ফোটা শুরু নিরন্তর
মুরশিদ হোক চিরজীবী, বাহু
সে যে শিল্পী ও সুষমাকর।
কোথায় তাহার সন্ধান করো
ভিতরে এবং বাহিরে সেই
তার ভালবাসা বেড়ে চলে সদা
প্রতি নিশ্বাস আবর্তেই।
আমি যে তাহার উজ্জ্বলতর
তার আলো যেথা অন্ধকার
নিমেষে উধাও তোমার গোলাম
এ দুটি জগৎ পূর্ণতার
সাধনা তোমার সভার হু সে
সর্ব অঙ্গ অঙ্গ তার।
বিস্‌মিল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র নামে
অমূল্য সেই অলংকার
শাফায়াতে নবী মুক্ত করবে
সকল কালিমা মৃত্তিকার
তাহার দোয়ায় কিছু বরকতে
আমি হবো তার অংশীদার
জীবন আমার কুরবান বাহু
নবীর রহম নিত্যকার।
জ্ঞানের গ্রন্থ পাঠ করে করে
তৃপ্ত হয়েছো? বৃথাই যায়
ফুটন্ত দুধে মিলে না মাখন
গাঁজানো কিংবা অন্যথায়।
শস্যের মূল খুঁটে খুঁটে খেয়ে
কি লাভ হয়েছে ওই পাখিটার

ভগ্ন হৃদয় রাজী রাখো তাতে
ইবাদতে লাভ বারংবার।

তে : গভীর সাগরে সাঁতার তাদের
জীবনের তরী তাওয়াক্ কাল
দুঃখের বুকে সুখের জন্ম
সমান বিরাগ সকল কাল।
আল্লাহ্‌র কথা সুখ ও দুঃখ
চক্রের তালে বর্তমান
পরোয়া করোনা ডাকো নাহি ডাকো
তাকে কর তুমি হৃদয় দান।

যে : শুদ্ধ চিত্ত পবিত্র মনে
অন্তর দিয়ে অগ্রসর
তার খোঁজে হও সাক্ষাতে
চিরকালের জন্য সু তৎপর।
প্রতি মুহূর্তে যিক্‌রে তাহার
রোমাঞ্চে জাগে চুলের মূল
প্রশংসা গানে ঐক্যের তানে
স্মরণে সবাই হয় আকুল।

জিম : শাশ্বত প্রেম মিলেছে যাদের
মুখে নেই কথা আড়ম্বর
গভীর ধেয়ানে তন্ময় তারা
স্মরণে গোপন হৃদয় চর।
নিশ্বাসে আর প্রশ্বাসে চলে
হামেশা যিকর সঙ্গোপন
আত্মরতির গূঢ় তত্ত্ব
তাহাদের জানা সরাগ মন।

চে : আকাশের তারা গান করে তুমি
শুনতে কি পাও নিরন্তর?

চাঁদ জাগো জাগো পূর্ণ আলোকে
একাকী ক্লান্ত পথিকবর।
কৃষি ব্যবসায়ী চলেছে তাদের
পরণে বুঝি বা ছদ্মবেশ
একটি পালক তোলার শক্তি
নেই যাহাদের নিরুদ্দেশ
হওয়া ভালো বাহু ত্বরা ক'রো নাকো
যাত্রায় চলা অগ্রসর
কারণ আত্মা নীরবে তাহার
অভিসারে চলে দেশান্তর।

হাফিজের বুকে গর্ব কারণ
সিদ্ধি লভেছে মর্তে তাই
মোল্লারা তার প্রতিযোগিতায়
অহংকারের অন্ত নাই।
কেতাবের জ্ঞান বাহিরে দেখায়
মৌশুমী মেঘ অন্ধকার
তঙ্কা তাদের মিলছে অনেক
প্রচুর এবং বারংবার।
দীর্ঘ কিরাত প্রশস্ত পাঠ
তাহারা হারায় দুই জগৎ
পথিকের জ্ঞান অন্তর ধন
মুক্তির বুকে মুক্তাবৎ।

খে: সূফীর তরীকা জানে না সকলে
যখন তাহারা লাগায় দিল
হৃদয়ের কায় কারবার বোঝে
খুঁজে পায় প্রিয়তমের মিল।
তাহারা যেন সে মাটির পাত্র
কুমারের গড়া কলাকৌশলে

লাল জওহর মর্যাদা তার
বুঝবে কি করে বলদ দল।
গো পকেট নিয়ে ব্যবসা যাদের।
বির্মাসী যারা ঈশানে ঠিক
মরমে মরমী পথের চলায়
সেই রহস্যময়ের দিক।
জানে ঈশকের তত্ত্ব গোপন
স্তরে স্তরে ক্রমে উত্তরণ।

আইন :

ঈশকের বুকে যুক্তির স্থান
নাইকো তর্ক কথার জাল
ওহাদাত এক গোপন শুদ্ধ
পবিত্রতম প্রাণের লাল।
মুল্লা এবং পণ্ডিতজনা
জ্যোতিষ পায় না নাগাল তার
ব্যর্থ তাদের সকল চেষ্টা
বৃথাই বহন গ্রন্থভার।
আহাদ এবং আহমদে শুধু
মিমের ফারাক ভিন্ন নয়
দুইয়ে মিলে এক ঠিক জানে বাহু
নইলে ভুবন বিষাদময়।

মিম :

মৃত্যুর আগে 'আমি'র মৃত্যু
প্রেমিক জীবন অমর তাই—
মৃত্যু মিলন অর্থ একই
তার সাথে যদি মিশেই যাই।
তখন সে আর আমি অদৃশ্য
নিকটে যাওয়ার লোভানী নাই

আপনাকে ভুলে একাত্মতায়
আমাতে তোমাকে একাকী চাই
মাতকের প্রেমে আগুন জ্বলছে
সে আগুনে পুড়ে হয়েছি খাক
তাঁহার স্মরণে বিনিদ্র রাতি
একটু বিরতি নাইকো ফাঁক।
আমি ? কুৎসিত। আর প্রিয়তম
সুন্দর সে-যে তুলনাহীন।
তবে ? কোন বরে আমি জয় করি
হৃদয় তাঁহার আমি যে দীন।
হতভাগ্যের বাতায়নে চেয়ে
দেখে না, কারণ ছলাকলায়
সুদক্ষ নই। জানি নে কি করে
অজানা জনের মন ভুলায়।
রূপ-সুষমাও দৌলত নেই
আমাকে কি তাঁর সাথে মানায় ?
এতো যে দৈন্য প্রেম পরাহত
তাই কত দিন কেঁদে কাটায়।

নূন

পার্থিব সুখ বস্তুর লোভ
দমন করেছি ক্লান্তিহীন
তবুও কেঁদেছে চিশতী এবং
শায়খ মাশায়েখ হয়েছে দীন
দুনিয়াদারিতে। বস্তুর চাপে
জীবন তরণী হয়েছে ভার
ডুবন্ত তরী নিমজ্জমান পৃথিবীর প্রেমে
ওজনে তার।

এ দুনিয়া ছাড়ো প্রলোভন বাহু
বিলাস বস্তু সংখ্যাহীন
সেই সোজা পথ বেহেশতী আলো
নিমেষে জীবন হবে রঙিন।
মুরশিদ আর তালিব যাহারা
সন্ধানী চির প্রেমের পথ
একাকী এবং কষ্টসাধ্য
দূর নভচারী মরালবৎ
সঙ্গীবিহীনে। সন্ধিক্ষণে
বাঁক থেকে তার পৃথিবী দূর

দলি :

এই যে হৃদয় সমুদ্রে যেন
তারো চেয়ে তল অন্তহীন
তার গতি পথে কে ? জানে না তো
কোথা কোনদিকে অন্তে লীন।
কত ঝড় সেথা বন্দরগাহে
নিরাপদে তবু নৌবহর
ভয়—ভীষণা সে তরঙ্গ দলে
পোত চলে শত নিরন্তর।
চোদ্দ তবক সৃষ্টির যেন
তাঁবুর মতন বেঁধেছে সার
দিল চিনে নাও বাহু সেইজানে
তোমার প্রভুকে সত্যকার।

থাল :

যিক্‌র ফিকর গভীর এবং
সর্বদা তাঁর স্মরণ তায়
যথেষ্ট নয় কুরবান আর
আমি-কে তবুও মোছা কি যায় !

শূন্য এবং গগনচারীর
ভাগ্যে বিদ্ধ প্রেমের তীর
এবং তাহার তিক্ত স্বাদের
দুঃখ ব্যথার অমিয় নীর।

বাহুর যিকর হূ হূ হূ
চলে সর্বদা বুকের মাঝ
প্রিয়তম তাতে প্রলুব্ধ নয়
ভোলে না তাহাতে প্রাণের রাজ।

:র :

রাতের খোয়াব নিদ্রাও নেই
দুর্লভ তাহা কাটে যেদিন
হয়রানিতেই বিস্ময়ে জানি
সূফীদের কথা মন রঙিন
একে অন্যকে জানে ভাল করে
দুনিয়াদারির জন্যে নয়
মরমীয়া বাদ, তাঁর উদ্দেশ্যে
হও রত সেই বন্ধুময়।
যৌবনে হল কত অপচয়
বাহু পাবে তার দিদার ঠিক।
জীলানী আমার পীর মুরশিদ
চালিত সত্য পথের দিক।

:র :

ধার্মিক যারা ক্লান্ত রোজায়
নমাজে এবং পড়ে নকল
আত্ম-প্রবঞ্চনায়। 'একের'
নদীতে তৃপ্ত আশিকে দল

গভীর সাঁতারে ডুবে থাকে তারা
তাহার যত্নে চিরন্তন
ঈগলের হাতে পড়ে না তাহারা
মধুর ফাঁদেও নিমজ্জন
মৌমাছিদের মতন হয় না।
নবীজীর যত প্রেমিক জন
জানে ইশ্‌কের তত্ত্ব গোপন
স্তরে স্তরে ক্রমে উত্তরণ।
শাওকে ইলাহি গালিব এবং
অভিভূত করে প্রাণ আতুর।
দুনিয়ার প্রেম প্রতিবন্ধক
তাঁর প্রেমে যারা দগ্ধ হয়
মৃত্যু তাদের নিষ্কলঙ্ক
আনন্দ আর শান্তিময়।
রাত্রিবেলায় চীৎকার করে
উচ্ছ্বাসে তাঁর নাম ডাকায়
কৃতিত্ব নেই চমকে দেওয়ার
তাদেরকে যারা নিদ্রা যায়।
অথবা শুষ্ক দেহে পার হওয়া
নদীবুকে খরস্রোত ধারায়
কিংবা শূন্যে জায় নামাজের
বুকে বসে থাকা চোখ ধাঁধায়
অবাক যদিও হয় যত লোক
বাহু জেনো তাহা ভড়ং সব
মরমীয়া যোগ আল্লাহ্‌র প্রেমে
যুক্তি তর্ক সেথা নীরব।

ওয়াও :

হৃদয়ের পীড়া কে সারাবে বলো
কলেমাই পারে করতে দূর
দুঃখ ও গ্লানি ধূলিবালি যত
মরিচায় ধরা সকল পুর।
কলেমা যে হীরা লাল জওহর
সুক্তির বুকে মূল্যবান
নিখুঁত মুক্তা পরিশুভ্রতা
অম্লান জ্যোতি দৃশ্যমান
জীবন শুদ্ধ সদা পবিত্র
জীবনে অশেষ তৃপ্তি দান
এখানে ওখানে দুই জগতেই
কলেমা ব্যাপ্ত বিত্তবান।
হৃদয় আমার চঞ্চল বড়
ব্যথা বেদনায় হল রঙিন
সেদিন থেকেই কলেমা আমাকে
শিখায়েছে এই প্রেম যেদিন।
কলেমায় আছে চৌদ্দ তবক
ভিতরে কোরান গ্রন্থসার
চিন্তার পুঁথি। খাগের কলম
তৈরী তবুও কলমকার
লিখতে পারে না ভণ্ড যে জন
মুরশিদ বাহু তাই শেখায়
কলেমা ছোট্ট ফলপ্রসূ তবু
স্বল্পে সহজ বিশালকায়।
আল্লাহ্‌র ঘর এ তনু আমার
সূফী সেথা করো দৃষ্টিপাত

মানত করো না খাজা খিজিরের
তোমাতেই দেখো আবে হায়াত
প্রেমের প্রদীপ অন্তরে জ্বালো
যেথায় অনেক অন্ধকার
হারানো জিনিস ফিরে পেতে পার
এখানেই সেই অরূপকার।
মৃত্যুর আগে মরণ হয় সে
প্রার্থনা তাই সর্বথায়
তাদের জন্য 'রবে'র অর্থ প্রেম
কিছু নেই ভয় যে তার।

ইয়ে :

প্রিয়তমে তুমি নিশ্চয় পাবে
শির যদি রাখো বাজী তোমার
পরমতম সে সুন্দর অতি
তুলনা নেই যে কোথাও তাঁর।
আল্লাহ্‌র প্রেমে মস্তানা হও
মিশে যাও, সেই মধুর নাম
প্রতি দমে গাও হূ হূ সেই—
জপের অন্ত নেই বিরাম
আর জাগরণ। প্রিয়তমে যবে
নিঃশেষ হবে নিমজ্জন
তাঁর সাথে বাহু সেই নাম নিও
তখনি অমর হবে মরণ।

সূফী হাশিম শাহ্‌

পাঞ্জাবী কাব্যধারা প্রধানত সূফীদের ভাবরসে প্রাণ পেয়ে বেড়ে উঠেছে। পাঞ্জাবী ভাষা স্থানীয় মুসলিম সূফী সাধক কবিদের স্পর্শ পেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা তটিনীর মতো আবেগে পূর্ণরূপ পেয়েছে। ফুটে উঠেছে তার মধ্যে বিচিত্রতা, উচ্ছ্বাস, জীবন নিঙড়ানো প্রেমের রস। নিত্যনতুন খাতে বহমান এই কাব্যধারা ভক্তজনকে শান্তির বারিধারায় স্নাত করিয়েছে। ফুটে উঠেছে নিরহঙ্কার আত্মনিবেদনের মহিমা, প্রকাশ পেয়েছে লোকোত্তর আধ্যাত্মিক এক ভাবানুষঙ্গ।

এই কাব্যধারা বহু ধারায় বিভক্ত। এর মধ্যে দোহার জাতীয় কাব্যপ্রকাশ একান্তভাবে নতুন এক বৈশিষ্ট্য আলোকে উজ্জ্বলতা পেয়েছে। এর সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে মিল খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের বাংলাদেশের মারফতী ও মুরশিদী গানের রূপ চেহারাটি। দুটি আঙ্গিকের মধ্যে এক ঐক্য নিহিত রয়েছে। দুয়েরই বক্তব্য প্রায় এক। এই একাত্মতার একটা গভীর কারণ রয়েছে। দুয়ের মূলে যে মন কাব্যরচনায় সক্রিয় তাদের আদর্শগত চিন্তাধারা এক। দুয়ের মধ্যেই প্রবাহিত প্রেমের সহজ গতি ও স্বচ্ছ স্বাভাবিকতা। যা এই কাব্যকৃতির প্রাণশক্তি। একটি স্বভাবজ সামঞ্জস্য তাই আশ্চর্যভাবে এত ব্যবধানে থেকেও পরস্পরকে নিকটতর করেছে।

দোহারের মধ্যে দেখা যায় প্রেমের সহজ বিকাশ ও তার পরিণতি। হাশিম শাহ্‌ই প্রধানত এই দোহার কাব্যকে এক অমেয় উত্তীর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন আপন সিদ্ধির ও সাধনার একাগ্রতায়। সূফী হাশিম শাহ্‌ জন্মগ্রহণ করেন ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে, তাঁর জীবনাবসান ঘটে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে। দীর্ঘ সত্তর বছরের জীবন এক অনন্ত সাধনার জীবন। যে জীবনে প্রেমের প্রতি নির্মোহ নিবেদনে কোনো ফাঁক নেই। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল সংস্কার মুক্ত মন প্রেমকে যে কোনো স্তরে গ্রহণ করতে পারে এবং সেই প্রেমের জন্য নিজেকে দ্বিধাহীন

হয়ে উৎসর্গ করতে পারে। হাশিম শাহ্ এক জায়গায় বলেছেন, লজ্জা ও সংস্কারের বাঁধ তিনি ভাঙতে পারেন নি, সে দোষ কার? দোষ প্রিয়তমের। তাই দুর্বল ও পঙ্গু বলে প্রিয়তমকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছেন; যদিও এই বলা তার আন্তরিক অভিমান :

জাঁ ফরিহাদ বিকেতে আইয়ো ওত থেঁ।
চা পাহাড় চুরায়ো।
মেরে পইর জঞ্জীর হায়দা
ওহ্ নূ' মূল না চা তুড়ায়ো
ইশ্কা জোর নহী বিচ তেরে
সাচ আখা বুঢাপা আয়ো,
হাশিম লাগা করন গম অইঁ বেঁ
আসি ভেত তেরো হুন পায়ো।

বাংলা রূপ এই রকম :

ফরিহাদকে যখন বিকিয়ে দেওয়া হলো
তখন তুমি এলে, পাহাড় করলে চুরি।
তবুও আমার পায়ের বৃত্তে
শরম ঢেলে ভাঙলে না।
প্রিয়তমে তুমি দীনহীনজন, শক্তি তোমার নেই
ঠিক কথা হল বুড়ো হয়ে গেছ লোকে তাই বলে আজ।
হাশিম থোড়াই সেই লোকেদের বৃথাই দুঃখ করে।

তথাকথিত আল্লাহ্র প্রেমিক ও সত্যকার প্রেমিকের ব্যবধান বর্ণনা করে হাশিম আবার নতুন ভাব নিয়ে গেয়েছেন নতুন এক গান;

পাঞ্জাবী কাব্যধারা মূলত সূফী ভাবরসে সিক্ত ও বর্ধিত হয়েছে। পাঞ্জাবের মুসলিম সাধক কবিদের হাতে এই কাব্যধারা বিচিত্র ভাব, রস ও উচ্ছ্বাস আবেগে প্রশস্ত হয়ে নব নব খাতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই প্রবাহে বহু ভক্ত মনের আনন্দ বেদনা ও আত্মনিবেদন বিপুল আবেগ ও ভাবানুভবের সৃষ্টি করেছে। পাঞ্জাবী কাব্যের বহু

ধারার মধ্যে 'দোহার' জাতীয় কাব্য এক অনন্য ভঙ্গীতে একান্তভাবে বিশিষ্ট। এই ধারার সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের মারফতী ও মুরশিদী গানের মিল সুস্পষ্ট।

বউত সুকখালি বাজী
গোশা পকড় রহে হো সাবর ফড়
তসবী বনে নামাজী।
সুখ আরাম জগত বিচ সোভা অ:তে
বেখ হোবে জগরাজী।
হাশিম খাক রুলাবে গলি আঁতে য়েহ্
কাফির ইশক মযাযী।

আল্লাহ্‌র প্রেমিক হওয়া সহজ। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি আক্ষরিক মানা কঠিন নয়।

এ খেলা খুব সহজ
ধৈর্য ধরে নির্জনতায় তসবী গোনো নামাজ পড়।
আসবে আরাম আসবে আয়েশ—
ভরবে তোমার যশের ডালি।
তাই দেখে লোকে সবাই খুশি,
এ তবু যে পুতুল প্রেম,

কাফির, হাশিম তাই তো যায়, পথের ধুলায় গড়াগড়ি।

ধর্মতাত্ত্বিকগণ সূফীবাদের আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম নিবেদনকে পৌত্তলিক প্রেম এবং সূফীকে অবিশ্বাসী বলে উল্লেখ করেছেন। হাশিম তাই উপরিউক্ত কবিতায় শ্লেষের মধ্যে দিয়ে সেই কথাই তুলে ধরেছেন। সত্যিকার প্রেমরস কি জিনিস তা তাঁরাই অনুভব করতে পারেন, যাঁরা সকল ধর্মের আনুষ্ঠানিক বন্ধন ও গতানুগতিক বিশ্বাস ও সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। গণ্ডী ও সম্প্রদায়ের পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত মনই সমস্ত রকম অনুভূতিকে ছুঁতে পারে। আর পারে

বলেই সেই মনে প্রেমের পূর্ণ ও গভীর স্বাদ গ্রহণ সম্ভব। হাশিম এই প্রসঙ্গে বলেছেন :

জিস বিচ জঙ্গ বিরহোঁ দা পিয়া
তিস্ নাল লহু মুখ ধোতা।
শমা জমাল দিট্‌ঠা পরওয়ানে
অতে আন শহীদ খলোতা।
জা মনসুর হোইয়া মদমাতা
তধ সূলী নাল পরোতা
হাশিম ইশক অইহ্‌ জেঁহা মিলিয়া জিন
দীন মজহাব সব ধোতা।

বাংলা করলে বুঝবার আর অসুবিধে থাকবে না।

যাহার ভিতরে বিরহ লড়াই এখন হয়েছে শুরু
অনুভব তার পালায় সত্য দূরে ওই বহুদূরে
আপন শোণিতে ধুয়েছে সে মুখ।
সততার তরে তার কোরবানী নিজেকে ধরেছে তুলে
পোকারা যেমন আলোর ভেতরে খুঁজে পায় তার শোভা
আসলে শহীদ সে হয়েছে এসে নিজে।
(অবহেলা ভরে সবকিছু ছেড়ে নিবেদন করে প্রাণ।)
বেহেশতী প্রেমে মাতোয়ারা মনসুরে শূলে গাঁথা হল.
হাশিম বুঝেছে তারাই পেয়েছে প্রেমের পরশটুকু
যারা মযহাব দীন-ধারণাকে ফেলেছে সহজে ধুয়ে।

এখানে দীন মানে অন্ধ বিশ্বাস মযহাব কথার অর্থ সম্প্রদায় কিংবা সাম্প্রদায়িকতা। সূফীরা অনুষ্ঠান আর আচারে ভরা ধর্মে আস্থা রাখে না। তাঁরা হৃদয়ের অনুভূতির অনুরণনকেই সাধনায় নিয়োজিত করে। যার ভেতর দিয়ে ঐশী প্রেম দেখা দেয়।

প্রেমের পরবর্তী পর্যায়ের কথাকে রূপ দিতে গিয়ে হাশিম বলছেন :

তেরী জঞ্জীর শরীয়ত নস দা
যদ রচ চন্দ ইশক; মযাযী

দিল নূঁ চোট লগগি জিস দিন
দী আসাঁ খুব শিখি রিনদবাযী।
ভজ ভজ রুহ্ বঢ়ে বুত্খানে
অতে যাহির জিসম নমাযী
হাশিম খুব পড় হায়া দিল নূঁ
অইস বইঠ ইশক দে কাজী।

বাংলা তর্জমা মোটামুটি এই রকম :

আত্মা শরীয়তের জিঞ্জীর ভাঙে রচনা করে
পৌত্তলিক প্রেম,
যেদিন দিলে লেগেছে চোট প্রেমের ঘায়ে সেদিন থেকে
আত্মা শিখেছে কামুকতা
কারণ বার বার আমার আত্মা প্রবেশ করেছে বুত্খানায়
বাহিরে দেহ পড়েছে নামাজ।
হাশিম, এই প্রেমের কাজী হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে
(সূফীর প্রেমবাদ)
আমার হৃদয়কে শিখিয়েছে খুব।

প্রেমের চলাফেরা হাবভাব কায়দাকানুন আমরা যে পরিচিত চৌহদ্দিতে বাস করি ; যে জীবনদর্শন ও পথে হেঁটে যাই তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রশস্ত রাজপথ ধরে প্রেম ঋজুরেখায় হাঁটে না, তার পথ বঙ্কিম, অমসৃণ। প্রেমের মদে চুমুক যে দিয়েছে সেই দেহমন দিয়ে মত্ততাকে অনুভব করেছে। তার রসঘন আবেগ ও বিপুল প্রাণোচ্ছ্বাস যে কি বিশাল, মনের যে কি অদ্ভুত রূপান্তর, শরীরের যে কি বেহাল অবস্থা প্রেমিক ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝতে পারে না। প্রেমে ভেজা চোখে ও দ্রব মনে সবকিছু একাকার হয়ে যায়। প্রাণের স্পন্দন ও পৃথিবীর চলমান সব শব্দই তার শ্রবণে প্রিয়তমের মধুর কলগুঞ্জনে রূপান্তরিত হয়। প্রেমের গভীর সাগরে যে অবগাহন করেনি প্রেমের আস্বাদকে সে বুঝবে কি করে ? প্রেমের ভাষা, তার পথ পরিক্রমা,

তার প্রবাহের বিচিত্রতাকে অনুধাবন করার শক্তি তার নেই। হাশিম প্রণয়ের এই রহস্যময় ভাবনাকে প্রকাশ করে বলেছেন :

যহ্দ ইবাদত চহে বেকখে নাহীঁ
হরগিয্ ধিয়ান না করদা,
শাহ্ মনসূর চড় হায়া সূফী—
অতে ইউসুফ কিত্তো সু বরদা।
কিস গলদে বিচ রাজী হোবে
কোই ভেদ নহীঁ অইস গলদা।
হাশিম বেপরওয়াই কোলোঁ
মেরা হর বেলে জিউ ডরদা।

গোঁড়া চাহে তার ইবাদত, সে কিন্তু তাকে দেখতে পায় না, এতে তার মনসংযোগ নেই। সে মনসূরকে শূলে চড়িয়েছে, ইউসুফকে পরিণত করেছে ক্রীতদাসে কিসে সে খুশি হবে? এ ব্যাপারে লুকনো কিছু নেই। হাশিমের দিল শঙ্কিত তার উদাসীনতার জন্য।

দিল সোই জো সেজ সজ্জন দে নিত
খুন জিগার দা পিবে,
নইন সো জো আস দরস কী
নিত রহন হমেশাঁ গিবে,
দিল বেদরদ বিয়াধি ভরিয়া
শালা ওহ্ হর কিসে না থিবে।
হাশিম সো দিল জান রঙ্গিলা
জহড়া দেখ দিলাঁ বল জীবে।

এবার এর বাংলা দেখা যাক :

সেই শুধু দিল যেথায় আপন দিলের খুন
প্রিয়ার শয্যায়,
সেই শুধু চোখ, যে চোখ হামেশা মাতাল হয়েছে সব ভুলে
রঙীন নেশায়।
বেদরদী দিলে ব্যাধি, আল্লাহ্ যেন সকলেরই

তাকেও পায় না।
হাশিম জেনেছ সে হৃদয় যেন রঙিলা মন
যে শুধু তাকায় দিলের দিকে।
রঙিলা সে যেন ছিল পাশে চেয়ে।

হর হর পোস্ত দে বিচ দোস্ত ওহ
দোস্ত রূপ বটাবে।
দোস্ত তক না পহচে কোঈ য়েহ
পোস্ত চাহ্ ভুলাবে।
দোস্ত খাস পচানে তাঈঁ যদ
পোস্ত খাক রুলাবে।
হাশিম শাহ্ যদ দোস্ত পাবে তদ
পোস্ত বল কদ যাবে ?

বাংলা রূপ করলে দাঁড়ায় :

প্রতিটি পোস্ত গাছের ভেতরে রয়েছে বন্ধু মোর
বন্ধু আমার রূপ বদলায় প্রতিনিয়তই জানি
পৌঁছে না গিয়ে কাছে তার ভুল হয়
পোস্ত ভুলায় চাওয়ার ইচ্ছেটুকু
বন্ধুকে চেনা তখনই যে যায় যখন ধুলার পরে
পোস্ত লুটায় দিন শেষ করে দিয়ে।
কহিছে হাশিম বন্ধু যখন চোখের আড়ালে
কি হবে আফিমে কি হবে পোস্ত দিয়ে ?

পোস্ত আফিমের গাছ। এখানে হাশিম শব্দটিকে ধর্ম ও তার আচার অনুষ্ঠানে প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। বন্ধু প্রেমিক। যার খোঁজে সাধক হৃদয় অতিষ্ঠ। রূপ বটাবে অর্থ বন্ধু বিচিত্র প্রকাশে ফুটে উঠবে। হাশিম এই কবিতাটিতে চিরন্তন কথা বলেছেন। চিরকালীন অন্ধতা। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আবদ্ধজনকে সাবধান করেছেন। আল্লাহ্‌কে চাওয়া ও তাঁর সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে ভুলে যাবে এই লোকরা। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ আমাদের বিভ্রান্ত

করে। তার রঙ রসে গন্ধে আমরা মোহিত হয়ে তারই প্রশংসা করি। ভুলে যাই এই সত্য ও সুন্দর যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অনন্ত অপার সৌন্দর্যকে। মধ্যপ্রদেশের সাধক রাজপুত্র জ্ঞানদাস বঘোলীর কথায় বলা যায় :

ইস্তি রস্তনক কিউরে এলচী
তুহি ইয়াদ ভুলায়া।
এলচী-দূত, প্রকৃতি-প্রিয়তমের পত্র যে
নিত্য বহন করে।

তেমনি : পোস্ত খাক রুলাবে। পোস্ত যখন ধুলায় লোটে, সরলার্থ করলে যখন ধর্মের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের শেষ হয়।

দোহার কাব্যধারায় যে রস পরিবেশিত হয়েছে তার স্বাদ ভক্ত-হৃদয়ে আজও একইরকম ভাবে অম্লান রয়ে গেছে। হাশিম এই দোহার কাব্য মাধ্যমে চিরকালীন সত্যকে তুলে ধরেছেন। চির অন্বিষ্টকে আপন অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, তাই তিনি ভক্তহৃদয়ে এখনো উদ্ভাসিত সূর্যকিরণের মতো।

হাশিমের সাধনা ও কাব্য যুগে যুগে তাই সাধারণ মানুষকে প্রেরণা দিচ্ছে।

সূফী ফারুদ ফকির

সূফী সাধক ও বাউল কবিদের মধ্যে অনেকটা মিল আছে। এদের সাধনা ও ভাবপ্রকাশের প্রবাহ যেমন অনন্য তেমনি অসাধারণ। তাদের কথা জীবনের নির্দিষ্ট মূল সুর ও ভাবধারায় আত্মনিবেদনের তন্ময়তা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনকে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত করে দেয়। সূফী সাধকদের নিবেদিত জীবনের প্রকাশ ঘটে গভীরে অগোচরে, নির্জন নিরিবিলিতে ও আত্মনিমজ্জনে। আত্মস্থ সাধক নাম সমুদ্রে ডুবুরি হয়ে অন্তর দিয়ে নাম সত্তাকে অনুভব করে। সন্ধান করে চির সুন্দরের মাশুলের। সেই অনুভূতির প্রকাশ ঘটে সূফীর কণ্ঠের সুললিত উদাত্ত সঙ্গীতে, উৎসারিত হয় তার কাব্যমহিমায়। এই অনুভবে যেমন চরম বেদনা ফুটে ওঠে তেমনি পরম আনন্দও ধ্বনিত হয়।

আমরা যা কল্পনা করতে পারি না তেমনি এক আশ্চর্যময় নির্লিপ্ত পথেই সাধনার উৎস এগিয়ে চলে। তার গতিছন্দ উচ্ছ্বাস আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। প্রশস্ত ও আরামের রাজপথ তাদের জন্য নয়, মাঠে ঘাটে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে দুর্গম পথেই সূফীরা দুঃখকে শতধারায় বিছিয়ে নিজেদের পথ করে নেন। একলা চলার নীতি সূফী সাধকের কাম্য। তাঁরা উন্মাদ হয়ে বিহ্বল হয়ে একই লক্ষ্যের ঋজু রাস্তা ধরে এগিয়ে যান। তাঁদের দেখে বোবা মনে প্রশ্ন জাগে, এই উন্মাদনা কেন? এই বিহ্বলতার অর্থ কি? আমরা টের পাই না কি সাংঘাতিক আবেগ তাঁদের তাড়িত করে নিয়ে চলে। সেই আবেগের তাড়নায় তারা প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়ে যান। সেই নাড়া খাওয়ার কোনো খবরই আমাদের কাছে পৌঁছোয় না। মদনবাউলকে একজন প্রশ্ন করেছিল, হ্যাঁগো তোমার এ-কী ধরনের নামাজ?

মদন তাই শুনে হেসে উত্তর দিলেন:

আমার নামাজ আমার পূজা গানে গানে চলছে ভাই
মানা করিস বন্ধু যদি মানব এমন সাধ্য নাই।

কোনো ফুলের রঙ বাহার নামাজ তার
গন্ধে কারো নামাজ বুঝি অন্ধকার।
বীণায় ফের তারে তারেই নামাজটুকু কখন ফোটে
কণ্ঠে গান নামাজ নিয়ে আপনা হতে ছন্দ লোটে।

আল্লাহ্‌ নীরবে এই বিশ্ব সৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছেন। নিঃশব্দে আর অলক্ষ্যে তিনি আবর্তিত হচ্ছেন। সকলের অগোচরে বিবর্তনের ধারাকে বহন করছেন। সূফী সাধকরাও তাই নিরিবিলিতে একান্তে গহন গভীরে সাধনা করেন। অবাক অস্তিত্বের মধ্যে অনন্তর আকুতি চলে। ভক্তমনের কাতর আর্তি। নিজেকে নিবেদন আল্লাহ্‌র পদতলে। ঈশান বাউলের কাছে একজন জানতে চেয়েছিল, যে পরমতমকে তুমি খুঁজছ তার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ঈশান গানের মধ্যে দিয়ে উত্তর দিয়েছিল :

আমার সাঁই নয়তো ভাঙা চাকা যে
বলবে ক্ষণে ক্ষণে
বল নীরব গুরু সাঁই
কোন সাধনে বাহির হলে
ব্রহ্ম কমল পাই।
চলে চন্দ্র তারা নিত্যধারা
কোনো শব্দ নাই।

চাঁদ তারার গতি শব্দহীন। সূফী সাধকও নিঃশব্দে সাধনা চালিয়ে তার মূল ধারার উৎসমুখ খুঁজে পান। গভীরে স্পর্শলাভের উপায় আবিষ্কার করেন। সূফী ফারুদ ফকির ছিলেন এই পরম নিঃসঙ্গ ও নিস্তব্ধতা প্রিয়। শব্দহীন অদ্ভুত তাঁর জীবন। পাঞ্জাবের গুজরাট জেলার এক নামহীন গ্রামে তিনি পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ জানা যায় নি। তবু ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে তাঁর লীলাকাল বলে ধরে নেওয়া যায়।

এই সময়টা ছিল ভারতের ইতিহাসে এক অরাজক কাল। রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ছিল না। নানা ধরনের বিক্ষোভে গোটা

দেশ পূর্ণ ছিল। দেশ থেকে শান্তি যেন উধাও হয়েছে। বিরাট মোঘল সাম্রাজ্যের পতন প্রায় আসন্ন। আহমদ শাহ্ দুররানী এই সময়ে বারংবার হিন্দুস্থান আক্রমণ করছিলেন। উত্তর ভারতে শিখশক্তি ও পশ্চিম ভারতে মারাঠা প্রাধান্য একটু একটু করে মাথা তুলছে। ১৭৭১ সালে মারাঠারা অন্তর্হিত, পাঞ্জাব শিখদের করায়ত্ত। ভারতীয় রাজনীতিতে দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এই রকম এক অস্থির পটভূমিতে ললিতকলার উৎকর্ষ ব্যাহত। বিশেষ করে কাব্যচর্চা ও সাধন শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হয় নি। সূফীবাদ ক্রমশ গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসে, কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে নিচের দিকে ধাবমান। ফারুদ ফকিরও এই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের পরিমণ্ডল থেকে মুক্তি পান নি। তবু তারই মধ্যে তাঁর সুস্থ সাধক মন বিকশিত হয়ে ক্রম-পরিণতির দিকে এগিয়েছে।

এদেশের বাউলরা বহু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আবদ্ধ। তারা পারিপার্শ্বিকতার লজ্জাকর গ্লানিমা থেকে মুক্ত ছিল না। তবু তাদের নির্মল ও সরল মনের নিবেদনে যে উচ্ছ্বাস ও আবেগ তা আমাদের মনকে অন্য এক জগতের তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। বাউলদের গানের কথা থেকেই তাদের প্রাণের ভক্তিভাবটুকু সাধকমনের পরিচয়কে প্রকট করে তোলে। শত ক্ষুদ্র গণ্ডীতে থেকেও ভাবরসের মধ্যে দিয়ে তারা অসাধারণ নিষ্ঠাকে তুলে ধরে। ফারুদ ফকিরের সাধনা এই স্তরের। শিক্ষিত পরিশীলিত হওয়া সত্ত্বেও যুগের নোংরা আবহাওয়া ও অশালীন পরিবেশের প্রভাব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তৎসত্ত্বেও সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ও আবিলতাকে কাটিয়ে তিনি যে সাধক, কবি সেই পরিচয়কেই নিবিড়তর করেছেন কসাবনামা, বাফিন্দ গান ও বাড়া মাহাতো প্রভৃতির মধ্যে।

১৭৫১ সালে তিনি কসাবনামা শেষ করেন। এই গ্রন্থে তিনি তন্তুবায় শ্রেণীর জীবনসংগ্রাম ও ব্যবসাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিফলিত করিয়েছেন। তন্তুবায় কাজের সঙ্গে সৃষ্টিকৌশলের তুলনা স্বাভাবিক, সেই ধৈর্য অপেক্ষা ও পরিশ্রমের পর শতদল কমল সমস্ত

সৌন্দর্য নিয়ে ফোটে এও তেমনি একটু একটু করে বিস্তারিত হয়। সেযুগের শাসকশ্রেণী শিল্পীদের ওপর অন্তহীন অত্যাচার করত শোষণ চালিয়ে। বিনামূল্যে শিল্পীকে শ্রমদানে তারা বাধ্য করত। তাদের প্রতিভার সুযোগ নিত নিজেদের খেয়ালখুশি মতো। একবারও ভেবে দেখত না এর ফলে তার শিল্প বিকাশে কি চরম ক্ষতি হত। ফারুদ ফকিরের কবি মন শাসকদের এই ঔদ্ধত্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। কলাবনামায় এক জায়গায় তাই তিনি বলেছেন :

হাকিম হোকে বইন গলিচে বউহনা জুলুম কমাঁদে
মেহনতিয়াঁ মুঁ কমী আকথন খুন উহনা দাখাঁদে
ফড় বগারী লই লই জওয়ান খওফ খুদা নাহীঁ
ফরদ ফকিরা দর্দ মন দাঁ দিয়াঁ ইক দিন পওসন আহীঁ।

বাংলা ভাবান্তর এ রকম :

শাসক হয়েই তারা গালিচায় বসে চালায় অত্যাচার
শিল্পীকে বলে চাকর তাদের শোণিত করে পান
জোর করে তারা, কাজকে চালায় দেয় নাকো অনুদান
ভয় করে নাযে অলক্ষ্যে থাকা খোদার
ফারদ বলে, এভাবেতে দিন যাবেনা যাবেনা ভাই
আর্তজনের দীর্ঘশ্বাস যে কোনো একদিন গর্জে উঠবে তাই।

মজলুম ও শোষিতদের আকুল প্রার্থনা একদিন না একদিন আল্লাহ্‌র কাছে পৌছবেই। আল্লাহ্‌র বিচারে শোষকশ্রেণীর কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। তওহীদবাদী ফারুদ অবতারবাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ, তিক্ত মানসিকতাকেও কবিতার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

যেহরে ইসম খুদাই দে, লিখথে অন্দর নস
উহে না ভুলাব না রামকিষণ সির ডম।

এর বাংলা করলে দাঁড়ায় :

শিরায় শিরায় খোদার যে নাম ভুলো না সে নামগুলি
রাম আর কৃষ্ণ অবতারও যারা তাদের মাথার ভস্মধূলি।

প্রকৃত মুসলমানের মতো ফারুদ ফকির কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পবিত্র কোরান শরীফে সৎকাজ করার ওপর বিশেষ নির্দেশ দেওয়া আছে। সৎকর্ম করলে সৎ ফল লাভ হবে, তাই এই জীবনকে আল্লাহ্‌র পথে রেখে ভাল কাজ করাই সূফীদের কর্তব্য। আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিম্নরূপ :

আল লাখিনা অমান্নু ওয়া আমিলুস সালি হাতি,
তুবা লাহুম ওয়া হুসনা মাব।

তুবা মানে অন্তরের শান্তি ও আত্মার শান্ত অবস্থায় লাভ করবে সে, যে বিশ্বাসী ও ভাল কাজ করে। তার শেষ গমনের স্থানও সুন্দর ও পরম শান্তিদায়ক হবে। ফারুদ এই সুরে সুর মিলিয়েছেন :

গাইন গরুরাব না করো বরো ধাই মার।
বাঝোঁ অমলাঁ চংখিয়াঁ কৌন লংঘাসি পার,
ছড় জানিয়াঁ দে বাহদে কৌন খুদা দা ভাল
ফরদা লেখা লইসিয়া রব কাদির ফুল জলাল।

বাংলাতে তর্জমারূপ এইরকম :

গাইন-গর্ব করো না কাঁদো প্রাণ ভরে বদলে তার
ভাল কাজ ছাড়া কে দেখিবে তোমায় পুলের পার?
দুনিয়ার জাঁক ছেড়ে বোঝ তাঁর বাণী বিশাল
ফারদ, হিসাব নেবেন কাদির ফুল জালাল।

ফুল জালাল অর্থে মহান ও মহিমময়।

মুক্তপ্রাণ সাধক সূফী ফারুদ আরো বলেছেন :

সিন মুনারে খলক তুঁ কর মসালা বোর,
লোকাঁ দে নসিহতো অন্দর তেরে চোর।
কি হইয়া জে লড্‌ভিয়া গধা কিতবোঁ নাল
ফরদা লেগা লইসিয়া বর কাদির ফুল জালাল।

এর তর্জমারূপ এইরকম :

দিন-প্রতিদিন কর প্রচার মসলা লোকের কাছে
নসিহত করো, অন্তরে তোর তোর যে আছে।

কিবা প্রয়োজন গাধাতে বোঝাই পুঁথির ভার,
ফারদ, হিসাব নেবেন কাদির ফুল জালাল।

জানার পেছনে যে অজানা, দেখার আড়ালে যে অদৃশ্য জন তাঁর কথা, তাঁর চিন্তা, তাঁর মনন অন্তর দিয়ে করাই হল সূফীজনের কাজ। ফারুদ সাধকজীবনের গভীরে স্থিত সেই ভাবরসকে প্রকাশ করে বলেছেন :

থাল-যিকর খুদাই দা ফের বাহির খলক দিখাই
অন্দর কর তুঁ বন্দেগী বাহর পর্দা পাই।
মূল না বোচঁ ইলম নুঁ না কর কিসসে সওয়াল
ফরদা লেখা লইসিয়া বর কাদির ফুল জালাল।

আবার বাংলা অনুবাদের রূপ :

জাল লোকেরে দেখায়ে করো না খুদার যিকর স্মরণ তাঁর
অন্তরে হোক বন্দনা গীত দাও বাইরে পর্দা আর।
জ্ঞান বেচিও না কাউকে কখনো করো না সৃষ্টি তর্কজাল
ফারুদ, হিসাব নেবেন তোমার কাদির ফুল জালাল।

প্রিয়তম মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ফারুদ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। চঞ্চল হয়েছিলেন প্রাণের ধমনীতে বয়ে যাওয়া আগ্রহে। প্রত্যেক সূফী সাধকের কাছেই এই উল্লাস প্রয়োজন, কারণ প্রিয়তম মিলন যে তাঁদের মূল লক্ষ্য। এই মিলন কামনাই তাঁদের সকল দুঃখকে সহজ ও সার্থক করে তোলে। ফারুদ তাই বলছেন :

অজ ছোবল লেফ নিহালিয়াঁ কোল
নিয়ামত ভরিয়া থালিয়াঁ
বউনাল পয়ারে খাবিয়ে হোর মশুক
গুলাব লগাবিয়ে।

অনুবাদ রূপ হল :

নিয়ে এস আজ লেপ ও তোশক
থালা ভরা নিয়ামত
প্রিয়তমসহ আহারে বিহারে সুগন্ধ সম্পৎ।

এই প্রসঙ্গে সাধক কবীরের একটি প্রচলিত ও পরিচিত দোহাঁ মনে পড়ে যায়। তিনি বলছেন :

দুলহানি গাবহু মঙ্গলাচার,
হাম ঘরে আয়ে পরম ভরতার।
সুর তৈত্তেশি পঞ্চক আয়ে
প্রেমী সব জগবাসী,
কহে কবীর হাম ব্যাহি চলে হৈ
বালম এক অবিনাসী।

সূফী সাধকগণ এই বালক, বল্লভ বা প্রিয়তমের সন্ধান করেন অনন্তর। তাঁরা তাঁদের ভক্ত জীবন প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন। এর মধ্যে কজন সাধক মিলনের মাধুর্য খুঁজে পেয়েছেন জানি না, তবে বহুজনের হৃদয় বিরহের বেদনা ও অনন্ত দুঃখের সংগ্রহে মধুময় হয়ে উঠেছে। সূফী ফারুদ ফকির তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

সূফী করীম বখশ

প্রেম কাকে বলে ? প্রেমের প্রকৃত অর্থ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে একথা বলা যায় প্রিয়তমের সঙ্গে একাত্মতা, তারই মধ্যে নিজের বিলীন হয়ে যাওয়ায় আনন্দময় সহজ উপলব্ধি। এই উপলব্ধি সুখের কেন ? এর ভেতর দিয়ে সুখের অনুভূতি হৃদয়কে ভরাট করে কেন ? মানুষে মানুষে যে প্রেম তা রূপজ বা গুণজ-এর মধ্যে স্বার্থহীন কামনাহীন নিবেদন বা ভালবাসা থাকে না। কিন্তু সূফী সাধকদের প্রেমের সার্বিক অনুভূতিতে যে উপলব্ধি হয় তার ভেতর বিশুদ্ধতা আছে সমস্ত সত্তার কেন্দ্রীভূত আবেগের নিবিড়তা আছে, তাই এই প্রেমে শুধুই আনন্দলাভ করা যায়। প্রেমের আনন্দে প্রেমিক চঞ্চল হয়ে ওঠে। জাগতিক সমস্ত মালিন্য থেকে মুক্ত হয়ে নিঃসীম আকাশে সে নিজেকে বিস্তৃত করে পরমতম প্রার্থিতজনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। সাধকদের ভেতর এই চঞ্চলতার আবেগ দেখা যায়। তাঁরা মিলনের আকুলতায় উন্মাদ হয়ে যায়। তাঁদের জীবনের এই উন্মাদনা অরূপের রূপের তৃষ্ণার এই আচ্ছন্নতা সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করে তোলে। তাঁরা যেন মাটির পৃথিবীতে পা ফেলতে চান না। পাখা মেলে দেন অসীম দিগন্তে। বাউলের গানের মধ্যে আছে :

আমরা পাখির জাত
আমরা হাইটা চলার ভাও জানি না
আমাদের উড়ে চলার ধাত।

তীব্র অনুরাগের জন্য সাধকরা সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করেন। সাধকদের হৃদয়ের এই আনন্দ আবেগ বিচ্ছেদে যা বেদনায় রূপান্তরিত হয় তারই প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁদের কাজে কথায়। কবি সাধকরা কাজের মধ্যে সেই অপূর্ব উপলব্ধিকে ধরে রাখেন। যা যুগ-যুগান্ত ধরে মানুষকে অমৃত রসে আপ্লুত করে।

পাঞ্জাবের এমনই এক সাধক কবি করীম বখশ। তাঁর মাত্র

একখানা কাব্য গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। যার নাম 'বারীশাহ্' বাত বারমাসী। এই একটি গ্রন্থেই কবি তার জীবনের অফুরন্ত বেদনাকে রূপ দিয়েছেন অনবদ্য কথার মাধ্যমে। তাঁর হৃদয় বৃন্তের বেদনাগুলো সহস্রদল পদ্মের মতো করুণরসে স্নাত হয়ে বিকশিত হয়েছে অনন্ত এক মাধুর্যে। করীম বখশের জীবনকাল জানা যায় না। অনুমান করা হয়। তিনি দিল্লীর আবুল হাসানের শিষ্য ছিলেন। আবুল হাসানের তফারিহুল আবরিয়া ফিল আম্বিয়া' পুস্তকটি অনুবাদ করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগে তিনি জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। পাঞ্জাবী অনুবাদটির শেষদিকে করীম বকশ তাঁর বারীশাহ্ মোহাম্মদী অর্থাৎ মোহম্মদের ওপর বারমাসী সংযোজিত করেন। বারমাসীতে মধ্যযুগের বাংলা বারমাসী কবিতার ভাব ও ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মদিনা সূফীর আধ্যাত্মিক বাস-ভূমি এবং কবি নিজেকে মনে করেন একজন বিস্মৃত ও অবহেলিত আশিক। কবির বাসভূমি কোথায় ছিল তা জানা যায় না, তবু 'ভ' এর জায়গায় 'ব' এর ব্যবহার দেখে মনে হয় তিনি জলন্ধর বা হোশিয়ারপুর জেলার লোক ছিলেন। সূফী ছিলেন তিনি তাঁর তখল্লুম ছিল 'বদর'। এই সূফী কবির বারমাসী থেকে কবিতা তুলে ধরছি :

চেতর : পাঞ্জাবী সালের প্রথম মাস।

চেতর চিন্তা হরদম চমকে তরফ মদীনে যাবাঁ মঈ।
পকড়া জালী রোখে সনদা রো রো হাল সুনারা মঈ।
ভা বিছোড়ে বিয়োগ বিখায়া বসলো পানি গাবাঁ মঈ।
জে কর ইয়ারী করে নসীবাঁ বদর পিয়া আলোবা মঈ।

বাংলা অনুবাদে এ রকম দাঁড়ায় :

চৈত্রী চিন্তায় কেবল চমকিত মদিনার দিকে ধেয়ে যাই
রওয়ার জখারী অথবা জালি ধরে বলব হাল মোর বেদনাই।
বিরহ অনলেতে দুজনে একা একা মিলনবারি আমি ঢালি যে তাই
ভাগ্যে থাকে যদি মোদের বন্ধুতা বন্ধুকে বুকে তুলে ধরি যে ভাই।

বেসাখ : পাঞ্জাবী বছরের দ্বিতীয় মাস।

করণ বেসাখ তৈয়ারী সাঈয়াঁ বলমিল নহাওন মুঁ
উঠ উঠ পথে পলং দবিরদা মই খণ্ডী দে খাওয়ান মুঁ ।
মঈ তত্তীতে তত্ ভলভী জমী দরদ উঠ কে বাঁ মুঁ ।
তেরে বাঝ-রসূলা কেহড়া কড্ডা হাল শুনাবন মুঁ ।

এর বাংলা অর্থ : বৈশাখে বন্ধুরা তৈরি হয় সবে একসাথে মিলে জল
স্নান করিবারে
আমার পালং ওঠে তপ্ত আধারে চাহে পশুর মতন করে
গিলিবারে ।
উষ্ণ তাপে ঘেরা আমার জন্ম শুধু দরদ বেদনা সহিবারে
হে রসূল তুমি বিনা কে আছে বলো আমার এই হাল কব কারে ।

জেথ : বছরের তৃতীয় মাস

জেজঠো হেঠ গর্মা দে আঈ দরদ বিজোড় খাঁদা জে ।
জলদ মদীনে সদ দো ফেরত, নহঁ আজীর মর জাঁদা হে
থাক সরেতে চাক গরীবা যোগী ভেস বটাঁদা হে ।
আইজাতলা বাঁ তে ফেরত দমদম দরদ সতার্দা চপ ।

অনুবাদ রূপ এরকম : জ্যৈষ্ঠে ডুবে থাকি গভীর দুঃখে বিরহ বেদনা
মোরে গ্রাস করে
জলদি মদিনায় আমায় হযরত তা না হলে বুঝি এ গরিব মরে ।
ভস্ম মাথায় নিয়ে সহায়হীন আমি বাগান বদলে নি যোগীর
পোশাকে
মরণ কাছাকাছি ভাই হে হযরত এ ব্যথা পলভরে জ্বালায়
আমাকে ।

হাড় : আষাঢ় বছরের চতুর্থ মাস

হাড় মাইনে হাতে ঘটাঁ রো রো হাল বজবাঁ মঈ
দূতী দুশমন কুল জমানো কিওঁ করজান বচা বাঁ মঈ ।
চোরী ছপপে ভাইয়াঁ কোলো তরফ সদীনে জাবাঁ মঈ ।
ওহ কেড়ো দিন ভাগী ভরিয়া জদ প্রিয়া অঙ্গ লাবা মঈ ।

বাংলায় অনুবাদ করলে এইরূপ :

আষাঢ়ে দীর্ঘশ্বাস, কেঁদে আমি বারে বারে কাহিনী শুনাই,
কেমনে বাঁচার প্রাণ আমার নিন্দায় যত কথা বলে দুশমন সারা
জমানাই।
যুগে যুগে ভাইদের কাছ থেকে দূরে থেকে গোপনে চলেছি মদিনায়
অতি শুভ সেইদিন কি ভাগ্যের যেদিন বুকেতে ধরি সে প্রিয়তমায়,
আহা সে প্রাণসখায়।

সাবন : বছরের পঞ্চম মাস শ্রাবণ

সাবন সিন না বিরহো দেঁদা রো রো চিকা মারা মঈ।
অইহ্ মহ্বুর হবীব খুদা দে কিম দরজায়ে পুকারা মঈ।
দুশমন পালে দূতী বেড়ো কিকর উমর গুথারা মঈ।
আই জান লবাঁ তে জানী জান তেরে তো নাড়া মঈ।

এর বাংলারূপ এমন :

শ্রাবণে বিরহ ভরা ঘুম চাই চোখে কেঁদে করি চিৎকার,
খুদার হাবীব শোনো কোন পথে কোন দ্বারে যাব তাই ডাকি
বারবার।
দুশমন পালি, তারা কুৎসায় রত, জীবন কাটাব কি করে।
জীবন এসেছে ঠোঁটে আমার কুরবান শুধু তোমার তরে।

ভাঁদো : ভাদ্র, বছরের ষষ্ঠ মাস।

ভাদোঁ তার বিচোড়ে ভবকি, জল বল কোলা চোবাঁ গী
খালি মইহল ভরাওয়ান মইথেয় হাজুহার রাবোবা গী।
ঘর দেওয়ালী জাত না অছি কী স অগগে জা রোবাগা।
চল মদীনে খাবিনদ অগগে হুন-হুতবণ হ্ আলোবাগী।

অনুবাদের চেহারা হল :

ভাদ্রে এ বিরহ আগুন জ্বলেছে জ্বলে জ্বলে আমি হয়ে যাই কয়লা।
শূন্য মহল মনে ভয় হয় বন্ধুর মালা অশ্রু গাঁথায়
আমার গৃহের প্রভু চাহনি আমার জাত

কার কাছে যাবে কাঁদি তাই ভেবে।

মদিনায় চল যাই প্রভুর সম্মুখে দুই হাত জোড় করে দাঁড়াই

অসোজ : আশ্বিন বছরের সপ্তম মাস।

অসোজ : অসোজ আস ন হীঁ কুঝ বাকী মঈ আসী খুর লাদী হাঁ।

তেরে দরদ্ বিচোড়ে হযরত খুব জিগর দা খাঁদী-হাঁ।

লিক খিয়া লেখ নসীব তখন দা আই ঝোলী হূন বাঁদী হাঁ।

সারওয়ারে আলম দোহী জাহানী তেরি গোলী বাঁদী হাঁ।

বাংলা অনূদিত রূপ :

আশ্বিনে আর কোনো আশা নাই পাপী আমি বিলাপে সকল বরবাদ,

তোমার বিচ্ছেদ ব্যথা, হজরত আমি পাই হৃদয়ের খুনের আস্বাদ।

অনন্তের বুকে মোর ভাগ্যের লিপি লেখা, প্রাণে তার পেয়েছি আভাস।

দুই হাজারের তুমি সওয়ার, আমি আছি বিনীত তোমার ক্রীতদাস।

কত্তক : কার্ত্তিক বছরের অষ্টম মাস।

কত্তক কৌন শুনে ফরিয়াদ তুঁ সবওয়ারে সুলতানা হুই,

তুঁ মহবুব রসূল খুদা দা ওয়ালী দো হীঁ হোগী হুই

তেরি খাতির পইদা হোয়া, যে জিমি আঁ আসমানা হুই,

দুনিয়া অনকর হারে দিহড়ে তুঁ মেরে খামানা হুই।

বাংলায় অনুবাদ এ রকম :

কে শুনবে ফরিয়াদ তোমার খিলানে যবে তুমিই যেখানে সুলতান,

আল্লাহ্‌র প্রিয় তুমি প্রিয়তম নবী তাই সারওয়ারে তুমি দো-জাহান।

তোমার খাতিরে সৃষ্টি আসমান জমীন যা কিছু আছে বুকে তার,

হতাশের মতো মোর দিন কাটে পৃথিবীতে, তুমি বন্ধু প্রভু যে আমার।

মগহর : অগ্রহায়ণ বছরের নবম মাস।

মগহর মুলক বহী হাঁ হযরত আর কত্তো দিলদারী মঈ।

লখ লখ বারী বারী হাওয়াঁ ঘোল ছতাঁ ইক্ বারী মঈ।
খেশ কবিলী ঘোল ঘুরাবাঁ হো কুয়াবান নককারী মঈ।
হে ইক ঝাত মে অসর আবে দোঁহী জাহানী কারী মঈ।

বাংলা অনুবাদ রূপ :

অগ্রহায়ণ হায় জীবন ফুরিয়ে আসে, হজরত এস, প্রাণ দাও
লাখ লাখ বার আমি তোমা তরে কুরবান, চিরতরে আজ তাই
করে নাও।
পরিজন বন্ধুরে করি কুরবান, দীন আমি গুণহীনও বটে তাই
নিজেরে কুরবান করে বাঁচি যদি দু জাহানে অনুকুল দৃষ্টিকে কাছে
পাই।

পোহ : পৌষ বছরের দশম মাস।

পো মহিনে সরওয়ার বাসো যা মন্দ মোর চিতি হে
শা' আলা দুশমন নাল না হোবে জহী বিহোড়ে কিতি যে।
কি আদ খাঁ মাঈ ইশক কবলি খাঁ মৌত আপে সঙ্গ লিতি যে
যইহর পয়ালী ইশকে ওয়ালী মিত অকখী মঈ পিতি যে।

অনুবাদ রূপটি এইরকম :

এ পউষ মাহিনায় সবওয়ার হীন আমি কি হয়েছে কি দশা মরণ।
আল্লাহ্ যে হাল এই বিরহ করেছে তাহা দুশমনেরও না হয় কখন।
প্রেমের একটি গ্রাস আমি তাই কি বলব মৃত্যুরে আশা করি নিজে
দু চোখ বুজে পান করেছি প্রেমের বিষ, পেয়ালায় তার স্বাদ কি যে।

মাঘ : বছরের একাদশ মাস।

মাহী মাঘ না মঈ ঘর আয়ে খালি মেজ দরাবেগী
পইয়াঁ বরাফাঁ সরদী সুরাকী সরদী পীড় খবাবেগী।
বেলী কেলি সঙ্গ না বেলী বদর হবেলী খাবেগী।
আহ হযরত, দিদার বিকখাও থোক কলেজে জাবেগী।

বাংলায় অনুবাদ :

মাঘ মাসে ঘরে নাহি আসে মোর প্রিয়তম শূন্য শয্যা পেতে শঙ্কিত
যে

তুহিন তুষারপাত ভীষণ হিমেল বাথা আমার বেদনা আজ বঞ্চিত মে

বন্ধু সাথে নেই নির্জন হাবেলী যেন একা পেয়ে গ্রাস করে আমাকে

আহা ফেরত দাও হে তোমার দিদার শুধু নয় তো ব্যথা পৌঁছবে হৃদয় আঁধারে।

ফাল্গুন : বছরের দ্বাদশ মাস।

ফগন ভুখখী খুহে যাদে তঈ ঝাঁঝে কুঝ ইয়াদ নহীঁ

গুজরিয়াঁ সাল না সজ্জন আয়ে জা কোঈ ফরিয়াদ নহীঁ।

অইহ্ মকবুল রসূল খুদা দে বিন তেরে দিল শাদ নহীঁ।

জায় পুকারাঁ বিচ মদীনে কিউ হুনদী ইমদাদ নহীঁ।

বাংলা রূপ এইরকম

ফাল্গুনে ভুখা আমি লাল রঙ মুছে গেছে তুমি ছাড়া মনে নাহি আর

অতীত হয়েছে কাল, প্রিয়জন আসিল না নাহি কোনো ফরিয়াদ তার।

খুদার মকবুল নবী তোমা ছাড়া হৃদয়ের, জীবনের নাহি কোনো স্বাদ।

মদিনায় যাব আর তোমাকে ডাকব সেথা নাহি মোর তারে ইমদাদ।

এইভাবে ঋতুচক্র পরিবর্তনে দিন মাস বছর কেটে যায়। নতুন করে বছর আসে। কিন্তু সাধকের মনের আগুন নেবে না। তাঁর মনের আকাশে বেদনাবাষ্প পুঞ্জীভূত হয়েছে। একদা হয়তো কোনোদিন প্রিয়তমের প্রেমের স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শে প্রতীক্ষিত বর্ষণের তৃপ্তির জল তাঁর সমস্ত উষ্ণতাকে ধুয়ে দেবে। তাঁর মনের বিরহের অবসান হবে। বর্ষা যখন আসে তখন আমাদেরও মনের আনন্দ-বেদনা, দ্বন্দ্ব-সংশয়, আশা-নিরাশা ঘুরতে থাকে। বর্ষা ফুরিয়ে গেলে নতুন করে সূর্যের কিরণে সেইসব আশা কামনা সহস্রদল পদ্মের মতো বিকশিত হবে। সাধক এই দিনের প্রত্যাশায় জীবন উন্মুখ করে বসে থাকে। সত্যের প্রতি তাঁর লক্ষ্য। এই তাঁর সাধনা।

শাহ করম আলী

আকাশে চাঁদ থাক আর নাই থাক, আমি চিরকাল তোমার থাকব। সাধক মনের এই হল আকুলতা। এই আকুলতার পেছনে আছে অহেতুক প্রেম ও বেদনাবোধ। সাধক তাঁর বিরহ জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে, বনে জঙ্গলে, গ্রামে গঞ্জে। অভিসারিকার মত তাঁর চিত্ত তখন মত্ত। সাধকের জীবনে বিরহ ও দূরত্ব আছে বলেই তাঁদের জীবন প্রেমধন্য। তাঁরা যেমন চির আনন্দের আস্বাদ পান তেমনি বেদনাবোধও তাঁদের মনকে সমভাবে ঘনীভূত করে। দুঃখের ভেতর দিয়েই এক পরমপ্রাপ্তির সমাধি লক্ষ্যে তিনি পৌঁছে যান। তখন যে নির্বিকল্পতা দেখা দেয় তাই তাঁর সাফল্য। সাধকের জীবনের বেদনা কিসের? কেনই বা তাঁরা এই স্বইচ্ছায় এই বেদনাকে বয়ে বেড়ান এবং আত্মাকে কষ্ট দেন? তার কারণ তাঁরা 'আমি' থেকে মুক্ত হতে চান। আমির মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে সাধক মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন প্রিয়তম দূরে সরে যায়। আমির মধ্যে কিছু নেই, আমি মানেই অহংকার—সাধক তাই আত্মাকে খোঁজেন। তাঁর উপলব্ধিতে এটা আলোর মতো পরিষ্কার আত্মার মধ্যেই সব আছে। সুতরাং মনন ও ধ্যানের দ্বারা সাধক সেই বিমূর্তকে মূর্ত করতে চান। পরমপ্রাপ্তিতে পৌঁছে সাধক বুঝতে পারেন এতদিন যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সংশয় তাঁর হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত করেছে, পরম তত্ত্ব ও তথ্যকে অজ্ঞানতার আড়াল দিয়ে ধোঁয়াটে ও জটিল করে তুলেছে তার শেষ হয়েছে। মনীষা ও মনন, সাধন ও ভজন দ্বারা তিনি বিশ্বমুক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। নিরহঙ্কার স্বচ্ছ জীবন তাঁর। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর জীবনের আনন্দ ও দুঃখ, রাগ ও অনুরাগকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে উন্মোচন করেন। অনেকেই এই ক্রমবিকাশের খবর রাখে না। রাখা সম্ভব নয়, কারণ এ সমস্তই ঘটে সাধকের প্রাণের গভীরতম দেশে—যেখানে ভাষায় কোনো ধ্বনির স্পন্দন নেই। আছে শুধু অনুভূতির

কম্পন। একমাত্র যাঁরা কবি তাঁদের কাছে এই ভাবলোকের রূপ ধরা পড়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারেন :

> খুঁজে যারে বেড়াই গানে, প্রাণের গভীর অতল পানে
> সেজন গেছে নাবি,
> সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্ন লোকের চাবি।

প্রকৃত সাধকরা এই চাবির সন্ধান পেয়ে যান। তাঁদের মনন আপনাআপনি জানিয়ে দেয় চাবির খবর। আর এর জন্যই সাধকের জীবন, চলা বলা সবকিছু সাধারণ মানুষের মনে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতির উদ্রেক করে। সেই সঙ্গে জাগিয়ে তোলে বিস্ময় ও কৌতূহল। এই কৌতূহল সাধারণকে সাধকের দিকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যায়। একজন সাধক তাই বলেছেন মন ভক্তিভাজনের বৈঠকখানা।

আসলে সংসারী মানুষরা ভক্ত ও সাধকদের জীবনের মধ্যে অমন জীবনের সার্থকতা প্রতিফলিত হতে দেখে। তারা একাগ্রতা কেন্দ্রীভূত দৃষ্টি, স্থির লক্ষ্য ইত্যাদি গুণাবলীর প্রকাশ সাধকের মধ্যে পান। কারণ সাধকরা যে কোনো বিষয়ের মূলে চলে যান, মূলের গভীর থেকে রস আস্বাদন করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে আবিলতা নেই, সঙ্কীর্ণতা নেই, সহজ ও নিয়োজিত সাধন-জীবন তাই এত সুন্দর। সাধন শেষে পাণ্ডিত্যের অহমিকা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ সামান্য জ্ঞান অর্জন করেই লাফিয়ে বেড়ায়। অহঙ্কার যায় না বলেই মুক্তি হয় না। তারা ভাবে এত জটিলতা কেন? কেন এত সমস্যা? অথচ ভক্ত বা সাধকের সমস্যা নেই। স্ফটিকের মতোই তাঁর চিত্ত নির্মল। পদ্মের মতোই তিনি পূর্ণ প্রকাশিত।

রণজিৎ সিং-এর রাজত্বের সময় যখন ভারতবর্ষে মুঘল আমলের অবসান আসন্ন, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন বিদেশীর পদপাত স্পষ্ট তখন সৈদদ করম আলী শাহ্ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তাঁর জন্মস্থানের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। তাঁর সাধনস্থান সম্পর্কে জানা গেছে গুরুদাসপুরে তিনি সাধনা করেছেন। গুরুদাসপুর জেলার কোতলায় তিনি তাঁর পীর হুসাইনের সন্ধান পেয়েছিলেন। পীরের

স্থায়ী আবাসস্থল বাতালায় ছিল বলে মনে হয়। কারণ একটি কবিতায় লেখা আছে :

করম আলী, চল শহর বতালে লোক ফান পই জানী নুঁ।

করম আলী, বাতালা শহরে যাও, (এখানে) লোকেরা আমার জীবন করে তুলেছে অতিষ্ঠ।

পীর হুসাইন করম আলী কে সত্যজ্ঞান লাভে সাহায্য করেন। তাঁর সাধক জীবনকে পরিপূর্ণ হবার অবকাশ করে দেন। গুরুর কাছে সত্য জ্ঞান লাভ করে তাঁর মনের অন্ধকার দূর হয়। তিনি সেই উপলব্ধিকে কবিতার ভাষায় ধরে রেখেছেন মুক্ত মনের আস্বাদ পেয়ে।

করম আলী হুঁ বারে বারে, পীর হুসাইননে তারে তারে
দুখ গায়ে সাড়ে সারে হোয়ে সতগুরু মেহেরবান কুড়ে।

বাংলা অর্থ করলে এমন শোনায় :

করম আলী এখন কুরবান, পীর হুসাইন তাকে বাঁচান।
আমার দুঃখের চির অবসান, কারণ সদগুরু বড় মেহেরবান।

করম আলীর কবিতায় ফিলাউর রেল লাইন প্রবর্তনের উল্লেখ আছে। যদি এর থেকে হিসেব করা যায় তো করম আলীর জীবন কালের একটা সময়কে নির্দিষ্ট করা সম্ভব। ফিলাউর রেল লাইন বসছিল ১৮৭০ সালে। ১৮৭০ সালের তিরিশ বছর এদিক ধরে মোটামুটি ১৮৪০ থেকে ১৯০০ এই ৬০ বছর সময় ধরা যেতে পারে। এই ষাট বছর করম আলী বেঁচেছিলেন ধরে নেওয়া যায়। এবং এরই ভেতর তার সাধনকাল অতিবাহিত। যতদূর মনে হয় সূফী সাধনার স্তরের দিক থেকে তিনি কাদিরী শ্রেণীর ছিলেন। এই মনে করার পেছনে একটা সূত্র রয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ পুত্রের কল্যাণ কামনা করে তিনি এক জায়গায় বলছেন :

গওস—আলাযিম শাহে যীলানী হুয়াই তুমপর আবাদিয়ান—এই লাইনটি কবির খিয়াল গ্রন্থের দ্বাদশ লোয়ীভুক্ত।

শাহ্ করম আলী সূফী কবি হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাবধারাকে তিনি অতি সুন্দর করে কাব্যের

মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন। ফলে তাঁর কবিতা স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ববর্জিত। যদিও কাব্য রচনার মধ্যে সূফী ও সহজিয়া মতবাদ রয়েছে তথাপি করম আলীর রচনায় ইসলামী চিন্তাধারার প্রভাব অনেক বেশি স্পষ্ট ও সুপরিকল্পিত।

করম আলী কাব্যের কোথাও গোপিনী সেজে তাঁর সঙ্গে কেলি করবার জন্য কৃষ্ণকে আহ্বান করেছেন এবং তার পরেই তিনি হজরত মোহাম্মদকে মানবশ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষরূপে বর্ণনা করে ইসলামের প্রতি তাঁর ভালবাসার পরিচয় রেখেছেন। অন্যান্য সাধনপন্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ থাকলেও তিনি কখনোও ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি। ভক্তমনের ভাবপ্রকাশকে বিস্তৃত করে দেখানোর জন্য তিনি কৃষ্ণ ও গোপিনীর মিলনস্বপ্ন ও রসকেলিকে প্রতীকী রূপে ব্যবহার করেছেন মাত্র। আসলে তাঁর কাছে রসুল আল্লাহ্ অনেক বেশি জীবন্ত ও সার্থক জীবনের অধিকারী ছিলেন। সকলের কাছে তাঁকেই তিনি মুক্তির দিশারীরূপে চিত্রিত করেছেন। করম আলীর ভেতর সহজ আন্তরিকতা ছিল। এই আন্তরিকতা দিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য কামনা করেছেন এবং তাঁর স্বরূপকে অনুসন্ধান করেছেন।

সূফীমতে দীক্ষা গ্রহণান্তে তিনি হাজীরূপেই জীবন কাটান। হাজী অর্থাৎ পথপ্রদর্শক হয়ে সব সময় আল্লাহ্‌র প্রশংসা গান করেন। মনের গভীরে সাধক মনের অভিসার চলে। নিস্তব্ধতা ও গভীর নির্জনতায় ভাব সহজ প্রসার ও প্রসাধন হয়। সব সাধকই তাই নিরিবিলি ভালবাসেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

মম মন উপবনে চলে অভিসার আঁধার রাতে।

এই অন্ধকার নিশীথের নির্জন উপস্থিতি ও গহন নীরবতায় সাধক মন ব্যস্ত হয়ে প্রসারিত হয়। তখন অনন্তের উপলব্ধি হাতের মুঠোয় আসে। অসীমকে সীমার মধ্যে কল্পনা করা যায়। সাধকগণ তাই গোপনতা ভালবাসেন। জন-অরণ্য থেকে অগোচরে থাকা। এই প্রসঙ্গে বিহারের এক সাধকের কাহিনীকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যেতে

পারে। নিবিড় বনের গহন নির্জনে তিনি বাস করতেন। ঝরঝর করে ঝরণা বয়ে চলে নিস্তব্ধতার মধ্যে সঙ্গীতের ধ্বনি বহন করছে। গভীর অরণ্য চারপাশে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। নানা ধরনের পাখি ও নানা তরুলতা এই বনভূমিকে অদ্ভুত এক সৌন্দর্য ও মাদকতায় ভরে রেখেছে। দূর থেকে সাধকের কাছে এক ভক্ত এসেছে। ভক্তের নিবেদনের উত্তরে সাধক বললেন, আমি কি জানি বাবা, আমরা তো মুক্ত হয়েই আছি, শুধু মন তা বুঝতে দেয় না। তার অনেক কিছু কাম্য ও কামনা আছে, রয়েছে নানা ধরনের লোলুপতা ও স্বার্থপরতা। এই ভারপ্রাপ্ত মন নিয়ে শুধু তাঁকে দেখি। আর দেখি তাঁর তৈরি করা অফুরন্ত লীলাচাঞ্চল্য। বসে বসে দেখি আবেগের উচ্ছ্বাস জীবনের কলতান। তিনিই প্রকৃত কবি বটে বাবা! তাঁর কাব্যে কত না বৈচিত্র্য, কত বৈপরীত্য। এই দেখছি দিন রাতের আবর্তন, ঝরণার কলস্বর, বর্ষার বনবীথি ও মুখর পাখিদের অফুরন্ত গান। সেইসঙ্গে পত্রে পুষ্পে বৃক্ষে বর্ণচ্ছটা। মেঘে সমুদ্রে বাতাসে আবেগ, সূর্যে চাঁদে আলো। এসবের আর কতটুকু আমি জানি। শুধু দেখি। বসে বসে দেখাতেই বুক ভরে যায় আনন্দে। এক পবিত্র শুচিতায় হৃদয় শুদ্ধ হয়। চোখ তো আমাদের সবার আছে। কিন্তু তাতে মহাবিশ্বের এই অফুরান লীলার কতটুকু ধরা পড়ে। আমরা আত্মসর্বস্ব। আমাদের দৃষ্টি তাই আচ্ছন্ন— তাতে ঢাকা পড়ে যায় গভীর প্রশান্তি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য বোধ। যেমন করে এই দৃশ্যটাই সাজান আছে আচ্ছন্নতায় তাকে আমরা তেমন করে দেখতে পাই না। কারণ সেই তন্ময়তার অনুভব কোথায়।

সাধক এই তন্ময়তাতেই বাস করেন। নির্জনে সেই তন্ময়তা আসে। দৃষ্টি বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়। সাধক জীবনে এই দেখায় অনুভবে যে তৃপ্তি সেই তৃপ্তিতেই তিনি পরিতৃপ্ত। ফলে সংসারের সমস্ত সুখ দুঃখের উর্ধ্বে তিনি অবস্থান করেন। আর তার জন্যই তাঁরা অন্য সাধারণের কাছে প্রণম্য ও শ্রদ্ধার্হ। করম আলী হয়তো জীবনে এ রকম স্বাদ পেয়েছিলেন আর তাকেই ধরে রেখেছিলেন নিজের কাব্যের ভাষায়।

করম আলীর লেখা খেয়ালগুলির মধ্যে চার জাতের কবিতা আছে। কাফিয়ার মতোই খেয়াল গান হিসেবে বাঁধা হয়েছে এবং গাওয়াও হয়েছে। খেয়াল অর্থে চিন্তা বা ভাবধারা। করম আলীও তাঁর রচনায় নিজের চিন্তা ও রসময় ভাবধারাকে প্রকাশ করেছেন যার জন্য তাঁর রচিত কাব্য সংকলনের নামকরণ করা হয়েছে খেয়াল। মোট আশিটা কাফিঁয়া কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়, আবার কোনোটা বেশ দীর্ঘ তাঁর কাব্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। করম আলীর রচনায় আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনিই প্রথম পাঞ্জাবী কবি, যিনি কাফিঁয়ার মধ্যে গজলের আমদানি করেছেন। ভাব ও গীতিরসাত্মক সুদীর্ঘ গজলগানগুলি উর্দুতে লেখা। যদিও এর মধ্যে আরবী ফারসী ও প্রচুর পাঞ্জাবী শব্দ ব্যবহৃত হয়ে গানগুলির বিশিষ্টতা বাড়িয়েছে ও তাকে সমৃদ্ধ করেছে। যদিও তাঁর উর্দু জ্ঞান ছিল সীমিত ফলে ভাষার দিক দিয়ে তা খুব একটা উৎকর্ষতা লাভ করে নি।

লোরী জাতীয় কবিতা সংখ্যায় মাত্র বারোটি। এই কবিতাগুলি বাঙালীর ঘুমপাড়ানী গান বা ছড়ার মতোন বলা যায়. করম আলীর পুত্রের জন্মের পর তার মনোরঞ্জনের জন্য লোরীগুলি পাঞ্জাবী ভাষায় লিখেছিলেন। লোরী ছাড়া তাঁর রচনার দোহার জাতের কবিতাও রয়েছে। সমস্ত কবিতার মধ্যে কাব্যগুণ ও সূফী ভাবধারার বিচারে খেয়ালগুলিই প্রধান রচনা বলা যায়। প্রচলিত গুরুবাদে তাঁর দৃষ্টি আবৃত থাকলেও আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী অস্তিত্বের অনুভূতি তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন। সর্ব কর্মে তাঁরই কল্যাণ ও দাক্ষিণ্য তিনি প্রসারিত দেখেছেন। এই ব্যাপারটা তাঁর জীবনে খুব স্পষ্ট ও সত্য হলেও ভক্তির আতিশয্যের দরুন তিনি পীর পুজোয় মেতে উঠে সত্যকার ইসলামী সূফীবাদ থেকে খানিকটা সরে গিয়েছিলেন।

ভক্ত মন উন্মত্ত হবে শুদ্ধ ও সংহত মনে ভক্তির প্রকাশধারা প্রবাহিত হবে সবশেষে ভক্তিরস ও জ্ঞান একসঙ্গে জারিত হয়ে যাবে। তাহলেই হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে গভীর আনন্দের অপরিমেয়তায়। বিরাজ করবে মহাপ্রশান্তি ও তৃপ্তি।

করম আলীর রচনায় সুর ও অন্তরঙ্গতাকে নিবিড় করে পাওয়া যায়। রচনাগুলি পড়লেই এই অন্তরঙ্গতাটুকু মনকে নিবিষ্ট করে তোলে। অন্যকে অন্তরঙ্গ করে। বাংলার এক সূফী বলেছিলেন, আমি কাঁদি না, মন আমাকে কাঁদায়। করম আলীর গানেও তেমন নিবিড়তা রয়েছে। যেমন :

মেরে সিনে বজদি হূল ইশক পিয়ারে দী
তুরান ফিরান থি আজীয কিতি লগগি কলেজে সূল
এহ দুখ লগগিয়া সান্নু কারী হেয়ী অরাম না মূল
ইশক পিয়ারে দী জে ইক্ বারি দরস দিখাবে মাইনু সারে দুখ কবুল।
ইশক পিয়ারে দী করম আলী নুঁ দেবে দিখাই
মুখ ইয়ার দা রব রসূল।
ইশক পিয়ারে দী।

বাংলা ভাবার্থ হল :

আমার সিনায় আঘাত প্রেমের হূল ফুটেছে বুকে
চলতে ফিরতে ব্যথায় কাতর প্রেমের দরদটুকে।
ব্যাধি আমার গভীর রে ভাই, নাই যে আরাম তার
প্রিয় প্রণয় ব্যাধির থেকে বাঁচার রাস্তা নাই যে আর।
সকল দুঃখ কবুল করি দেখি যদি একবার
প্রিয় প্রেমের এই যে সকল দুঃখভার।
করম আলী প্রিয়তমের রসূল মুখে হোক প্রকাশ
প্রিয় প্রেমের রূপ স্বরূপের সত্যিকারের আভাস।

শিখধর্মের গুরু প্রশংসার মতো করম আলীও কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। যেমন :

সত গুরাঁ দে চরণী লগ পিয়ারে সত গুরাঁ দে।

সত্ গুরু, চরণী, ভ্রম, শীতল ইত্যাদি শব্দগুলি শিখধর্মসঙ্গীতে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। গুরুর প্রশংসা গান বলে ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। করম আলীর খেয়ালে অন্য ধর্মের বিশ্বাসের

ভাবধারার অনুরূপ ভাবধারারও পরিচয় রয়েছে। হোলী খেলার মতো শ্রীকৃষ্ণের কথা তিনি তাঁর রচনার মধ্যে বলেছেন :

হোরী খেলো বিরজ কে বাসী হোরী খেলো
কোঈ উড়াবত হৈলাল গুলালী, কোঈ ফঈ কত হৈ পিচকারী।
হামারে মহল মঈ করো নাহি আয়ো
লোক করত হৈ হাসি।

করম আলীর একটা লোরী গান :

লোরী দেদে বাবল হসদা
পড় পড় ওয়াব্ তল্লাহ্ ফিল দসদা
দুই বহম পড়ে হে বসদা
করম আলী চড় অনহদ বসদা।

বাংলা রূপ এই রকম :

ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে বাপ হাসে
বার বার আবৃত্তি করে ওয়াব্তল্লাহ (আল্লাহ্র মুখ)
দ্বৈতবাদের বোকামী যায় দূরে
করম আলী, আত্মা হয় ঊর্ধ্বগামী
অনন্তের বুকে সে বাস করে।

মৃত্যুর কিছুকাল আগে করম আলী কয়েকটি দোহা রচনা করেন :

ওয়াকত আখিরি আ গয়া থল্লে মওত পয়গাম।
চল করম শাহ চলিয়ে, ঝগড়ে মিটন তামাম।

শেষ মুহূর্তে এসেছে মৃত্যুর পরোয়ানা। নিচের তলায় চল করম আলী, সব ঝগড়া বিবাদের হোক অবসান। সাধারণ মানুষের মনেও সংশয়ের দ্বিধার শেষ নেই। সংসারের প্রতি পদক্ষেপ সন্দেহ দ্বন্দ্ব। কিন্তু সেই আন্তরিক দুঃখ কোথায়? প্রিয়তম থেকে আলাদা হয়ে বহুদূরে থাকার দুঃখ? আমাদের মন কি সেই পরম প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদে? কাঁদে না। সাধারণ মানুষ কাঁদে স্বার্থের জন্য, সামান্য ছলাকলায়ভরা মানবীর জন্য। নারীর জন্য দিওয়ানা হয় কিন্তু আল্লাহ্র জন্য হয় কি? আল্লাহ্র প্রেমে কেউ পাগল হয় না।

সাধকরা নির্জনে বসে পরমার্থের সাধনা করেন। এই সাধনা তো আর কিছু নয়—ব্যাকুল হয়ে নির্জনে বসে তাঁকে ডাকা। তাঁর চিন্তা করা। তাঁরই অদর্শনে অশ্রুপাত। সাধকদের সংসারের প্রাত্যহিক জীবন তাই ঘিরে ধরতে পারে না। তারা জাগতিক বিষয়বস্তুকে তুচ্ছ মনে করে একই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁরা নিজেরা কাঁদেন অন্যকে কাঁদান। করম আলী অবিরাম কেঁদেছেন। তার মতো যেন আমারাও কাঁদতে পারি আর রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারি :

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল,
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।
এতদিনে জানলেম, যে কাঁদন কাঁদলেম
সে কাহার জন্য :
ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্য এ জাগরণ
ধন্য রে ধন্য।

সূফী গুলাম হুসাইন শ'হ্

উনবিংশ শতক শুরু হয়ে গেছে। পাঞ্জাবের বুক থেকে সূফীভাব ও প্রেমের রঙ ক্রমশ ফিকে হয়ে এসেছে। ছিটেফোঁটা রঙ এদিকে সেদিকে ছিটনো। বসন্তর শেষে যেমন কৃষ্ণচূড়া আর পলাশের শাখায় শাখায় তার নেশার রেশটুকু রক্তরঙে লেগে থাকে এও তেমনি। বাতাসে মহুয়ার গন্ধে এখনো মাতলামি। এই রকমই এক অবসরে কেলিয়ানওয়ালা গ্রামে চেনাব নদীর তীরে গুলাম হুসাইন জন্মগ্রহণ করেন। গুলাম হুসাইন হলেন পাঞ্জাবী সাহিত্যের সূফীভাবাপন্ন মুষ্টিমেয় শেষ মরমীয়া কবিদের অন্যতম। গুলাম হুসাইন দুখানা সিহারফি রচনা করেন। একটির নাম হীর অন্যটির নাম বাবামাহ (বারমাসী) তাঁর কাব্য রচনার ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল। মধ্যযুগের কৃত্রিম অলঙ্কারে ভরা নয়। তিনি পুরনো কথাকেই বলেছেন। কিন্তু সেই বলার মধ্যে নিজের অনুভাবনার আবেগকে মিশিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে স্বাদে গন্ধে ও রঙে তাঁর বক্তব্য এক নতুনত্ব পেয়েছে। সাহিত্য যুগে যুগে এরকম করেই নতুন নতুন বাঁক নিয়ে থাকে। সাহিত্যের বক্তব্যর তেমন কিছু পরিবর্তন হয় না। বদলায় তার আঙ্গিক। বলার ধারা। এই বলার ভঙ্গি মানুষে মানুষে কালে কালে নতুন রূপ নেয়।

প্রেম ধর্মও সাহিত্যের মতো। প্রেম একই থাকে, ধর্মের ব্যাখ্যাও প্রায় এক। শুধু বদলায় পরিবেশনের নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য। গুলাম হুসাইনের লেখাতেও এই নতুনত্ব প্রকাশিত।

মিম মুটঠিয়া কুটঠিয়া ইশক তেরে, গঈ যৌক বিচ বিহা রাঁঝা
হোই নফি তেরি আসবত পিছে, ছড্ডি আপনি যত্ সফাত রাঁঝা
হোই মহব তসবির মঈ হুসন তেরে, দিতে বহিম খিয়াল উঠা রাঁঝা
বাকী জাত হই জাত হুসাইন তৈরী, রহি লুঁলুঁ দে বিচ সমা রাঁঝা।

বাংলায় অনুবাদ রূপ :

আসক্ত তোমার প্রেমে পরম তৃপ্তিতে রাঁঝা নিজেকে হারাই। আমি নাই, তুমি আছ আমার সকল সত্তা গুণ রাঝা নাই কিছু নাই

নিমগ্ন তোমার রূপে ছবিতে ও দৃশ্যরসে
অরূপ তোমার জন্য নগণ্য খেয়াল ছেড়েছি,
কি আছে বাকী, তুমি ছাড়া শুধু তুমি
প্রতি রন্ধ্রে প্রতি রোমে তুমি, তুমি চিরকাল।

অরূপের রসরূপকে অবলম্বন করে সূফী কবি তাঁর নিজের বিলোপ ঘটান। একদিকে থাকে কবির রূপমুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি ও প্রেম এবং অন্যদিকে সাধকের আত্মনিমজ্জনের আকুলতা। মন যখন রাঁঝার জন্য ব্যাকুল হয় তখন কি তা কোনো বাধা নিষেধকে মান্য করে? হীরের প্রাণ রাঁঝার জন্য ক্রন্দনে মুখর। হীর রাঁঝা পাঞ্জাবী সাহিত্যের একটি বিখ্যাত লোকগাথা। সূফী সাধকরা এই লোকগাথাটিকে নিজেদের বৃহত্তর প্রয়োজনে রূপক হিসেবে নিজেদের কাব্যে ব্যবহার করেছেন। হীরের মা হীরকে বাধা দিয়েছেন। সৎ উপদেশ দিয়েছেন। তবু সে পাগল রাঁঝার জন্য। সাধকরা যেমন কোনো নিষেধ মানে না তেমনি প্রেমিকও কোনো বাধাতে টলে না। হীরের মা কথার উত্তরে বলছে গোলাম হুসাইনের ভাষায়:

যে বস মতভী সানু দস নাহীঁ
অসাঁ সমঝ লোঈ অঈ তেরি রস মাঁঅই।
কাবে বল কারেনি এঁ কনড মেরি
কেহরি নাল হদিস দে দস মাঁঅই।
রাঁঝা জান দে বিচ মকান মেরা
রিহা জীব নহীঁ মেরে বস মাঁঅই।
মাহী নাল হুসাইন ফকীর হোসাঁ
তেরে খেড়ি আঁ দে সির—ভস্ মাঁঅই।

সহজ বাংলায় ভাবার্থ এই রকম:

থাক থাক মাগো আর দিও না কোনো উপদেশ—
তুমি কি বলবে তা আমিও জানি।
কাবাকে পিছনে রাখি, কোন শরীয়ত মতো
বলো মাগো বলো, তবে তাহা মানি।

আমার আশ্রয় রাজা জীবনের কথা শোনো মাগো
আমি যে আমার ভেতরে আর নাই,
প্রিয়তম সাথে আজ আমি যে বিলীন হব
তাই তোমার কথার শিরে দিয়ে ছাই।

গুলাম হুসাইনের যে জীবনী পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় চেনাব নদীর তীরে কবির দুঃখ ও দারিদ্র্যভরা জীবন কেটেছে। কিন্তু তাঁর কাব্যের মধ্যে কোথাও এর চিহ্ন নেই। তিনি সাধকজীবনে প্রিয়তমকে একমাত্র আশ্রয় জানতেন। এতে তাঁর মন প্রসন্ন ছিল। যার ফলে কাব্যের প্রতি ছত্রে ভাবে ও ভাষায় মুক্ত প্রেমের প্রশান্তি ও প্রশস্তি বিকশিত। সমস্ত রকম বিক্ষোভ দুঃখ থেকে তিনি সযত্নে মনকে দূরে রাখতে পেরেছিলেন। প্রিয়তমের প্রতি সমস্ত অনুরাগকে তিনি সযত্নে লালন করেছিলেন। তাঁর কাব্য তাই অতি সহজেই সাধারণ মানুষের হৃদয়ে ঘা দিয়েছে।

কাব্য বা সাহিত্য সৃষ্টির প্রাথমিক ব্যাপারই হল বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড় ভালবাসা ও আন্তরিকতা। গুলাম হুসাইন এই আন্তরিকতাকে যত্নবান হয়ে বহন করেছেন। তাঁর কাব্য তাই কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যতার জন্য।

মাটির কুটিরে আমি বসে আছি, আমার বিলাস,
যদিও বা খুদকণা খাই তবু তোমার আকাশ
ফাঁকে ফাঁকে চেয়ে দেখি, অবারিত মনের দুয়ার
খুলে যায় ; ছাড়া পায় পাখি দুটি ডানা মেলে তার
উড়ে যায় শূন্যে কোন দূরান্তের স্বপ্নভরা চোখ,
যেখানে অরণ্য মায়া, কম্পমান তারার আলোক !
পাশে তুমি, সে কি তৃপ্তি ! প্রাণবন্ত রঙের আভায়,
রূপসীর ওষ্ঠ যেন আপেলের মঞ্জরী কাঁপায়
তোমার আবেগ। তাই কবি আমি আনন্দ আমার
সৃষ্টি করি অনুরাগে, সীমিত সে তবু বারবার—
তোমার সমুদ্র স্রোত স্পর্শ করি। কখনো দুর্বার

অতৃপ্ত পিপাসু-মন, জেগে ওঠে কামনা বন্যার,
তবু শান্তি। এই পাশে ফুটে আছে অজস্র গোলাপ :
তোমাকে যে ভালবাসি, এ যে তার রক্তিম প্রলাপ।

মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত এই উপমহাদেশে যে সব সাধক কবি প্রেমের পথ ধরে ঈশ্বরের দিকে এগিয়েছেন তাদের জীবন রসধারা সূফী ভাবরসে অভিষিক্ত। সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সেই সূফীদের সঙ্গে পা ফেলতে চেষ্টা করেছে। প্রেমের আবেদন চিরকালীন। তাই প্রেমিকের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা চিরকালীন বলে সুদীর্ঘ সেই অতীতকালের কাহিনী আজো ভোরের ফুলের মতো টাটকা ও অম্লান মনে হয়। পাঞ্জাবী সূফীরা একদিক দিয়ে বাঙালী সূফী সাধকদের কাছাকাছি। অনুরাগের গতিবেগেই, প্রেমের আবেগেই তাঁরা সমস্ত বাধাকে টপকে সাধনার সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন। সৌন্দর্য-মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করতে করতে অদ্ভুত এক তন্ময়তার মধ্যে তলিয়ে যান। বাঙালী বাউল তাই কণ্ঠ ছেড়ে গেয়ে ওঠেন :

সকল অঙ্গ খাইয়া ফেল না রাখিও বাকী,
রসিয়া বন্ধুর লাগি রাইখ দুটি আঁখি।

এই রসিয়া বন্ধুর বাইরের রূপ সুষমায় সূফীর দৃষ্টি মুগ্ধ। তার ভেতরের রূপে সূফীর হৃদয় উদ্ভাসিত। স্বতোৎসারিত এই উদ্ভাসের প্রকাশে তাঁর কাব্যগান হয়ে ওঠে মনোগ্রাহী। অদম্য আবেগ সূফী কবিদের যেন সহজাত প্রবৃত্তি এবং এই আবেগকে প্রকশের জন্য তাঁদের অসম্ভব ব্যাকুলতা দেখা দেয়। যার ফলে তাঁদের রচিত সবকিছুই সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যে চিরকালীন ছোঁয়া পেয়ে। সাধক কবি দাদুর ভাবশিষ্য রজ্জবজীর কথা দিয়ে এই ব্যাকুলতাকে যেন স্পষ্ট করে বুঝতে পারা যায়। তিনি এক জায়গায় বলছেন :

গৈব কুঁরূপ দে, মৈন কুঁ ভাস দে,
বাণী দে বাণী দে, দে দে প্রকাশ দে।

অর্থাৎ যা কিছু অদৃশ্য তাকে রূপ দাও, যা মৌন তাকে ভাষা দাও, বাণী দাও, প্রকাশিত হবার শক্তি দাও। কি সুন্দর ভাব! মানব

জীবনের দেহমনের প্রকাশ তো অনন্তর চলছে। বিবর্তন ও আবর্তন। কিন্তু আত্মার আরতি কি চলছে? তার জন্যে কই আমরা তো আকুল হই না। সাধকরা হন। তাঁরা আত্মার আরতির মধ্য দিয়েই পরমার্থকে আবিষ্কার করেন। তাই তাঁরা স্বতন্ত্র, তাঁরা অনন্য। আমরাও যেন গুলাম হুসাইনের মতো নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারি। তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারি: হে বাণী। প্রকাশিত হও, তাঁর গুণগানের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হও।

গণদিলা বাহাদুর

গণদিলা কথাটার সাধারণ অর্থ যাযাবর। পাঞ্জাবের সূফী বাহাদুর ছিলেন যাযাবর। যার জন্য তাঁকে গণদিলা যাযাবর বলা হয়। যাযাবরের জীবনের স্থিতি নেই, আছে গতি। বাধাবন্ধহীন, দ্বিধামুক্ত স্বাধীন জীবন। বহু দার্শনিক গতিকে প্রেম বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ প্রেম মানেই আবেগের গতি। আগুন যেমন সামান্য থেকে হাওয়ার ভরসায় লেলিহান হয়ে ওঠে, নদী যেমন সাগরের বুকে পড়বার জন্য দুর্দমনীয় গতিতে ছোটে, প্রেমও তেমনি। সামান্য প্রেমের পরশ কাপুরুষকে সাহসী করে, ঘরমুখোকে বাইরে টেনে আনে। যেসব সাধক ও কবি গীতি কবিতা রচনা করেন তাঁদের সৃষ্ট সেই গীতের ভেতর থেকেই লুকনো প্রেম চোখ মেলে। গানের সুরে সুরে অগোচর থেকে সে গোচরে আসে। এক বিশেষ অনুভবের ছোঁয়ায় এই প্রেম জন্ম নেয়। তাই বলে তা কোনো বস্তু দ্বারা লালিত বা আশ্রিত হয়ে থাকে না। নিরাবলম্ব হয়েই নির্লিপ্তির মধ্যে সে তার আসন পাতে।

সূফী বাহাদুরের জীবনে এই প্রেমের উন্মেষ হয়েছিল হঠাৎ। বিশেষ এক ব্যাপার থেকে আকস্মিক প্রেম এসে ভর করেছিল বাহাদুর শার জীবনে। প্রেমের প্রকাশে সব সময়েই বিশেষের একটা ভূমিকা থাকে। তারপর প্রেমের ছোঁয়া পেয়ে সাধক ও কবি তাঁর পরিমিত মাপকাঠির জগৎকে পরিত্যাগ করেন। বিশেষ তখন নির্বিশেষে পরিণত হয়ে যায়। সূফী বাহাদুরও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি প্রেমের প্রভাবে নির্বিশেষ-এ পৌঁছে যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করেন।

নির্বিশেষ এক উপলব্ধির স্তর। এই স্তরকে ধরে রাখতে কবির প্রয়োজন প্রতীকের। বিখ্যাত ইংরেজ কবি শেলী এক জায়গায় বলেছেন, বিশ্বের অন্তহীন সৌন্দর্যকে অনুভব করার জন্য নারীর সৌন্দর্য উপভোগের প্রয়োজন আছে। রমণীর সৌন্দর্য বিকাশের মধ্যে

দিয়ে শেলী বিশ্ববিমোহিনী কান্তিকে অনুভব করেছেন। বাস্তব জগতে মেয়েরা হল এই সৌন্দর্য উন্মেষের প্রাথমিক উপাদান। জীবনের ক্ষেত্রে নারীর প্রেম ভীষণ প্রয়োজন। সাধনার ক্ষেত্রে সূফী বাহাদুরকে দেখা যায় নারী রূপের সম্মোহনে মুগ্ধ থাকতে। এই রূপ-মোহকে তিনি মায়া বলেছেন, তবুও প্রেমের পূর্ণাহুতির জন্য মায়ার প্রয়োজনকে একান্তভাবে স্বীকার করেছেন।

যাযাবর বৃত্তি গ্রহণের পশ্চাতে সূফী বাহাদুরকে প্রেরণা যুগিয়েছে তাঁর সৌন্দর্যলিপ্সা। সুন্দরের প্রতি তৃষ্ণাই তাঁর জীবনের সাধনাকে সহজ করে দেয়। সূফী বাহাদুরের সাধনা নির্বিকল্প সমাধি নয়। পরিপূর্ণভাবে সুন্দরকে উপলব্ধি ও উপভোগের মধ্যে দিয়ে তিনি আত্মার আরতি করেছেন। যা তাঁর মন ভরিয়েও অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। তাঁর মর্ত্য-প্রণয় পূর্ণতা পেয়েছে বিশ্বপ্রেমের ভেতরে। সৌন্দর্যের ধ্যান ও আরতি বিশেষ এক রূপ বা দৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়. সূফী বাহাদুরের আত্মা ছিল অনন্তাভিসারী। তাই গতি অর্থাৎ যাযাবর বৃত্তি তাঁর জীবনের কাম্য ও সিদ্ধিলাভের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে দেখা দেয়।

সূফী গণদিলা বাহাদুরের জীবনকাল ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ এই একশ বছরের মধ্যে বলে অনুমান করা হয়। অনুমান ছাড়া সঠিক সময় নির্ধারণের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত অবাধ্য ও দুর্বিনীত ছিলেন। অন্যের অধিকারে হাত বাড়ানোতেই তাঁর স্ফূর্তি ছিল। ফলে অল্প কিছুদিনেই তাঁর পরম মিত্ররাও একে একে সবাই তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

জীবনে যখন এই এলোমেলো বিপর্যয় তখন গণদিলা বাহাদুর পীর মোহাম্মদের দেখা পান। মোহাম্মদের পবিত্র দোয়ায় গণদিলা বাহাদুরের অভিশপ্ত অতীত এক নতুন খোলসে ঢেকে গেল। নতুন ভাবে তাঁর জীবন গড়ে উঠতে লাগল। আল্লাহ্‌র প্রেমের পথে তাঁর যাত্রা শুরু হয়ে গেল। তিনি অল্প কদিনেই একজন ভ্রাম্যমাণ ফকীর-রূপে সবার কাছে পরিচিতি লাভ করলেন। এখান থেকেই তাঁর নামের আগে গণদিলা কথার ব্যবহার শুরু হয় লোকমুখে।

স্থিতিতে সূফী বাহাদুর পরিমিত পরিবেশের রঙে রসেই অঙ্কুরস্থিত হয়েছিলেন। গতিতে এবার তিনি পরম প্রিয়তম আল্লাহ্‌র উদ্বেলিত প্রেমের আনন্দ-রসে অবগাহন করলেন। পবিত্র কোরান শরীফের কথায় মনের এই ভাবকে খুব সুন্দর ও শিল্পময় ভাষায় বলা হয়েছে সিগনাতুল্লাহ্—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রঙের অনুরঞ্জন। যে অনুরঞ্জনে সূফী বাহাদুরের সমস্ত দেহমন, অন্তরসত্তা নতুন করে পাওয়া বোধময় আনন্দ ও নিগূঢ় স্ফূর্তিতে গতিময় ও বাঙ্ময় হয়ে দ্বিধাতীত স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি আকাশচারী নভশ্চরের গতি পেলেন, পরমতম জনের প্রেমের ছোঁয়ায় ধন্য ও প্রাণময় হয়ে পড়লেন। সূফী বাহাদুরের জীবনে এই গতিময়তার সাধনা ও কল্পনার দ্বারা রঙীন হয়ে শিল্প ও আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়েছে। তিনি ভুলে গেলেন প্রাক্-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মত্ততা। তাঁর জীবনে দেখা দিল চলার আনন্দ। ফুটে উঠল মাশুকের প্রেম প্রার্থনা। তাই তিনি এক জায়গায় বলেছেন :

মেরী জাত গণদিল্লী আহী
হরদম মংদী ফজল ইলাহী।
অসী গণদিলে জাত কমিনে
সব কোঈ সাথো ডরদা।
মঙ্গন খৈর খাইয়ে যিসভেডে
দূর দূর চূন চূর করদা।
আপে ঝিড়কে আপে দেবেঁ
সাথো কুঝ্ না সরদা।

বাংলায় অনুবাদ রূপ :

জাত মোর যাযাবর হরদম চাই আমি
ফজল বা প্রেম ইলাহীর।
বেদে আমি ছোট জাত আমাকে যে
সকলেই ভয় করে শঙ্কা গভীর।
যে পথেই যাই আমি ভিক্ষা লাগি
সকলেই ঘৃণা ভরে বলে দূর দূর।

তুমিও মন্দ বলো, যদিও ভিক্ষা দাও
জানি আমি অক্ষম তবু কি মধুর !

কবি ও সাধকের কাছে বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য রহস্যের মোড়কে মোড়া। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সে অপার সৌন্দর্যরাশি উচ্ছ্বাসমুখর এবং শত শত ধারায় যা উৎসারিত পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, তার মূলে যে শক্তি বিদ্যমান, তাকে পুরোপুরি জানতে বা উপলব্ধি করতে না পেরে কবি ও সাধকরা এই শক্তিকে মায়া, মোহিনীশক্তি ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত করেছেন। বিশ্ববিমোহিনী কান্তি বলেও অনেকে এর উল্লেখ করেছেন। সূফী বাহাদুরও শেষ নামে ভেবেছেন। সূফী বাহাদুরের মনে মায়া একটি প্রচ্ছন্ন শক্তি—এই শক্তি মানুষের দেহ মন আত্মা নিয়ে খেলা করতে পারে। এরই স্পর্শে মানুষের সমস্ত রকম প্রতিভা প্রেরণা পেয়ে পূর্ণতা পায়। বেদান্তের মায়াবাদের মতো বা অলীক অর্থহীন বা প্রলোভনকারী নয়। বাহাদুরের মায়া বিশ্বরূপিণী বা বিশ্ববিকাশিনীর সর্বশক্তি আকর্ষণকারী দুর্বার প্রেম। যে প্রেম বিশ্বকে চালিত করে তার ইশারায়। মায়া জাদুকরী। তার হাতে জাদুর বাঁশি। সেই বাঁশি বাজছে :

আলিম ফাজিল পণ্ডিতদানে
স্তুন স্তুন বীণ হোয়ে মসতানে
ভুল গঈ পূজা নিয়ত দুগানে
অইসী প্রেম ঝড়ী সির পাঈ।
দেখো কৌন বঙ্গালন আয়ী
অইসী রসকর বীণ বজাঈ।
মীর মলিক বাদশাহ্ উনানী
দাবে থককে কর নফসানী
খির খির বাগ হোয়ে গুলফানী
রহী হুকুমত না ইকরাঈ
দেখো কৌন বঙ্গালন আয়ী
অইসী রসকর বীণ বজাঈ।

বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

আলিম ফাজিল আর পণ্ডিত সবাই
সেই বাঁশি শুনে শুনে হল যে মস্তানা,
ভুলে গেছে পূজা সবে তাদের নিয়ত অন্য
এমনি প্রেমের মন্ত্র শিরেতে অজানা
দেখ কোনো বাঙালিনী জাদুকর রসবন্তী
নিখুঁত সুরের জালে বাঁশরী বাজায়
মীর ও মালিকগণ ইউনানের বাদশা যে
পরিশ্রান্ত পৃথিবীর আশা বাসনায়
বাগানে ফুটেছে ; ফুল ঝরে যায়।
হুকুমত রহিল না তিলটি নিঃশেষ
দেখো কোনো বাঙালিনী রসময় সুরে সুরে
বাজায় বাঁশরী তার মধুর আবেশ।

চরম মিলন লাভের কথা সুফী বাহাদুর বলেছেন এভাবে :

সাংগ সবর গুদেলা কলমা, গুর য়েহ্ সায বতায়া,
কসরত বন্ধ নমাজ ধুন ধাঁনিওঁ রাহ্ বইহ্দত দেলায়া।

লাইন দুটির বাংলা পরিবর্তিত রূপ :

সবরের বেশ গায়ে কলমার কম্বল পড়ি আমি যেই
গুরু এই কায়দাটি শিখায়েছে, এই পথে চলে যাই।
নমাজে কুহেলী কাটে অজ্ঞানতা সব দূরে যায়
তার জন্য মুক্ত আমি চলেছি এদের সঙ্গে মিলন আশায়।

সুফী বাহাদুর সোজা কথাকে সোজা ভাষায় বলেছেন। কোনো কথা উপদেশের মধ্যে আবেগকে স্থান দেন নি। কৌশলের আশ্রয় নেন নি। তবু তাঁর কথা মনকে ছুঁয়ে যায়। কারণ তাঁর কথাগুলি বেদনাসঞ্জাত। তাঁর কথার মধ্যে ছড়ানো ছিল বৈচিত্র্যতা।

বেকাস বেদিল

বাঙলার কোমল মাটিতে একদিন অতি স্বাভাবিক ভাবেই সহজ তত্ত্ব বিস্তার লাভ করেছিল। সহজ প্রেমের প্রতি আবেগপ্রবণ বাঙালী আপন করেই সহজতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল। শূন্যতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে সহজতত্ত্ব কোমল একটা ভাবরূপ লাভ করে বাঙালীকে আরেক নতুনত্বে আলোড়িত করল। অষ্টম শতকের ব্রজযানি (বা সহজযানি) বা সহজতত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধাচার্য কানু বলছেন :

ভণ কইসে সহজ বোলবা জাই, কা অবাক চিঅ জস্থন সমাই।

অর্থাৎ এই তত্ত্বকে সহজ বলা যায় কি করে? যার ভেতরে বাক্য ও চিত্ত প্রবেশ করতে পারে না। এটা খুবই ভাববার কথা। এই তত্ত্বের সহজ উপলব্ধি একমাত্র সম্ভব প্রেমের দ্বারা। যে প্রেমিক তার কাছে অনেক কিছুই সহজ। তার অনুভূতি অন্য মানুষ থেকে অনেক বেশি প্রবল। এখন তাহলে প্রথমে জানা দরকার প্রেম কি? প্রেম কাকে বলে? তার লক্ষণই বা কি রকম? প্রেমকে শব্দ দৃষ্টি ভাষা ও কথা দিয়ে নানাভাবে নানারকম ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা যায়। বলা যায় নানা বৈচিত্র্যের কথা। বিভিন্ন রকম রূপ হতে পারে প্রেমের। দৈহিক. দেহাতীত. সৌন্দর্যময়. শিল্প সুষমায় প্রেম বাস করে। ভাব ও রূপের উজ্জ্বলতায়, ধ্যান তন্ময়তায়, গভীর আত্মোপলব্ধিতে, মনের ভাব দ্যোতনায় প্রেম ব্যাপক সুদূরপ্রসারী। যুগে যুগে কালে কালে কবি সাধক ও মনীষীরা প্রেমকে বিশেষ বিশেষ ভাবে দেখেছেন। বিশেষ বিশেষ উপলব্ধিতে প্রেমকে অবলম্বন করেই সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন। বহু কবিতা প্রবন্ধ তত্ত্ব প্রেম বিষয়ে লিখিত চিত্রিত ও রূপায়িত হয়েছে। তাতে প্রেম কি কথা বলে? প্রেমের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কি সম্ভবপর হয়েছে হয় নি। শুধু মানুষের ধারণার মধ্যেই প্রেম বা শরীরী রূপ ধরে রেখেছে। আত্মবিলয় আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রেম লাভ করা যায়। এখন এই আত্মবিলয় কাকে বলব? পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা হল

দ্বিত্বের লোপই আত্মবিলয়। চতুর্দশ শতকের সাধক কবি আমীর খসরু তাঁর এক কবিতায় এই তত্ত্বকে বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন :

মন তু শুদম তু মন শুদী
মন তন শুদম তু জাঁ শুদী।
তা কাস না গোয়াদ বাদ আঁযী
মন দীগরম তু দীগরী।

মধ্যযুগীয় অন্য একজন ভক্ত সাধক একই ব্যাপারে বলছেন :

কব মরি হোঁ কব ভোট হোঁ পূরণ পরমানন্দ।

অর্থাৎ কবে মরব, কবে পূর্ণাঙ্গের সাক্ষাৎ পাব! প্রেমের জগতে দুইকে এক হতে হয়। একের ভিতর অন্যকে মিশে যেতে হয়। দুটি আত্মার একটি মিলিত ধ্বনিকে বজায় করতে হয়। বিখ্যাত ভক্ত কবি কবীরও এই বিষয়ে বলছেন :

জব মৈ থা তব পিও নহী
আব পিও হৈ মৈঁ নহী।
প্রেম গলী অতি সাঁকরী
তাঁহে দোন সমাহিঁ।

অর্থাৎ বাংলা করলে দাঁড়ায় :

যখন আমি ছিলাম প্রিয়তম ছিলেন না,
এখন প্রিয়তম আছেন, কিন্তু আমি নেই
প্রেমের পথ অতি সূক্ষ্ম
দুইয়ের তাতে ঠাই নেই।

প্রেমের শুরু দুই থেকে। প্রথম স্তরে দুইয়েরই বিস্তার। কিন্তু শেষ স্তরে দুইয়ের বিলুপ্তি ঘটে, তখন দুইয়ে মিলে এক। দুই না হলে প্রেম জন্মায় না। আবার দুই মিলে এক না হলেও প্রেম জীবিত থাকে না। পরিপূর্ণতা পায় না। তার মানে দুই যখন জোড়া লেগে এক হয় তখনই প্রেমের জন্ম ও পরিপূর্ণতা। বাংলার বাউল এই বিষয় নিয়ে বলেন :

নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য প্রেম তার নাম।

কবীর সহজতত্ত্বের মূলকথা উদঘাটন করে বলেছেন :

সাধো, সহজ সমাধি তলী,
আঁখ ন মুদোঁ কান ন রুধো
কায়াকষ্ট নহি ধারেঁ।
খুলে নৈন পাহিচানো হঁসি হঁসি
সুন্দর রূপ নিহারেঁ।।

এই মহিমায় সাধকদের সূফী ভাবপ্রেমিকদের প্রেরণা প্রবল ও অনুরাগ প্রচণ্ড। এই রাগানুরাগের দীপ্তিতেই তাঁরা সকল বন্ধনকে অতিক্রম করে জাগতিক অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পান। যখনই উপলব্ধিতে অনুরাগ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তেই তাঁরা সর্বাতীত হয়ে পড়েন। একটি অনুরাগের কাহিনী বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পঞ্চাশ বছরেরও আগের কথা। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হতে চলেছে। সিন্ধু প্রদেশের রোজরি শহরে বাস করতেন যুবক মোহাম্মদ মুহাসীন। প্রতিবেশীদের কাছে তিনি আজব খেয়ালী মানুষ বলেই পরিচিত। তাঁর খেয়ালের মধ্যে অন্যতম একটি হল, নিজের ঘরে তিনি সন্ধ্যাদীপ জ্বালতেন না। অন্ধকারের মধ্যে একাকী নিমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন। গভীর নিস্তব্ধতায় আকাশের তারা দেখতেন আর আনন্দ লাভ করতেন। অর্থাৎ অনুভূতিতে ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি গান গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি যেন বলতেন :

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি,
আমি শুনবো বসে আঁধার ভরা গভীর বাণী,
আমার এ দেহমন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে
আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক না ঢাকা এই বেদনার গন্ধখানি।

একদিন মুহসীন শহরের একটি পথ ধরে চলেছেন। চলতে চলতে তিনি শুনলেন, জনৈক দোকানদার একটি হিন্দু বালককে ডাকছে।

কানহাইয়া কানহাইয়া ঘরে আয়, তোর জন্য অপেক্ষা করে যে আশায় দিন গেল। এই কথা শুনে মুহাসীনের মনের কোণে এক
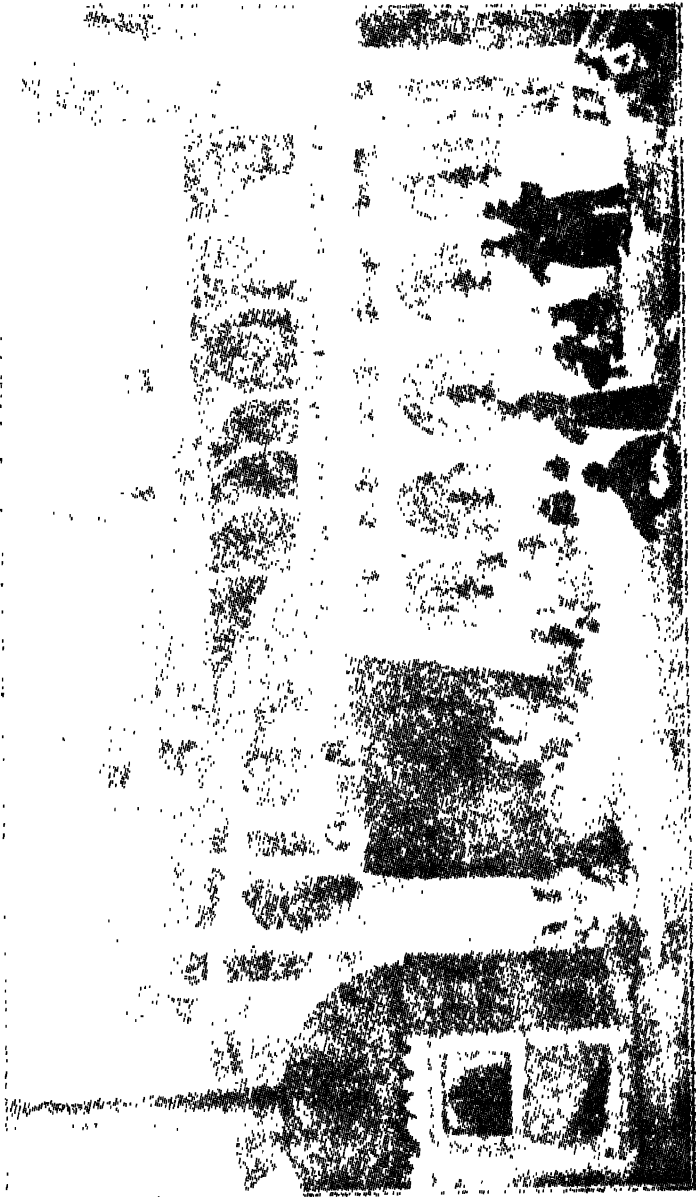
পুণ্যার্থীদের তীর্থভূমি (বেকাস বেদিল সমাধিক্ষেত্র)

গোপনতার বহুকাল ভুলে যাওয়া একটি সুরের গুঞ্জরণ উঠল। এই এক তুচ্ছ ঘটনার আঘাতে তার মনের দরজা যেন খুলে গেল। মুহাসীন ঘরে ফিরে এলেন। যে ঘরে কোনোদিন সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নি সেই ঘরে সেদিন বাতি জ্বলল। প্রতিবেশীরা তো ব্যাপার দেখে অবাক। তারা ভাবতে লাগল। পাগলের এ আবার কি নতুন খেয়াল, সত্যিই খেয়াল বটে। তবে তা মর্মান্তিক। রাতের পর রাত বাতি জ্বেলে দরজায় বসে থাকতেন মুহাসীন। তাঁর মনে কেবল এক চিন্তা সে যদি আসে, ঘর অন্ধকার দেখে সে যদি চলে যায়। তার হৃদয়ের মধ্যে প্রতিবেশীদের সমস্ত ঠাট্টা বিদ্রূপকে ছাপিয়ে সে যেন বলে ওঠে :

তোরা শুনিস নি শুনিস নি পায়ের ধ্বনি ?
সে যে আসে আসে আসে।

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা আর বিরহের আগুনে জ্বলে পুড়ে মুহাসীন একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ। পৃথিবীর কাছে তিনি মৃত। কিন্তু এই মৃত্যুই তাঁকে অমরত্বের সন্ধান দিল। অন্তহীন জীবনের অমৃতের খবর পৌঁছে দিল। তরুণ তাঁর আপন সত্তাকে, মনের ভেতরের আসিমত্বকে প্রেমের দায়ে এমনভাবে হারিয়ে ছিলেন যে, রোহরীর মানুষদের কাছে তিনি বেকাস (সত্তাহীন আসিমত্বমুক্ত) নামে পরিচিত হয়ে গেলেন। প্রেমের তাড়নায় আত্মবিলয়ের নিবিড় ভাবময় আনন্দে অধীর হয়ে সে সব গান তিনি রচনা করেছিলেন এবং গেয়েছিলেন, তার প্রতিবেশীরা সেই সব গানই গাইত। এভাবে মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গীত রোহরির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। রোহরির আশেপাশে গ্রামবাসীদের কণ্ঠে আজো তাঁর সঙ্গীত শোনা যায়।

বেকাসের জীবন ও সাধনা খুবই স্বল্প। কিন্তু তিনি যেভাবে নিজের জীবনকে আত্মনিবেদন করেছেন তা মানুষের মনে বিস্ময় জাগায়। অনেক সাধকই প্রিয়তমের জন্য অপেক্ষা করেছেন। বিরহের আগুন জ্বেলেছেন। কিন্তু বেকাসের মতো কেউই এত তাড়াতাড়ি আত্মবিলয় ঘটাতে পারেন নি। কারণ তাঁর মতো তীব্রতা আর দেখা যায় নি।

এই তীব্রতাই তাঁর আত্মবিলয়কে ত্বরান্বিত করে। প্রেমের পথে বেকাসের এই নিজেকে উৎসর্গ ও তাঁর ধীর স্থির প্রতীক্ষার ভাবরস সকলকে মুগ্ধ করে। এমন কি অন্যের অন্তরকে আলোড়িত করে তোলে। বিরহের আগুনে জ্বলে বেকাস পরম সুন্দরের অমেয় প্রেমকে হৃদয়ে ধারণ করেন। গভীর স্বাদে পূর্ণ এই প্রেমের মধ্যে গভীর তৃপ্তি ও চিরন্তন আত্মতৃপ্তি রয়েছে।

আত্মা পরমাত্মাকে চায়। একে অন্যের সঙ্গে অহেতুক এবং অফুরন্ত প্রেমের বাঁধনে ও দায়ে আবদ্ধ। আত্মনিবেদন আত্মনিমজ্জন ওরকম ভাব সম্মিলনের মারফৎ বেকাসের চরম অভিজ্ঞতা লাভ হল। এই পরম ও মধুরতম অভিজ্ঞতা লাভের জন্য যুগ যুগ ও জীবনভর প্রতীক্ষা করে থাকেন কত সাধক। কিন্তু তাঁদের জীবনে বেকাসের মতো এত সামান্য বয়সে সুন্দরতম জনের সান্নিধ্য ও প্রেম অর্জন অধ্যাত্মসাধনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বলেই আমাদের ধারণা।

একমাত্র আল্লাহ্‌র রহমত হলেই এমন হতে পারে। আল্লাহ্‌র আনন্দ-রস স্বরূপের অকৃপণ হাতের দাক্ষিণ্যের জন্য সাধকরা দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকে। বেকাস এক জায়গায় বলেছেন :

আবাসভূমির জন্য এই আকুল প্রতীক্ষা, এই প্রতীক্ষা দিনরাত চোখে জল বয়ে আনে। প্রিয়তমের আকর্ষণ দুর্বার, তাঁর ডাক সমস্ত মনপ্রাণকে তছনছ করে দেয়। তাঁর প্রেমের রীতিই এই। সেই প্রেমে একবার কোনোরকমে সাড়া দিলে নিজেকে কুরবানি করতে হয়। প্রাণের আনন্দ অর্জনের জন্য চিরন্তন দুঃখের আবর্তের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। মধ্যযুগের এক পদকর্তা তাই বলছেন :

রাতি কৈনু, দিবস দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে পারিনু বঁধু তোমার পীরিতি।

বেকাস মর্মান্তিক ভাবে প্রেমের রীতি বুঝেছেন। তিনি বলেছেন :

প্রিয়তম এর নাম বিয়োগান্ত
তোমাকে দেখা অর্থেই নিহত হওয়া।

সাধকরা ইচ্ছে করেই মরতে চান। সেই মরমীয়া প্রেমের জন্য

মৃত্যু জীবনে এর চেয়ে বড় সুখ আর কি। দুঃখের গভীরতার মধ্যে তাঁরা অনন্ত সুখের কল্পনা করে নেন। অনন্তসুখ মানেই প্রেমের আস্বাদন। ফলে সাধনকালের বিয়োগান্ত ব্যাপারের মধুর পরিণতি ঘটে শেষ অধ্যায়ের মিলনে। কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা থেকে যায় এত দুঃখবরণ বেদনা স্বীকার তা কার জন্য? সে রাজার রাজা সকলের মনের মধ্যেই বাস করছেন তাঁর জন্যই। বেকাস নিজে এ ব্যাপারে বলেছেন:

যে রাজাকে খুঁজতে তোমার মন অন্বিষ্ট

সে তো বিরাজে তোমার অন্তরেই।

খাঁটি কথা। ঈশ্বর অন্তরে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে মিলনে অপেক্ষা শুধু নিজের আমিত্বকে দ্বিত্বকে বিসর্জন দেওয়া। আর তা সম্ভব আত্মহননে। মহাজন বলছেন:

আজ বাহিরে দুয়ারে কপাট লেগেছে

ভিতর দুয়ার খোলা

তোরা নিসাড় হয়ে আয়লো সজনি

আঁধার পেরিয়ে আলা।

আঁধার অর্থ আমিত্বের ব্যবধান ও আচ্ছন্নতা। এখানে প্রতীক রূপে ব্যবহৃত। সাধকের ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ যে মুহূর্তে শেষ হয়ে যায় তখনই আচ্ছন্নতা কেটে যায়। তখন মিলন বাঁশি শোনা যায়। মহাজন তাই কবিতায় বলেছেন

পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে, পীরিতি মিলয়ে তথা।

একদিন সমস্ত অপেক্ষার শেষ হয়। অজানতে সে এসে দাঁড়ায়। সাধকের বিরহে তাপিত জীবন সেদিন প্রিয়তমের আগমনে ধন্য হয়ে যায়। শেষ হয় আকাশের নীচে নির্ঘুম রাত্রের অনিশ্চয়তা। হয়তো এই শুভক্ষণকে মনে করেই ভক্ত সাধক কবীর এক জায়গায় বলেছেন:

হাম ঘর আয়ে-পরম ভরতার।

ধন ধন ভাগ হামার।

বেকাসও কবীরের মতো করে চরম ভাবের আবেগে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন:

প্রিয়তম আমার দেশে এসেছে
হে সঙ্গী সবাই, তোমরা আমাকে আজ
তোমাদের অভিনন্দন ও আশিস পাঠাও।

প্রাপ্তির সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে প্রিয়তমের দাক্ষিণ্য। তাঁর রহমৎ। জোর করে তাঁর রহমৎ লাভ করা যায় না। তিনি যাকে খুশি তাকেই তা দান করেন। প্রিয়তমকে কাছে পাবার জন্য বারংবার প্রার্থনা জানানো যায়, দোওয়া ভিক্ষা করা যায়, দাবী করা যায় না। সাধক শুধু নিজেকে উৎসর্গ করে ব্যাকুল প্রতীক্ষা করবে। ধৈর্যের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে আত্মার নিবেদন চলবে। নিবেদন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেই অকস্মাৎ একদিন আনন্দের দুন্দুভি বেজে উঠবে প্রাণের কোণে কোণে। সমস্ত দেহমন শিহরিত হয়ে উঠবে জাগরণের রোমাঞ্চে। বর্ষিত হতে থাকবে তাঁর অলৌকিক কৃপা। বেকাস নিজের লেখায় এই বোধেরও সম্যক পরিচয় রেখেছেন। তিনি বলেছেন,

সেই জাগে, প্রিয়তম যাকে জাগিয়ে রাখেন।
আর কেউ নয়, অন্য কেউ নয়।

আবার কে? প্রেমের দুইয়ের মধ্যে তৃতীয় জন নেই। তিনিই সব। প্রেমাস্পদ রূপে আনন্দঘন রসের বোধের অনুভূতির যোগানদার রূপে এই বিশ্বে বিরাজমান। তাঁকে চোখে দেখার দরকার হয় না সাধকের, তাঁর বাঁশির ধ্বনি শুনলেই সাধক নিজের বলতে যা কিছু তা বিলিয়ে দেন।

বেদিলও তাই করেছিলেন। বেকাসের পূর্ববর্তী তিনি। বেদিল নিজের আত্মবিলোপের কাহিনী সরল সিন্ধী ভাষায় সহজ করেই বলেছেন: যদি প্রেমের মদ খেতে চাও তো জাগতিক চিন্তা-ভাবনাকে ত্যাগ করো। ছুরির আঘাত এড়ানো কাঁচা ও ভঙ্গুর প্রেমের চিহ্ন। মৃত্যু থেকে মুখ ফিরিও না। এস, তলোয়ারের নিচে মাথা রাখ, পৃথিবীর সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে ফেল। বেদিল বলে, কথা শোন, প্রেমে যদি একান্তই পড়তে চাও তো শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত থাক।

রুমি, বেদিল, শামসুদ সকলেই প্রেমের দায়ে দুঃখ বেদনা ও বিরহের আগুন জ্বেলে মরে গিয়েছিলেন। প্রিয়তমের চরম নিষ্ঠুর আঘাতের তলে মাথা পেতে দিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন তীব্র বেদনার দহন জীবনকে কলুষমুক্ত করে অহমিকার হাত থেকে বাঁচায়। সার্থক ভাবমুক্ত সেই জীবনেই প্রিয়তমের প্রেম ও প্রসন্নতা নেমে আসে আপনা থেকে।

সাধকের সাধনা তখনই ধন্য যখন প্রসন্নতা তাঁর কাছে প্রিয়তমের রূপ ধরে আসে।

দরিয়া খান বোহাল

আমি খুঁজে বেড়াই তারে
যে জন আমায় কাঁদায় অন্ধকারে।

সূফী মনের এই স্বাভাবিক ভাবরস উৎসরণের মধ্যে তত্ত্ব কোথায়? এমন প্রশ্ন যে-কোনো লোকের মনে জাগতে পারে। অতি সামান্য কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়ে সাধক সূফীর মনের যে ভাবাবেগ দীপ্ত হয়েছে তা সাধারণ অনুসন্ধিৎসু যে কোনো মনকে ছুঁয়ে যায় কিন্তু এর ভেতর তত্ত্ব প্রকাশ পায় কি? সামান্য ক'টা শব্দের অভিধানগত অর্থে যেন সূফী সাধকের বক্তব্য বাহিত হয় না। নতুন নতুন আরো অনেক কথা শব্দ ভাবের ঢেউয়ের দোলা দিয়ে দিয়ে একটি ব্যথা ভরা মনের প্রকাশ ঘটায়। সূফীদের কোনো তত্ত্ব থেকে থাকলে, তা আছে এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে। শব্দ ও রসাশ্রিত ভাবের মধ্যে অগোচরে।

তাত্ত্বিকরা তত্ত্ব খুঁজে বেড়াবে কিন্তু সাধারণ মানুষের সে ধৈর্য ও সময় কোথায়? তারা সাধকের বহিরঙ্গের অনুভূতিপ্রবণ সৌন্দর্যকে লক্ষ্য করে। সামান্য কথার সরল পরিবেশনে তারা মুগ্ধ হয়। কোথায় অলঙ্কার রয়েছে, কি দিয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হচ্ছে, তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। মনের গভীরে যে বেদনা কবিকে ক্ষুব্ধ বিচলিত করে, সেই অব্যক্ত কথা ব্যক্ত হয় তাঁর কবিতায়, সাধকের সাধনায়। সাধক বা কবির মনের ঐকতান খণ্ড খণ্ড হয়ে মুহূর্তের মধ্য দিয়ে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। তখন এই মুহূর্ত ছাড়া আর সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়। সূফীরা এমন ভাবপ্রকাশের মধ্য দিয়েই সজীব হয়ে ওঠেন।

চলমান জীবন থেকেই সূফীবাদ গড়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ তারই স্বাদ গ্রহণ করে সাধকের মারফৎ। ভাব ভেতরই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের মূল উৎস দীপ্তি পায়। দু ভাবে শক্তির অস্তিত্ব সাধারণের সামনে প্রতিফলিত হতে পারে। এক গতি ও দ্বিতীয় উত্তাপ। সূফীদের প্রেমই তাদের শক্তি। প্রেমের গতির জন্য তা চলমান ও চঞ্চল।

অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তা ভাবোচ্ছল। উত্তাপ সেই প্রেমের দাহ। বিরহের মধ্যে দিয়ে উত্তাপের সৃষ্টি। দূরত্ব প্রেমাস্পদ ও সাধকের মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করে তাকেই কমিয়ে আনবার জন্য সাধকরা সাধনা করেন। ফলে সূফীবাদের গতি ও উত্তাপ সাধারণ মানুষ অনুভব করতে পারে। এর বেশি সাধারণে আর কিছুই চায় না। বরং এই প্রকাশের মধ্যেই তারা সূফীবাদের সার্থকতা ও সজীবতাকে বুঝতে পারে।

দরিয়া খান এমনই একজন গতিময় তাপিত সূফী সাধক ছিলেন। সিন্ধুর হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের মানুষ ছিলেন তিনি। যদিও তাঁর জীবনের সময়কাল জানা যায় নি কিন্তু এদিক ওদিক ছড়ান তাঁর ভাবরস থেকে আজকের মানুষ বঞ্চিত নয়। দরিয়া খানের সংগৃহীত গানের সঙ্গে অন্য আরেক অন্যতম সূফী সাধক রোহালের গানগুলি কোথাও কোথাও মিলে মিশে গেছে। যদিও এতে প্রেমের গতিপ্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। যেমন একটা গান ধরা যাক :

প্রিয়তমকে যখন অনুভব করি হৃদয়ে
যেখানে কোনো রূপের পরিগ্রহ নেই
শুধু আছে প্রেমের পূর্ণতা।
অতীতকে আমি হৃদয়ে গ্রহণ করি,
ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই
কারণ অনুভূতি মাত্রই চির নূতন।

প্রিয়তমের প্রতিধ্বনি যখন কানে পৌঁছায়, তখন তারা বিস্ময়ের পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং অন্য কোনো ধ্বনিই শুনতে পায় না।

যে সকল কুমারী মুক্ত ক্ষেত্রে আসে
তাদের কাছেই প্রিয়তমের ছায়া
গুণ্ঠনবতী যারা, তারা বরের সঙ্গ পায় না।
আপনার আমিত্ব থেকে যে নিজেকে করেছিল মুক্ত
সে দেখলে সমস্ত ভূমিই তার।
চোখ যখন দেখতে থাকে,

প্রিয়তম দূর থেকে দূরতর হয়।
নিজেকে যতই ভুলতে থাকি,
প্রিয়তম ততই আপনাকে উন্মোচন করেন।
ব্যাকুলতা থেকেই আসবে আলোক।
প্রেমিকগণ কাবায় দাঁড়ায় না।
তারা হৃদয়ের সিংহদ্বারে সেজদা করে।
মক্কা তাদের বাইরে নয় ভিতরে।
তাদের আত্মা প্রতি মুহূর্তেই তীর্থপথিক।

রোহালের ভাই শাহও সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সেই শাহ রচিত কয়েকটি সঙ্গীতেরই প্রথমকলি :

ভাই এমন এক গৃহে আমি বিচরণ করি,
যেখানে তুমি নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই।
তিন জগতে কেউ বাস করে না—
আমাদের জগৎ চতুর্থ, নাম তার, যে শহরে দুঃখ নেই।

সূফীদের এই ভাবরাজত্বে হয়তো সাধারণ মানুষের ঢুকবার অধিকার নেই। তবু দূর থেকে বিস্ময়ের চোখে কারু কাজ ও সাহস সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। বিচিত্র বর্ণালী শোভা। যারা দেখে তারা তা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করে সেই ভাবরসের চিরন্তন আবেগ উচ্ছ্বাসকে নিজের বুকে গ্রহণ করতে।

খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী

নবীজীর জীবন, যা কোরান শরীফের একটি ভাষ্যরূপ, এবং বাণী এই উপমহাদেশের তথা সমগ্র মুসলিম জগতের সূফী সাধকদের কাছে প্রেরণা। নবীজীর জীবন থেকেই তারা ভাবসম্পদের কেন্দ্র মূল ও উৎস খুঁজে পান এবং অন্তরে আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভব করেন। নবীজীকে একবার অনুরোধ করা হল, রসূলুল্লাহ্, অসাধারণ খুব ভাল একটা কাজ কি হওয়া সম্ভব? নবীজী উত্তর দিলেন, জিহ্বাকে আল্লার স্মরণে সব সময় নিয়োজিত রাখবে। খাজা বাবা এবং কুতবুদ্দীন কাকীর সাধন-জীবনে এই কথাটা আধ্যাত্মিক অনুভবে ও সব সময়ের সমৃদ্ধিতে ভাবরসের সঞ্চার সৃষ্টি করে। খাজা বাবা কখনো কখনো সপ্তাহভর ক্রমাগত রোজা রাখেন। দিনে রাতে না খেয়ে অবশেষে হয়তো একখানা রুটি জলে ভিজিয়ে খেয়ে তৃপ্তি মেটান। কুতব সম্রাট বখতিয়ার কাকীও মুরশিদদের স্মরণে বারংবার রোজা রেখে সামান্য ফলমূল খেতেন।

বখতিয়ার কাকীরের সবচেয়ে প্রিয় খলিফা ছিলেন খাজা ফরিদউদ্দিন। ফরিদউদ্দিনের ছেলের নাম নিজামুদ্দীন আউলিয়া দিনান্তে মাত্র কটা করলা সেদ্ধ খেতেন। কিন্তু কামিল সূফী সাধকরা ধ্যানে অমরতার আনন্দে অন্য এক দাহ্য বস্তু গ্রহণ করতেন। আল্লাহ্‌র নামেও যেন অমৃতের খোঁজ পেতেন। তারা তাদের দেহমন ও আত্মা দিয়ে ওই খাদ্য খাওয়ার ফলে পুষ্ট হয়ে উঠতেন।

খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া যখন সকালবেলা তাঁর হুজরা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেন তখন তাঁর মুখের দিকে তাকালে কারো চোখের পলক পড়ত না। পবিত্র সুন্দর জ্যোতির্ময় একটি মুখমণ্ডল। দেখলেই মনে হত সারা রাত তিনি তাঁর প্রিয়তম মানুষের সঙ্গে কাটিয়ে জীবন ধন্য করেছেন। তারই তৃপ্তিতে এত প্রশান্তি, এমন সৌন্দর্য!

প্রিয়তমের নাম জপ করতে করতে অভ্যাসে পরিণত হলে সর্বক্ষণই

তার কথা স্মরণ করা যায়। আপনা থেকেই অতি সহজে প্রিয়তম নাম মনের ভেতর উচ্চারিত ও গুঞ্জরিত হয়। বাইরে সাংসারিক কাজ চলছে, কথাবার্তা, কর্মব্যস্ততা, লেনদেন, সব ঠিক আছে—ভেতরে কিন্তু সত্তার গভীরে অনন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণ চলতে থাকে। সাধকরা তো সব সময়ই নিজেদের নিয়োজিত রাখেন তাঁর মননে, সাধারণ মানুষ একটু সচেষ্ট হলেও এতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী ছিলেন ক্ষণজন্মা সাধক। তিনি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েই আল্লাহ্‌র নামজপ শুরু করেন। এই ঘটনা অলৌকিক বলেই মনে হয় কারণ এর পেছনে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি নেই। তবু এই ঘটনার নাম লোক মুখে যুগে যুগে প্রচারিত হয়ে আসছে। [illegible] হিজরী সালে কারো কারো মতে [illegible] ফরঘনা অঞ্চলের অওশ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কুতবুদ্দীনের বয়স যখন মাত্র আড়াই বছর তখন তাঁর পিতা কামালউদ্দীন পরলোকগমন করেন। শিশুকে তার মা মমতা দিয়ে লালনপালন করতে থাকেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বাবার মুরীদ হয়ে মুর্শিদের সেবায় এবং সেইসঙ্গে মারিফাত সাধনায় মশগুল হয়ে থাকেন। কিছুদিন এইভাবে কাটার পর কুতবুদ্দীন খিলাফতের খিরকা লাভ করেন। এরপর শুরু হয় তাঁর দেশভ্রমণ। নানা দেশ ঘুরে তিনি দিল্লীর দিকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কিছুদিনের জন্য মুলতানে অবস্থান করেন। এখানে সূফী শেখ শাহাবউদ্দীন জাকারিয়া ও মহর্ষি শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। এই সময় খাজা বাবা আজমীঢ়ে ছিলেন। তিনি বখতিয়ার কাকীকে স্থায়িভাবে দিল্লীতে থাকবার নির্দেশ পাঠান। সেই অনুসারে বাকী জীবন তিনি দিল্লীতেই থেকে যান। এখান থেকে কয়েকবার মুর্শিদের দর্শনের জন্য আজমীঢ় যাতায়াত করেছিলেন। এই নিয়ে একটি কাহিনী আছে।

একবার খাজা বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে সফর শেষে তাঁর অন্তরে হঠাৎ রুটি খাওয়ার বাসনা উদিত হয়। কি আশ্চর্য? ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর কাছে একটি রুটিপূর্ণ

খাঞ্চা এসে পৌঁছায়। ঘটনাটিতে সকলেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। এবং সেই থেকে তাঁর নাম রোটিওয়ালারূপে প্রচারিত হয়ে পড়ে।

শেষ বয়সে খাজা কুতবুদ্দীন খুব হীন শক্তি হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় রসূলুল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে পড়ে অন্তরে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকরকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করেন। মৃত্যুর পূর্বে রবীউল মাসের ১০ তারিখে একটি কাওয়ালী গানের আসরে তিনি কাওয়ালীদের মুখে একটি কবিতা আবৃত্তি শুনে ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে পড়েন। তিনি পুনরায় কবিতাটি শুনতে চান। তখন কাওয়ালরা বারবার আবেগভরা গলায় কবিতাটি আবৃত্তি করতে থাকে।

বন্ধুর অস্ত্রের আঘাতে যারা নিহত হয়
তারা অদৃশ্য থেকে এক বিশেষ জীবন লাভ করে।

তাঁর উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়। তিনি তখন নামাজ পড়েন। নামাজের পর আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। উত্তেজনায় তাঁর শরীরের প্রতি লোমকূপে যেন আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হতে থাকে। এই ভাবেই একটা চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে দুটাদিন কেটে যায়। চতুর্থ দিনে সেই কবিতার নির্দিষ্ট ছত্র দুটি শুনে বন্ধুর স্মরণে তিনি বাহ্যিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বাইরে জীবনের কোনো সাড়া নেই, অন্তরে কিন্তু অবিরাম আল্লাহ্‌র যিকর তখনও চলছে। যিকর মানে অন্তরে নাম জপ করা। ১৪ রবীউল আওয়াল ৬৩৪ হিজরী সালে যিকর করতে করতেই তিনি তাঁর পরম প্রিয় বন্ধুর সান্নিধ্যলাভ করেন। দিল্লীর কাছে মোহরওয়ালীতে তিনি সমাধিস্থ হন। আজও লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রেমিক তাঁর সমাধিতে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়ে। আজও এতদিন পরেও রোটিওয়ালা'র কথা ভাবলে সকলের মাথাই শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে যায়।

আমীর খসরু

ইরানের বিখ্যাত কবি ও সূফী সাধক শেখ ফরীদ উদ্দীন মোহাম্মদ আত্তার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আশিক মানুষের মিলনতত্ত্বের রহস্যময় ভাবকথা নিয়ে বহু রূপক কাহিনী রচনা করেছিলেন। তাতে ধর্ম ব্যাখ্যার পাশাপাশি আজগুবি ব্যাখ্যাও রয়েছে। এখানে স্বভাবতই একটা কথা উঠতে পারে, যে কোনো কাহিনীর পেছনে যুক্তি ও বিচার বুদ্ধি যদি সীমাহীন হয় তাহলে বিভ্রান্তি অবিশ্বাস সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে পড়ে। তবু ভক্তি ও বিশ্বাস বশে মানুষ অলৌকিককে গ্রহণ করে হৃদয়ে। কবি আত্তারের সে রকম একটি রূপক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। রূপক কাহিনীটি এই রকম :

প্রেমিক এসে আঘাত করল প্রিয়তমের দরজায়। প্রিয়তম ভিতর থেকে জানতে চাইলেন, ওখানে কে? প্রেমিক উত্তর দিল, আমি। দরজা খুলল না। প্রিয়তম বুঝলেন প্রেমিক এখনো অপরিপক্ক, অপরিণত ও আত্মমুগ্ধ। তাই তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দীর্ঘদিন বাদে আত্মিক উপলব্ধির আনন্দের পর আশিক আবার এসে দাঁড়ালেন। এবারও দরজায় আঘাত করলে সেই একই প্রশ্ন ধ্বনিত হল, কে ওখানে? আত্মহারা আশিক এবার খুব সহজেই উত্তর দিল, এই যে তুমি। আমিত্ব ঘুচে গেছে। মাশুক সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে সাদরে তাকে ভেতরে নিলেন। তুমির মধ্যে আমি হারিয়ে গেল। হিন্দুস্থানের তোতাপাখি আমীর খসরু সাধনার শীর্ষে পৌঁছে আত্মনিমজ্জনের পরম আনন্দ আবেগে গেয়ে উঠেছেন :

মন তু শুদম তু মন শুদী
মন তন শুদম তু জাঁ শুদী
তা কস না গোয়েদ বাদ আযী
মন দিগরম তু দিগরী

বাংলা রূপ করলে এর অর্থ দাঁড়ায় :

আমি হই তুমি আর তুমি হও আমি
আমি হই তনু যদি তুমি তার প্রাণ।
যেন এর পরে কেউ বলতে না পারে
তোমাতে আমাতে আছে দূর ব্যবধান।

আমীর খসরুর পিতা আমীর সাইফুদ্দীন মাহমুদ তুরান দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তখন দিল্লীর সুলতান ছিলেন ইলতুতমিস। সুলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে সাইফুদ্দীন ইটা জেলার অন্তর্গত পাতিয়ালা শহরে বসবাস করতে থাকেন। ১২৫৫ সালে এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন তুতিয়েহিন্দ আমীর খসরু। তাঁর শৈশব ও কৈশোর নানারকম দুঃখ কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়। বহু ভাগ্য বিপর্যয়ের পর আপন প্রতিভাবলে তিনি জালালউদ্দীন খিলজীর দরবারে সভা কবির পদ পেয়েছিলেন। পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীও তাঁকে সভাকবির পদে অধিষ্ঠিত রাখেন। ইতিমধ্যে তাঁর দুখানা বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছিল। প্রথমটির নাম তুহ্‌ফাতুস সিগর বা তরুণের দান। দ্বিতীয়টির নাম ওয়াসতুল হায়াত বা মধ্যবয়সের দান। পরিণত বয়সের দান গুরবাতুল কামাল বা পূর্ণ আলোক এবং 'বকেয়া-নকেয়া' তখন প্রেমের উপলব্ধির জন্য প্রতীক্ষিত। সেই সময় পর্যন্ত তিনি উপযুক্ত মুরশিদ পান নি, যাঁর শিক্ষায় সূফী ভাবের যে নিবিড় চৈতন্যময় আনন্দ পরবর্তীকালে তাঁর জীবনকে সার্থক ও পূর্ণ পরিণতি দান করেছে তা দানা বাঁধতে পারে নি।

সাধকশ্রেষ্ঠ নিজামউদ্দীন আউলিয়া আমীর খসরুর জীবনে এক পরম লগ্নে এসে দেখা দিলেন। এই সাধকের আধ্যাত্মিক সঙ্গ ও সাহচর্য কবির অন্তরের পূর্ণস্ফূর্তি ও পরিণতিকে বিকশিত করে তোলে। আমীর খসরুর দিওয়ানে সূফী ভাবধারাকে রূপের মধ্যে বেঁধে থোকা থোকা পাকা রসসিক্ত আঙুরের মতো জমাট করে তোলে। সূফী ভাবধারায় নিহিত দৃষ্টির উদারতা, অন্তরের ভাবতন্ময়তা ও আবেগ প্রসারের দূর-গামিতা আমীর খসরুকে উদ্বুদ্ধ করে। সূফীদের পরম প্রিয়তমকে

অনুসন্ধানের সাধনা তাঁকে গভীর অনুপ্রাণিত করে। যুক্তি তর্ক বিচার দিয়ে এখানে কিছু লাভ নেই। এই উপলব্ধি অনুভবের। আমীর খসরু অন্তরে সেই অনুভব বোধের উন্মীলন ঘটান। তিনি প্রিয়তম মিলনের জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। যে আকুলতা কোনো যুক্তিকে গ্রাহ্য করে না। তাঁর নিজের কথাতেই এটা স্পষ্ট :

যুক্তি দিয়ে যায় কি ঢাকা উন্মাদনা সত্যকার
বুদ্ধি বিচার সকল কিছু লোপ পেয়েছে আজ আমার।
এসব বালাই রইলে বিপদ নইলে সবই চমৎকার।
প্রেম ও বিচার এ দুটো চিজ যেন তফাৎ আগুন জল।

প্রেমিক আমীর খসরু অন্ধকারের নিভৃত গোপনে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকল দুঃখকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। না হলে তার বদলে মৃত্যু প্রার্থনীয়। তাই তিনি বলছেন :

কেমন করে বাঁচব বলো জীবন মরণ তোমার হাত
হয় মরণ আজ দাও গো তুমি কাটে না দুখের রাত।
না হয় এসে বাঁচাও মোরে সইতে নারি আর জ্বলন।
অন্তরালের অন্ধকারে মিলতে যে চাই তোমার সাথ।

তাহলে কবি ভয় করেন না প্রেমাস্পদের দেওয়া দুখকে। সবই স্বাভাবিক তাঁর কাছে। তাই রুমীর মতো করে তিনিও একই কথা বলতে পেরেছেন নিজের কাব্যধারায় :

তোমার হাতে সুখ পাব না জানি আমি সুনিশ্চয়
দুঃখ যদি দেবেই তবে যেমন তোমার ইচ্ছে হয়।
পরাণ ভরে দুখ দিয়ে যাও করো নাকো তিল কসুর,
দুখ দিয়ে সুখ পেলে তুমি এই ভেবে খোশ মোর হৃদয়।

বিরহ গলিত হৃদয়ের বর্ণনা দিয়েছেন আমীর খসরু তাঁর অনুবাদ ভাষায়। তাঁর বর্ণনায় হৃদয় যেন উদ্ভাসিত হয়েছে সত্যের মতো। তিনি বলছেন :

মোমের মতো ঝরছে গলে ব্যথা কাতর এই হৃদয়
কেমন করে কাঁদব 'উহু' হৃদয় তো আর দুটি নয়।

কেমন করে ভুলব বলো তোমার কাজল দীঘল চোখ
তোমার নীলিম নয়ন বন্ধু ছড়িয়ে আছে আকাশময়!

অনুরূপ বিরহবেদনা রবীন্দ্রনাথের একটি গানের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। তিনিও যেন একই অনুভবে বলছেন :

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশভরে
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।
আমি চোখ এ আলোকে মেলব যবে
তোমার ঐ চেয়ে দেখা সফল হবে।
এ আকাশ দিন গুনিছে তারি তরে।

বিরহের প্রহর গুনে গুনে, বুকের ভেতর অনন্ত বেদনাকে ধারণ করে, প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়ে ও কাব্য রচনার মধ্যে পরম সুন্দরের প্রতি আত্মনিবেদনের সাধনাকে সার্থক করে আমীর খসরু অমরত্ব লাভ করেছিলেন। পরিণত বয়সে ৬৯৩ হিজরী সনে আমীর খসরুর গুরবাতুল কামাল সংকলিত হয়েছিল। এই সংকলনটি তাঁর জীবনের পূর্ণতার জ্যোতির্ময় নিদর্শন। কাব্যখানির প্রতি পাতায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা মুখরিত। পরম প্রিয়তমের স্বরূপ সম্বন্ধে কবি এই কাব্যে তাঁর নিজের অনুভূতি ও বোধকে অপূর্ব ছন্দ এবং অমৃতময় কথায় মূর্ত করে তুলেছেন। কবির চতুর্থ কাব্য সংকলন বকেয়া-নকেয়া ৭১৬ হিজরী সালে আলাউদ্দীন খিলজীর মৃত্যুর কিছু পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যটিও আল্লাহ্‌ রসুল ও মুরশিদ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার প্রশংসায় ধন্য হয়ে উঠেছিল। বকেয়া-নকেয়ার মধ্যে খসরু ইরানের সূফী কবিদের অনুসরণে আল্লাহ্‌র প্রেমের স্বাদকে শরাবের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যেমন :

সখী আজ ঈদ, তাই সাকী পাত্রে ঢেলেছি রুবি
তৃষ্ণার্ত উপবাসীদের জন্য শরবৎ দান করতে।
শরাব রুগ্নের প্রাণ সঞ্জীবনী,
শরাব তরলিত প্রাণ কিংবা পাত্রের বুকে বিগলিত সূর্য।

আমীর খসরু ছিলেন একজন বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকার।

সঙ্গীত জগতে তিনি আজীবন বিচরণ ক'রেছেন। এখানে তাঁর দান অপরিসীম। তাঁর আবিষ্কৃত সেতার যন্ত্র এই উপমহাদেশের উচ্চাঙ্গ সুরসাধনার এক অন্যতম বাহন রূপে আজও ব্যবহৃত। চারখানি অনন্য কাব্যগ্রন্থ ছাড়া বহু গজলও আমীর খসরু রচনা করেছিলেন। এই সব গজলের ভেতর দিয়ে তিনি আজকের বাথার্ত হৃদয়ের অমর্ত্য আনন্দ বেদনাকে রূপায়িত করেছেন অনবদ্য সুরে।

বন্ধু নয়, এই হারানো পথিকজনের পর
তোমার মনের চিন্তা যেন ঝরে নিরন্তর।
রেশম সম পক্ষ্মতলে উজল দুটি চোখ—
জ্বলছে মধুর ঝরছে নিতি অজানা আলোক।
হায় খসরু, দুঃখ যেন গভীর কালো রাত
দীঘল যেন তোমার কালো চুলের রেখাপাত।
প্রিয়া আমার, মিতা আমার বাঁধো কেশের পাশ—
পরশটুকু পাব তোমার দাও না সে আশ্বাস।

শুধু সূফী কবি সাধক হিসেবে নয়। প্রথম উর্দু কবি ও একজন ঐতিহাসিকরূপেও তাঁর দান অসামান্য। তাঁর জীবনের গতি ছিল সর্বত্রগামী। ফারসী ভাষার কবিরূপে তিনি হাফীজ, জামী ও রুমীর মতোই বিখ্যাত হয়েছিলেন। একাধারে এমন বিরাট প্রতিভার আত্মপ্রকাশ বহু শতাব্দী পরেই ঘটে থাকে। মোহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের প্রথমদিকে পীর নিজামউদ্দীন আউলিয়ার ইন্তেকাল হয়। দিল্লীর পশ্চিমপ্রান্তে, এখনকার জঙ্গপুরায় তাঁর সমাধি রচিত হয়েছিল। খুব বেশিদিন মুর্শিদ পীরের বিরহ আমীর খসরুকে সহ্য করতে হয়নি। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মৃত্যুর ছয় মাস পরে ১৩২৪ সালে আমীর খসরুর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। কিন্তু তাঁর সাধনা, তাঁর রচনা যতকাল সভ্যতা থাকবে, সভ্য মানুষ থাকবে, ততকাল এক দেশ থেকে অন্য দেশে অবিরাম ধ্বনিত হতে থাকবে। ইতিহাসে অবশ্য প্রতিভাধর এমন সাধক কবি খুবই কম জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা কাল থেকে কালান্তরে অমরত্ব লাভ করেছেন।

বাবা আদম আলী

বিক্রমপুরের লোকমুখে প্রচারিত কিংবদন্তী অনুসারে বাবা আদম সাত হাজার শিষ্য সঙ্গে নিয়ে সোজা মক্কা থেকে এদেশে এসেছিলেন। রামপালে বাবা আদমের সমাধি আছে। বহু দূর দূর স্থান থেকে ভক্তরা এখানে এসে জমায়েৎ হয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। বাবা আদম যখন রামপালে আসেন তখন বল্লাল সেন ছিলেন গৌড়ের সিংহাসনে। বাবা আদম ও বল্লাল সেনকে ঘিরে অনেক কাহিনী আছে। সেসব অন্য ইতিহাস।

বাবা আদম যে ইসলামের একজন বড় সাধক ছিলেন এটা জানা যায় বহুভাবেই। যাঁর শিষ্য সংখ্যা ছিল প্রায় সাত হাজার মতন, সুতরাং তাঁর খ্যাতি ও ক্ষমতা সেই পরিমাণ ছিল। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর বিষয়ে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। লোক মুখে ছেঁড়া টুকরো কথা। যার কোনো প্রমাণ নেই।

বাবা আদমের সমাধিস্থল এখনো বহু ভক্তের হৃদয় আকর্ষণ করে। তারা এখানে এসে প্রার্থনা জানায়। আল্লাহ্‌র দোয়া কামনা করে। ১৪৮৩ সালে সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ্ শার রাজত্বকালে কোনো এক হাবসী প্রধান সমাধির পাশেই এক মসজিদ নির্মাণ করেন। আদমের জন্ম সাল জন্মস্থান সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

শাহ্ মোহাম্মদ রুমী

মুসলিম রাজত্ব শুরু হবার আগেই সুলতান রুমী বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন বলে কথিত আছে। ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় তাঁর সমাধি এখনো রয়েছে। ১০৫৩ সালে তিনি মদনপুরে এসেছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে একজন কোচরাজ ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করেন। মদনপুর গ্রামটি তিনি এই সাধককে উপহার দিয়েছিলেন সেন রাজাদের পর কোচ রাজারা বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেন

শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ার

শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ার ছিলেন বলখের এক শাহ্‌জাদা। রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস ত্যাগ করে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সংসার ত্যাগ করার পর তিনি দামেস্কের শেখ তওফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মুরশেদই তাঁকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আদেশ করেন। মাছের পীঠে চড়ে তিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন এবং তিনি সন্দ্বীপ হয়ে বাংলায় উপস্থিত হন। এইজন্য তাঁর নাম হয়েছিল মাহী সওয়ার। বগুড়ায় মহাস্থান গড়ে তিনি বসবাস করতেন। এখানেই মাহী সওয়ারের কবর আজও বিদ্যমান রয়েছে।

মখদুম শাহ্ দওলাহ্ শহীদ

হজরত মোহাম্মদের অন্যতম বিখ্যাত সাহাবা মুয়ায বিন জবলের পুত্র (মতান্তরে বংশধর)। মুয়ায বিন জবলের মৃত্যু হয়েছিল ৬৪[illegible] সালে। শাহ্ মখদুম বাংলায় আসেন ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগে। মখদুম শাহ্ পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁর ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে নিয়ে ইয়ামন ত্যাগ করেন। পাবনা জেলার শাহজাদপুরের কাছে পাতাজিয়ায় তিনি আস্তানা গেড়েছিলেন। তিনি একটি মসজিদও নির্মাণ করেছিলেন। তিনিও বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। মখদুম শাহ্‌র বোনের নামে এখনো একটি দীঘি রয়েছে। দীঘিটিকে বলা হয় মতিবিবির ঘাট। শাহ্ মখদুমের সমাধি কিন্তু বাংলা থেকে অনেক দূরে বিহার শরীফের অন্তর্গত। শাহজাদপুরেও অবশ্য তাঁর

একটি কবর আছে। শোনা যায় তাঁর মৃত্যুর পর দু জায়গায় শরীরের দুটি অংশ স্থাপিত করা হয়েছিল। শাহজাদপুরে সমাধিটি তৈরি করেন মখদুম শাহ্‌র বংশের ছেলে শাহ্ নূর। এছাড়াও শাহজাদপুরে মখদুম শাহ্‌র কুড়ি জন শিষ্যের সমাধি রয়েছে। শাহ্ মখদুম ইয়ামেনের শাহ্‌জাদা ছিলেন বলে সবাই জানত। আজও শত শত ভক্ত তাঁর মাজারে সমবেত হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

শেখ জালালউদ্দীন তাবরীযী

বাংলার মুসলমান সন্তদের মধ্যে প্রথম যুগে যাঁরা সাধনা করেছেন তাদের মধ্যে জালালউদ্দীনের আসন খুবই উঁচুতে অধিষ্ঠিত। তাঁর ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং প্রচার তৎপরতার উত্তর বাংলায় ইসলাম প্রচার পথ দ্রুত হয়েছিল। এবং সেই সঙ্গে তিনি সেখানে একটি সুফী সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন, যা তাঁর পরিচালনায় ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। ধর্মপ্রবণতা আদর্শ চরিত্র অক্লান্ত মানব সেবার জন্য শেখ জালালউদ্দীন তাবরীযী লক্ষ লক্ষ বাঙালী ভক্তের হৃদয়পটে চির ভাস্বর হয়ে আছেন। মুসলিম ভক্তজন মাত্রেই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। শেখ জালালউদ্দীন ছিলেন খাজা শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দির শিষ্য। তাঁরই নির্দেশে ও পরিচালনায় তিনি কামালিয়াত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পূর্ণতা হাসিল করেন। বাগদাদে জালালউদ্দীন মিলিত হন মইনুদ্দীন চিশতীর সঙ্গে। মোহাম্মদ ঘোরী যখন দিল্লী ও আজমীর জয় করেন অর্থাৎ ১১৯২ সালে শেখ জালালউদ্দীন ভারতবর্ষে উপনীত হয়েছিলেন। এদেশে আসবার আগে তিনি আরব ইরাক ও ইরান ভ্রমণ করেছিলেন। নিশাপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী সাধক ফরিদউদ্দীনের (১১১৮-১২২৯) সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। এদেশে পৌঁছে প্রথমে তিনি মুলতানে অবস্থান করেছিলেন। মুলতানে থাকাকালীন শাহ্ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া ও খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ারের সঙ্গে জালালউদ্দীনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। জাকারিয়া

১১৬৯-১২২৬ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কতবুদ্দীন বখতিয়াররের মৃত্যু হয় ১২৩৫ খ্রীস্টাব্দে।

মুলতান থেকে দিল্লীতে এসেছিলেন তিনি। দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ তাঁকে খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বাগত জানান। ১২১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি লক্ষ্মণাবতীর উদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে রওনা দেন। পথিমধ্যে বদায়ূনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এখানে একটি বালককে তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই বালক আলাউদ্দীন উসুলী বিখ্যাত সূফী সুলতানুল শেখ নিজামউদ্দীনের মুরশিদ হন। বদায়ূনেই এক কুখ্যাত হিন্দু ডাকাতকে তিনি ইসলামে দীক্ষা দেন। ভবিষ্যতে এই ডাকাত ইতিহাসে খাজা আলী নামে বিখ্যাত হয়েছিল।

১২১৩ সালে জালালউদ্দীন লক্ষ্মণাবতীতে এসে পৌঁছেছিলেন। পাণ্ডুয়ায় তিনি তাঁর আস্তানা স্থাপন করে বাংলায় বসবাস শুরু করেন। শেখ জালালউদ্দীন সর্ব আসক্তি মুক্ত ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত জীবন কুরবানি করেন আল্লাহ্‌র খিদমতে ও মানুষের সেবায়। তিনি বলতেন, নারী ও ধর্ম সম্পর্কে আসক্ত মানুষের মঙ্গল হতে পারে না। গুরু শেখ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্দির প্রতি তাঁর সেবা ও ভক্তি ছিল অবিচল। তাঁর সেবায় মুগ্ধ হয়ে মুরশিদ বলেছিলেন শেখ জালাল আমার সবকিছু নিয়ে গেছে। এর দ্বারা শিহাবুদ্দীন বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী হবেন একমাত্র শেখ জালালউদ্দীন। ধ্যানে ও প্রার্থনায় তিনি গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন। তেমনি তন্ময় হয়ে যেতেন আল্লাহ্‌র প্রেমে। মস্ত ও শুদ্ধ হয়ে থাকার জন্য আধ্যাত্মিক চেতনায় তিনি একান্ত আল্লাহ্‌র নূর দেখতে পান। নামগানে তিনি দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিতেন। আল্লাহ্‌র দেখা না পাওয়া পর্যন্ত থামতেন না। পশু আমিত্বকে ঘুচিয়ে যুক্তিবাদী আমিত্বকে ছাড়িয়ে তিনি নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত ও পরিশ্রান্ত আমিত্বে পৌঁছে পরম প্রিয়তমের প্রেম ও প্রসন্নতা লাভ করে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিকতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

বিরাট ব্যক্তিত্ব বিশাল উদার মন ও মানব সেবার মধ্য দিয়ে তিনি নিখিলবঙ্গে এক অলৌকিক কর্মসাধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবহেলিত নির্যাতিত মানুষ তাঁর আহ্বানে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এইভাবে তিনি সমগ্র উত্তর বাংলায় বিরাট এক মুসলমান সমাজের ভিত্তিভূমি রচনা করেন। তাঁর আস্তানা মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর লঙরখানায় অভুক্ত দরিদ্র জনগণ খাদ্য ও শান্তিলাভ করত। ক্রমাগত আধ্যাত্মিক ও মানবিক সেবার দ্বারা তিনি উত্তর বাংলায় মহান এক নৈতিক জীবনের উন্মেষ ঘটান। যারা মুসলমান হয়েছিল শুধু তারাই নয়, হিন্দুরাও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করত। মিলিত হিন্দু মুসলমানের কাছে তিনি ছিলেন এক আদর্শ সাধুপুরুষ। ফলে কালক্রমে তাঁরই কারণে হিন্দু সমাজে সত্যপীরের পূজো প্রবর্তিত হয়ে পড়ে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁর চেষ্টায় উদার ও প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিল। পাণ্ডুয়ায় দেওতলায় সাধকশ্রেষ্ঠ শেখ জালালউদ্দীনের সমাধি এখনো রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে আলাউদ্দীন আলী শাহ্ সমাধির ওপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

শেখ শরফউদ্দীন আবু তওয়ামাহ্

উত্তর বাংলায় যেমন শেখ জালালউদ্দীন, পূর্ব ও উত্তর পূর্ব বাংলায় শেখ শাহ্ জালাল তেমনি মধ্য বাংলায় শেখ শরফউদ্দীন নিজের সাধনা ও চরিত্র বলে এবং বিপুল আধ্যাত্মিক ও সংগঠন শক্তির সাহায্যে ইসলামের পবিত্র বাণীকে প্রচার করেছিলেন। শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরেও তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল।

শেখ শরফউদ্দীন আবু তওয়ামাহ্ ছিলেন একজন বিখ্যাত সুফী সাধক ও মনীষী। সোনারগাঁয়ে তাঁর জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র অবস্থিত

কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। শিষ্যদের জন্য থাকবার জায়গা ও ছাত্রদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করেছিলেন।

দেশ বিদেশ থেকে বহু জ্ঞানসন্ধিৎসু ছাত্র ও সাধক সোনারগাঁওয়ে আসতে থাকে। দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই সোনারগাঁও ধর্ম ও শিক্ষার একটি উজ্জ্বল কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখান থেকেই শেখ আবু তওয়ামাহ্, বিশেষ মাদ্রাসা পূর্ব বাংলায় এবং ভারতের ইসলামের শিক্ষাসাধনা এবং জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে পরিণত বয়সে সোনারগাঁওয়েই দেহরক্ষা করেন। সেখানেই এই সাধক ও মনীষীর সমাধি রক্ষিত হয়।

শেখ শরফউদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরি

মখদুম আল মুল্ক এর পুত্র শরফউদ্দীন। তাঁরা ছিলেন বিহারের অন্তর্গত মানের শহরের অধিবাসী। ১২৬৩ সালে শেখ শরফউদ্দীনের জন্ম হয়। বাল্যকালেই তিনি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় রেখেছিলেন। জ্ঞানলাভের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে এত তীব্র ছিল যে মাত্র পনের বছর বয়সেই তিনি সূফী সাধক ও মনীষী শেখ শরফউদ্দীন আবু তওয়ামাহ্‌র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এবং তাঁর সঙ্গে নিজের জন্মস্থান ছেড়ে সোনারগাঁওয়ে চলে যান। সেখানে পাঠে চিন্তায়, মনন ও অধ্যয়নের মধ্যে তিনি এত তন্ময় হয়ে থাকতেন যে বাড়ির চিঠিপত্র পড়বার কথা ভুলে যেতেন। শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর একদিন তিনি অনেকগুলি না খোলা চিঠি আবিষ্কার করলেন। তার একটি চিঠি খুলে পিতার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলেন। অন্যদের সঙ্গে একত্রে তিনি খেতেন না। এতে সময় বেশি লাগবে, জ্ঞান আহরণে ব্যাঘাত ঘটবে বলে তাঁর মনে এই ভয় ছিল।

একটানা দীর্ঘ পনের বছর তিনি গুরুর কাছে ধর্ম বিজ্ঞান ও

আধ্যাত্মিকতার শিক্ষালাভ করেন। দানের পারদর্শিতায় খুশি হয়ে গুরু নিজের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। এই উপমহাদেশে শরফউদ্দীন ছিলেন আবু তওয়ামাহ্‌র প্রকৃত ভাবশিষ্য। সোনারগাঁও ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। ১২৯৩ খ্রীস্টাব্দে দীর্ঘদিনবাদে গুরুর আশিস্ মাথায় নিয়ে তিনি নিজের জন্মভূমিতে ফিরে এলেন এবং এখানে ইসলাম প্রচার ও শিক্ষাদানের ব্রতে উদ্যোগী হন। সিদ্ধ সুফী সাধক ও মনীষীরূপে তাঁর নাম হিন্দুস্থানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ভারতভূমিতে শিক্ষা ও সুস্থ জ্ঞানে অধিকারীরূপে তিনি অনন্য এক মর্যাদা লাভ করেন। শেখ মানেরি বহু গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। সেইসব গ্রন্থ থেকে জানা যায় তার আধ্যাত্মিকতা কত প্রগাঢ় ছিল। সুফী বিশ্বাস ও সম্ভোগ গূঢ়তত্ত্বকে সহজ সরল ভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। অনুভূতির স্বচ্ছতা মনীষার দীপ্তি ও হৃদয়ের রসগ্রহিতার জন্য আজও তিনি অমর হয়ে আছেন।

শেখ আলী সিরাজউদ্দীন উসমান

বাঙালী সুফীদের বেশির ভাগই ছিলেন চিশতিয়া তরীকার সাধক আর বাংলাদেশে তখন এই তরীকাই ছিল সবচেয়ে উন্নত ও সুসংহত। চিশতী সুফীরা বাংলার দূরতম অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচার করেছিলেন। চরম দুর্দিনে তাঁরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও মুসলিম রাজা ও সমাজকে বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে মুসলিম বাংলার প্রগতি ও উন্নতিকে তারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

চিশতীয়া সুফীরা স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে তাদের বাণী পৌঁছে দিতেন। এর ফলে তাঁদের প্রয়াসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়েছিল। শেখ সিরাজ লক্ষ্মণাবতীতে বাস করতেন। সাধারণ এক খাদেমরূপে প্রবেশ করে তিনি দিল্লীর সুফীশ্রেষ্ঠ শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার প্রীতি প্রশংসায় ধন্য হন। সুলতানুল আউলিয়ার খিরকা লাভ করে তিনি নিজের জন্মভূমি বাংলায় ফিরে এলেন

বাংলায় এসে রাজধানী পাণ্ডুয়াকে নিজের কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিলেন। ধর্মপ্রচার ও আধ্যাত্মিক ভারগ্রহণের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। তাই সুলতানুল আউলিয়ার খিলাফতের যোগ্য হওয়ার জন্য শেখ সিরাজ নিজামউদ্দীনের অন্যতম শিক্ষিত শিষ্য ফখরুদ্দীন জারবাদির কাছে নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন।

বাংলাদেশে তখন অভিজাত শিক্ষক ও সাধক আলা উল হক কায়েমী আসন পেতে বসেছেন। সিরাজ তাঁর মুখোমুখি হতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাই দেখে নিজামউদ্দীন তাঁকে ভরসা দিয়ে বললেন যার মুখোমুখি হতে তুমি ভয় পাচ্ছ, সেই আলা উল হক তোমার শিষ্য হবেন। কালে তাই হয়েছিল শেখ সিরাজের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ ও অভিভূত আলা উল হক তাঁর এক বিশেষ অনুরাগী ভক্তে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

সারা রাজ্যে জনসাধারণ, সুলতান ও সুলতানের বংশধরগণ তার ধর্মপরায়ণতা, জ্ঞান গরিমা এবং মানসিকতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তখন নিজে একটি খানকাহ স্থাপন করেন। দেখতে দেখতে এই খানকাহ ব্যাপক ধর্মীয় ও মানসিক কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিগণিত হয়ে পড়ে।

শেখ নিজামউদ্দীনের কাছ থেকে তিনি যে কটি মূল্যবান পুস্তক লক্ষ্মণাবতীতে নিয়ে আসেন তাই দিয়ে একটি ইসলামী মরমীবাদী গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর লঙরখানায় সব সময় অভুক্ত গরিব জনসাধারণের জন্য খাদ্য মজুত থাকত। মানবপ্রীতি ও কল্যাণ, উদারতা ও ভালবাসা দিয়ে তিনি হিন্দু মুসলমান ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ও ভক্তি আদায় করেছিলেন। ১৩৫৭ সালে এই মনীষী ধরাধাম ত্যাগ করেন।

তাঁর প্রচেষ্টায় পাণ্ডুয়া ভারতে ধর্ম ও সংস্কৃতি জীবনের একটি উল্লেখ যোগ্য কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। দূর দূরান্তে কুতবুল আলমের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সে সব জায়গা থেকে তার কাছে ছাত্ররা ছুটে আসে। মহর্ষি কুতবুলের ভক্ত শিষ্য ও ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন মানিকপুরের (মধ্যপ্রদেশ) হুসামুদ্দীন (মৃত্যু ১৩৭৭), লাহোরের শেখ কাকু (মৃত্যু ১৩৭৬) ও আজমীর শরীফের শামসউদ্দীন (মৃত্যু ১৪৭৬)।

সূফী কুতবুল আলম ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ (একত্বের মূলতত্ত্ব) সম্বন্ধে শিষ্য ও ভক্তদের চিঠি লিখতেন। এই সব চিঠিতে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং উপলব্ধির গভীরতা বুঝতে পারা যায়। কুতবুল আলমের পরিচালনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় একটা মহাবিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং একটি লঙরখানা পরিচালিত হত। সুলতান হুসাইন শাহ্ বহু নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। রাজনীতিতেও তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার মুসলমানদের তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন কল্যাণ ও সততার পতাকাতলে। ১৪৪৭ সালে ফকীর নূর কুতবুল আলম এন্তেকাল করেন। পিতার সমাধি পাশে পাণ্ডুয়াতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

মীর সঈদ আশরফ জাহাঙ্গীর সিমমানী

মীর জাহাঙ্গীর সিমমানীও ছিলেন বাংলার একজন কৃতী সূফী সাধক। রাজবংশে তাঁরও জন্ম হয়েছিল। যৌবনকালে সিংহাসন অর্থ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে ত্যাগ করে তিনি সাধকের সরল নির্লিপ্ত জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন। সংসার ছেড়ে তিনি দিল্লীতে কিছুকাল ছিলেন। সেখান থেকে শরফ্‌উদ্দীন ইয়াহ ইয়ার শিষ্য হবার জন্য বিহারে যান। কিন্তু মীর জাহাঙ্গীর সেখানে পৌঁছনোর আগেই শেখ মখদুম দেহত্যাগ করেন। শেখ মখদুম সূফী সাধনা

সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ কয়েকখানা বই লিখে রেখে যান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি আযীবা ইরশা দূত তালিবীন, মা আদম উলমা আলী।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে জাহাঙ্গীর মানেরি থেকে বাংলায় ফিরলেন। তখন আলা-উল-হক সাধক হিসেবে খুবই নাম করেছেন। মীর জাহাঙ্গীর তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এঁর কাছে তিনি আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। বিশেষ পারদর্শিতায় শিক্ষা সমাপ্ত করে পায়ে হেঁটে তিনি পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। গুরুর হাতে খিরকাহ্ ও তাঁর খিলাফত লাভের পর তিনি জৌনপুরে একটি খানকাহ্ স্থাপন করেন। মীর আসরফ জাহাঙ্গীর বঙ্গদেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক রূপ বৈচিত্র্য তাঁকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে তোলে। বাংলার এই অনায়াস সৌন্দর্য ও অবারিত শস্যশ্যামলা প্রান্তর নির্জন নদীতীর সূফী সাধনা ও ভাব তন্ময়তার খুবই অনুকূল ক্ষেত্র বলে মীর জাহাঙ্গীর মনে করতেন। এই কারণে বাংলায় এমন বিপুল সংখ্যক সূফী সাধক ও সাধু সন্তদের আবাসস্থল হয়েছে। দূর দূর থেকে বাগদাদ, খুরাসান, মক্কা, ইয়ামন ছাড়া ভারতের নানা প্রদেশ থেকে সাধকরা বাংলায় এসেছেন। বাংলার কোমল প্রকৃতির মধ্যে থেকে তাঁদের হৃদয় উদার হয়েছে। শস্যশ্যামলা বাংলা তাঁদের মনের কাঠিন্যকে সরিয়ে দিয়ে মমত্বকে বিস্তারিত করেছে। তাঁরা এই বাংলার বুকে আরো মহান হয়েছেন।

বাগদাদের এক শাহ্ জাদা সংসার ত্যাগ করে বহু দেশ বিদেশ ঘুরে ঢাকায় আসেন। এবং ঢাকার দশ মাইল দূরে মুরাদ্‌নগরপুরে তাঁর সাধকজীবন শুরু করেছিলেন। এখানে এখনো তাঁর সমাধি দেখতে পাওয়া যায়। শাহ্ আলী বাগদাদী নামে আরো একজন বাগদাদবাসী ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ঢাকা শহরের উত্তরে মীরপুরে তাঁর মাজার শরীফ রয়েছে। যেখানে আজও বহু ভক্তজনের ভিড় হয়।

বাংলার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বহিরাগত সাধকরা এই

জায়গাকেই তাঁদের সাধনার উপযুক্ত স্থান মনে করেছিলেন। এখানে বর্ণসুষমা, শান্তি আর খুশির মধ্যে তাঁরা সৃষ্টিকারী মহাশিল্পীর মহিমাকে যেন খুব সহজেই অন্তরে অনুভব করতেন। পরিবর্তে তাঁর করুণা ও দাক্ষিণ্য পেয়ে সাধকজীবন ধন্য করতেন। পবিত্র কোরান শরীফের 'রহমতি ওয়াসিয়াত কুল্লা শাইইন'—তাঁর রহমৎ সমস্ত জগৎ পরিবৃত ও পরিধৃত করে আছে। বাংলার বুকে যেন এই রহমতের ব্যাপ্তিকে অতি সহজে বোঝা যায়।

কোরান শরীফে হজ জাকাত নামাজ রোজা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর মাত্র আড়াইশো আয়াত প্রকাশিত। কিন্তু প্রকৃতি অর্থাৎ দৃশ্যময় সুন্দর বিশ্বসুষমার পটভূমির ওপর আল্লাহ্‌র যেসব বাণী প্রকাশ পেয়েছে, এবং এই প্রকৃতির অর্থকে একটু একটু করে উন্মোচন করেছে সে রকম আয়াতের সংখ্যা সাড়ে নশো। এ থেকে স্পষ্ট আল্লাহ্‌ মানব দৃষ্টিকে বেশি করে প্রকৃতিমুখী করতে চেয়েছেন। হয় তো এর কারণ প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে তাঁর মহিমা বিস্ময়কর সৃজন ক্ষমতাকে সম্যক বোঝা যাবে। সেই সঙ্গে অন্তরের গভীরে তাঁর রসময় বোধের উপলব্ধি অহর্নিশ অনুরণিত হতে থাকবে।

হয়তো এই কারণেই বহিরাগত বহু সূফী বাংলাকে ভাল বেসেছিলেন। বাংলার বুকে পা দিয়ে আর ফিরে যাননি নিজেদের জন্মভূমিতে। শীত হেমন্ত বর্ষায় রূপসী বাংলা তাঁদের চোখে বিভিন্ন ভাব তরঙ্গে আল্লাহ্‌র মহিমাকে কীর্তিত করেছে।

এমন একটা ঘটনার কথা শোনা যায়। একদিন হঠাৎ মেঘের বর্ষণ শুরু হল। বর্ষার ঘনঘটা। পৃথিবী স্নাত হতে লাগল। নবীজী তার পবিত্র সুন্দর গায়ের চাদর খুলে আল্লাহ্‌র করুণাধারাকে সমস্ত দেহমন দিয়ে উপভোগ করলেন। সর্বাঙ্গ তাঁর ভিজে গেল বৃষ্টির জলে। তাই দেখে একজন সাহাবী বললেন, আপনি যে একেবারে ভিজে গেছেন। উত্তরে নবীজী বললেন, ঠিক বলেছ, এ মেঘ যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এবং এর বর্ষণ যে তারই করুণাধারা। এতে সিক্ত হয়ে আমি যে ধন্য হলাম।

সূফী সাধকরা ছিলেন একান্তভাবে নবীজীর অনুগামী। তাই তাঁরাও নবীজীর মতো প্রকৃতির প্রসন্নতাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপভোগ করতেন। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যকে ভালবাসতেন।

পীর বদরউদ্দীন বদর ই আলম

প্রাচীনবঙ্গের বহু জায়গা পীর বদরের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। এইসব জায়গায় পীর বদরের দরগার ভেতর দিয়ে তাঁর স্মৃতি বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। কোনো এক কিংবদন্তী অনুসারে তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডে চেপে চট্টগ্রামে আসেন এবং অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সেখান থেকে অশুভ শক্তির প্রভাবকে দূর করেন। স্থানীয় উপভাষায় প্রদীপকে চাটি বলে। কারো কারো ধারণা বদর শার চাটি শব্দ থেকেই চাটি গাহ অর্থাৎ প্রদীপের স্থান এই নামের উৎপত্তি হয়েছে। তার থেকে পরিবর্তিত হয়ে কোনো সময়ে চট্টগ্রাম নামটি চালু হয়। বদর শা চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। তিনি এই অঞ্চলে এত খ্যাতি লাভ করেছিলেন যে তাঁর সমাধি মন্দিরটি বিভিন্ন নামে পরিচিত এখানকার জনসাধারণের কাছে। যেমন বদর-ই-আলমের দরগাহ্, বদর মুকাম, বদর পীর, বদর আউলিয়া, বদর শাহ্, পীর বদর প্রভৃতি। শুধু চট্টগ্রাম নয়, বদর শাহের নাম বহুদূর ছড়িয়ে ছিল সেখানে। বর্ধমানের কালনাতে তাঁর নামে একটি দরগাহ্ আছে। দরগাহ্ রয়েছে দিনাজপুরের হেমতাবাদে। ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্যই তিনি অবিভক্ত বঙ্গে এসেছিলেন। তখনকার মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন ধর্মীয় পতাকাতলে। বাংলার বাইরে বিহার শরীফেও তাঁর নামে একটি দরগাহ্ রয়েছে।

১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান। অনেকে বলেন মখদুম শরফ-উদ্দীন তাঁকে বিহারে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই আমন্ত্রণ মতো তিনি বিহারে পৌঁছেছিলেন। যদিও তাঁর সঙ্গে শরফ-

উদ্দীনের দেখা হয়নি। কারণ তিনি পৌঁছবার চল্লিশ দিন আগে শরফ্‌-উদ্দীন লোকান্তরিত হন। এই ঘটনা থেকে মনে হয় এই দুই সাধক ও মনীষী একই সময়ে ধর্মপ্রচার ও সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর সাধকজীবনের বেশির ভাগ সময়ই চট্টগ্রামে কাটে। বদর শাহ্‌ বা পীর বদর এই নামটি এক সময় বঙ্গ-আসামে প্রচণ্ড জনপ্রিয় ছিল। ষষ্ঠদশ শতকের কবি দৌলত উজীর বাহরাম বলেছেন, শাহ্‌ বদর চট্টগ্রামেই সমাধিস্থ হন। আজও দক্ষিণ বাংলার মাঝিরা দুরন্ত নদী বা সাগরে পাড়ি জমাবার আগে এই সাধকের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে নেয়। এ থেকেই বোঝা যায় তাঁর নামের প্রতি কি প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল সেকালের মানুষের। সাধারণ মানুষের মনকে তিনি কতখানি জয় করেছিলেন!

পীর শাহ্‌ দৌলা

শাহ্‌ মুয়ায্‌যাম দানিশ মন্দ শাহদৌলা পীর নামেই বেশি পরিচিত। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী তিনি বিখ্যাত আব্বাসীয় খলিফা হারুন-উর-রসীদ-এর বংশধর। সুদূর বাগদাদ থেকে তিনি হিন্দুস্থানের বাংলাদেশে এসেছিলেন। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার বাঘা নামক স্থানে দৌলা পীর তাঁর আস্তানা পাতলেন। যখন তিনি এদেশে আসেন তখন বাংলার গদিতে নসরৎ শাহ্‌ রাজত্ব করছিলেন (১৫১৯-৩২)। শাহ্‌ দৌলা পীরের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সুলতান নসরৎ শাহ্‌ তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বহু লাখেরাজ জমি তোহফা স্বরূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দৌলা শা এই উপহার গ্রহণে অসম্মত হন। পরে অবশ্য পীরের পুত্র শাহ্‌ সূফী হামিদ দানিশমন্দকে এই নিষ্কর জমির স্বত্ব দেওয়া হয়। বাঘায় শাহ্‌ দৌলা পীর একটি খানকাহ্‌ ও মাদ্রাসা তৈরি করিয়েছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতার জোর ও শিক্ষাদানের সহজ সুন্দর রীতির ফলে অল্পকালেই বাঘা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে

পরিণত হয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে বাঘার খ্যাতি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর পৌত্র পীর আবদুল ওয়াহ্হাবকে মুঘল সম্রাট শাহ্জাহান নিজে ভূমি দান করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত বাঘা একটি উন্নত ফারসী শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। তখনকার সরকার ও জনগণ এই প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছিল।

খান জাহান

খান জাহান খান সাধারণভাবে খান জাহান আলী নামেই প্রসিদ্ধ হন। বঙ্গ-আসামের মুসলমানদের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছিলেন। দক্ষিণ বাংলার দুর্গম ও জনবিরল অঞ্চল (এখনকার খুলনা জেলায়) অনাবাদী জমিতে মানুষ দিয়ে চাষ শুরু করেন। জনহীন ভূমিতে লোকবসতি বড়ে ওঠে। শেষ জীবনে ধর্মপ্রচারই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমায় তার সমাধি এখনও ভক্তজনের তীর্থরূপে বিরাজিত। ১৪৫৮-৫৯ খ্রীস্টাব্দে খান জাহানের পরম অনুরক্ত ভক্ত শিষ্য মোহাম্মদ জাহির সমাধি সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন। মোহাম্মদ জাহির পীর আলী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। খান জাহানের কাছেই ধর্মান্তরিত হয়ে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পীর খান জাহান সিদ্ধ সাধক হিসেবে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সকলেরই পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আজও তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকীতে সমবেত মানুষরা তাঁকে ভক্তিভরে স্মরণ করে। প্রতি বছর চৈত্র পূর্ণিমায় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁর রওজা শরীফে শত শত ধর্মপ্রাণ ভক্ত হাজির হয়ে তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাঁর স্মরণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের জন্ম ও পবিত্র করে তোলে।

শাহ্ ইসমাইল গাজী

শাহ ইসমাইল গাজীও আসাম ও বঙ্গে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে ত্বরান্বিত করতে পেরেছিলেন তাঁর আদর্শ ও মহত্ত্ব দিয়ে। এদেশের মুসলমানরা আজও তাই তাঁর কাছে ঋণী বলে নিজেদের মনে করে।

বংশমর্যাদায় তাঁর আসন পাতা ছিল খুবই উঁচুতে। মক্কার হজরত পরিবারে এই সাধক জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থেকেই ধর্মের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। অল্পবয়সেই ইসলামের প্রচার ও তার প্রকৃত শিক্ষাদানের কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। শুধু শুকনো নিয়োজন নয়, নিবেদন। নিজেকে কুরবান করে ইসলামকে জগতের প্রতি কোণে প্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা তিনি অন্তর থেকেই লাভ করেন।

এই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে একদিন তিনি জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে নানাবিধ কষ্টের মধ্যে দিয়ে অনুচরসহ দীর্ঘপথ ভ্রমণের পর লখনাবতিতে পৌঁছেছিলেন। তখন বাংলার মসনদে সুলতান ছিলেন রুকনুদ্দীন বরবক শাহ্ (১৪৫৯-১৪৭৪)। সেই সময়ে গৌড় ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বন্যা দেখা দিয়েছিল। সুলতান বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গৌড়ে এসে হাজির। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বন্যা রোধের উপায় ভেবে ভেবে। সেচ বিভাগের বাস্তুকারগণ ব্যর্থ হলে শাহ্ সাহেব নদীর উপর একটা সেতু নির্মাণের পরামর্শ দিলেন। এই সময় তিনিও গৌড়ে পৌঁছেছিলেন। সেতুটি নির্মিত হলে বন্যার হাত থেকে গৌড় রক্ষা পায়। এই ঘটনায় খুশি হয়ে সুলতান সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গাজী উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সৈন্যবিভাগে শাহ্ ইসমাইলকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

শাহ্ ইসমাইল সাধক হলেও রাজনীতি ও রণনীতিতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় ও বুদ্ধিবলে সুলতানের রাজত্ব ওড়িশা ও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বাংলার ইতিহাসে তিনি নিজের স্থান

করে নেন এইভাবে। ১৪৭৪ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দ্বিখণ্ডিত দেহের দুটি ভাগ দুই স্থানে আলাদাভাবে সমাধিস্থ হয়। এই দুটি স্থান হল রংপুরের কান্তদুয়ার ও মান্দারণ।

বাংলাদেশে সূফী সাধনার ধারা সে যুগ থেকে একাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে। বর্তমানের বস্তুবাদী জগতে বস্তুর চমৎকারিত্বে ও মোহে সাধারণ মানুষ আকর্ষিত হয়ে সাধকদের কথা ভুলতে বসেছে। মানুষ তার ভেতরের শক্তি না খুঁজে বাইরের বিলাসে গা ঢেলে সুখী হয়ে পড়ছে। কিন্তু সে সুখ যে ক্ষণিক, আসল সুখ বাইরের আয়োজনে নয়, অন্তরের প্রয়োজনে, একথা অনেকেরই মনে পড়ে না। চলমান সুখের জ্বালা, বেদনা, হতাশাকে তাই ঢাকতে মানুষ চরম নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সমস্ত পৃথিবীতে আজ তাই ঘুমপাড়ানী ওষুধের সাম্রাজ্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় শক্তি যে সূফী তত্ত্ব অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রেম সাধনা সে কথা ভাবতে বা সেই কথায় নির্ভর করতে আজকের মানুষ ভয় পায়। তাই সূফী সাধনার দ্বারাই এই বিশ্বাস ও সামর্থ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এক সময়ের অরাজক বাংলায় শাহ্‌ ইসমাইলের মতো সাধকরা মানুষের মনকে ভয়মুক্ত করে শান্তির ললিতবাণী শুনিয়েছিলেন। তাই তাঁদের মহৎ আদর্শ নিবেদন ও নিষ্কাম কর্মের অনুসরণের মধ্যে দিয়ে আবার তা ফিরে আসবে। শাহ্‌ ইসমাইল শাহী আজ নেই, কিন্তু মুসলিম সমাজে তিনি বেঁচে আছেন একটি অনন্য নামরূপে।

সূফী আহম্মদ হোসেন

১৮১২ সালে কলকাতা মহানগরীতে মুসলমান পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হল। যে শিশু মায়ের কোল থেকেই সাধুপুরুষরূপে পরিচিত হয়ে পড়লেন। তখন ইংরেজ আমল চলছে জোর কদমে। দেশে মোটামুটি বস্তুবাদের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। ধর্মের ক্ষীণ

গোঁড়ামি হয়ে আসছে বিজ্ঞানের বিশ্বাসের কাছে। তারই মধ্যে নতুন একটি প্রাণ জন্মলাভ করে এই শহরের মাটিকে করেছিলেন ধন্য ও পবিত্র। মহানগরীর অগণিত মানুষকে দান করেছিলেন সুন্দর জীবন-লাভের অপূর্ব পাথেয়।

এই অলি বা মহাপুরুষ ভূমিষ্ঠ হন ৬০ নং কড়েয়া রোডের বাড়িতে। মাত্র পাঁচদিন মাতৃসঙ্গ পান তিনি। জন্মের ষষ্ঠদিনে তাঁর মা দেহান্তরিত হন। বাবা পুত্রের নাম রাখলেন আহম্মদ হোসেন। মহানগরীর বুকে মাতৃহীন শিশু আপন খেয়ালে বড় হতে থাকেন। ছোট থেকেই সংসারের প্রতি তাঁর অনাসক্তি দেখা যায়। একদিন বাবার বকুনি শুনে আহম্মদ চার দেওয়ালের বন্দীত্ব ঘুচিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন। কোনো ভয়ভীতি নেই, জীবনের তাপ উত্তাপ নেই। সাধু-ফকীরদের সঙ্গে থাকেন, মাঝে মাঝে কবরস্থানে রাত কাটান—কুকুরের সঙ্গে ভাগ করে ডাস্টবিনের ময়লা বেছে খান। এভাবেই দীর্ঘদিন তার কাটল। শৈশব মুছে গিয়ে তাঁর শরীরে পরিণত কৈশোর এল। কিন্তু মনের মধ্যে ভাবের উদয় হল যেন সাত সাগর ভেদ করে। তিনি সাধনকর্মে ঝুঁকে পড়লেন।

একজন ফকীরের কথায় আহম্মদ কিছুদিন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাধনা করতে লাগলেন। এরপরই তিনি নিজে থেকেই পূর্ণ দৃষ্টিলাভ করলেন। দেহমনের মধ্যে অস্বাভাবিক একটা কিছুর উপস্থিতি তিনি যেন টের পেতে লাগলেন। একটা ঘোরের ভিতর দিয়ে দিন কেটে চলল। আহম্মদের পিতা বহু চেষ্টা করেও তাঁকে ঘরে আর ফেরাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে বিষণ্ণ মনে ছেলেকে আল্লাহ্‌র কাছেই সঁপে দিলেন। কিছুদিন বাদে ঘাসীর দাতার আশ্রয় গ্রহণ করলেন তিনি। তাঁর মতো তরুণ শিষ্য পেয়ে ঘাসীর দাতা খুবই খুশি হলেন। এক ফকীর দায়িত্ব নিলেন আর এক ফকীরের। এক মনে আহম্মদ হোসেন গুরুর সেবা করে কোরান শরীফের সারবস্তু গ্রহণ করলেন। সামান্য সময়ের মধ্যে গুরুর যোগ্য শিষ্যরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আহম্মদ হোসেন বড় হলেন। পূর্ণ যুবক অবস্থায় অসীম শক্তির অধিকারী হলেন তিনি। কোনো একদিন অন্যমনস্ক অবস্থায় তিনি হঠাৎ বলে ফেলেন, 'যদি আমি চাই তো পৃথিবীকে মহাকাশে তুলে দিতে পারি, আকাশকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে পারি।' যদিও সেই শক্তিকে তিনি কখনো ব্যবহার করেননি। মাঝে মাঝে উপস্থিত ভক্তদের বলতেন, বল কোথায় তোদের গড ঈশ্বর বা খোদা? ব্যাস তারপরই চুপ হয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। এ হল ভাব সমাধি। একমাত্র মহান সাধকদেরই এমন হতে পারে। বহু সময় স্থির হয়ে কেটে যেত। তারপর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আবার ফিরে আসতেন জীবনে। আবার সহজ হয়ে পড়তেন। ভাবের বহিঃপ্রকাশকে তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না।

সাধকদের স্বভাব সাধারণ থেকে ভিন্ন। তাঁরা অফুরন্ত শক্তির অধিকারী হয়েও মহাপ্রকৃতিকে প্রণাম করেন। ব্যক্তিস্বার্থ আর আত্মসুখ দুইই এদের কামনার বাইরে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য বিশ্ব-কল্যাণ। সকলের সমান অধিকার। এঁরা শূন্যতাকে পূর্ণ করেন। জাতিধর্ম পাপপুণ্যের বিচার নিয়ে সাধকরা মাথা ঘামান না। তাঁরা মুক্ত পুরুষ। ছোট বড় এই জ্ঞান তাঁদের নেই, একমাত্র ভক্তজন দেখলেই সেখানে তাঁদের সাধনালব্ধ সার্থকতাকে উজাড় করে ঢেলে দেন।

আহম্মদ হোসেনের পুঁথিগত শিক্ষার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু সকল শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হতে লাগল খুবই স্বাভাবিক ভাবে। তিনি আগত ভক্তদের উদ্দেশ্য করে মাঝে মাঝে বলতেন, আরে জলদি জলদি এস, জান না কি তোমাদের ভাগীদার অনেক। যিনি হাতে অস্ত্র নিয়ে ঘোরেন স্বভাবত তিনি নিজেকে খুবই সংহত করে রাখেন, সেই রকম অসীম ক্ষমতার অধিকারী এই সাধক নিজেকে সংযত করে রেখেছিলেন। সামান্য এক ভিখিরির মতো মলিন পোশাক পরে তিনি বসে থাকতেন। তাঁর পোশাকের রঙ ছিল কালো। কালো লুঙ্গি, কালো পাঞ্জাবি। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। হাতের আঙুলে নানা ধাতুর নানা ধরনের আংটি। আংটি ছাড়া লোহার বালা তামার

অনন্ত, গলায় নানা রকমের মালা। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর, সুঠাম, দীর্ঘ ঋজু, আজানুলম্বিত বাহু। নানাজনের চোখে তিনি নানাভাবে ধরা পড়তেন। কেউ তাঁকে কাল বলত, কেউ তাঁকে ফর্সা বলে ভুল করত, আবার কেউ স্ত্রীলোকও ভাবত। বহু জনই তাঁর ধাঁধালাগানো চেহারা দেখে বিস্ময় বোধ করত। নিজের রূপের প্রতি আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন, বাজারের মাঝখানে নিরঙ্কুশরূপে বসে রইলাম, কেউ আমাকে চিনল না।

কেউ কেউ বলে দীর্ঘ একটানা চব্বিশ বছর স্নান না করে, না খেয়ে এক জামাকাপড়ে আনন্দিত মনে এই শহরের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাকে তিনি উপভোগ করেছেন। সারা জীবন ভিক্ষে করে পরের মুখে অন্নদান করলেন তিনি। উনি যেখানে বসে সাধনা করতেন সে স্থানও ছিল অদ্ভুত। পার্ক সার্কাস কড়েয়া রোডের মোড়ে ছিল একটা ঘুরনি গাছ, ফুটপাথের সামনে টিউবওয়েল, উল্টোফুটে সিনেমা। আহম্মদ হোসেন যেখানে বসতেন তাঁর পেছনে ছিল একটা মোটর কারখানা, দেয়ালের গায়ে নম্বর লেখা, ৬৪ কড়েয়া রোড। হাইড্রেনের ওপর চট পেতে পেছনের গ্যাসপোস্টে হেলান দিয়ে বসতেন তিনি। সব সময়ই একটা জনতা হাজির থাকত তাঁর কাছে। স্বভাবতই তারা দরিদ্রশ্রেণীর। একটু রাত বেশি হলে দুচারখানা গাড়িও এসে দাঁড়াত। সবাই যে যার সংসারের ঝুট ঝামেলার খবর নিয়ে আসত। নীরবে এই সাধক নানা জনের নানা আবদার সহ্য করতেন। কেউ রেসের মাঠের ঘোড়ার টিপ চাইত। তাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'বেশ তোমাদের তাই দেব, তবে মাথা খাটিয়ে বুঝে নিতে হবে।' কাছেই বাবুগোছের কাউকে দেখে বলতেন, দাও তো বাবু তিন আনা, কাউকে ভিড়ের ভেতর থেকেই আদেশ করতেন তিন পয়সার সিগারেট নিয়ে আসার জন্য। সেইসঙ্গে তিন পয়সার দেশলাই, তিন পয়সার পান। দুপয়সা ফিরে আসবে। জুয়াড়ী যারা দাঁড়িয়ে থাকত তারা কথার ইঙ্গিত ধরে ফেলত। সত্যিই তো উনি টিপ বলে দিলেন। তিনটে জিনিস মানে তিন নম্বর বাজি। ৩ + ৩ + ৩ = ৯ নম্বরের ঘোড়া।

এই রকম অদ্ভুত হিসেব। ওই যে ফেরতের নম্বর, ওটা বাজি থেকে বাদ যাবে না। ঘোড়ার নম্বর থেকে বাদ যাবে এর স্পষ্ট উল্লেখ থাকত না। যারা বরাবর ওঁর কাছে যাতায়াত করত, যাদের রেসের মোহ একেবারে নেই তারা কিন্তু দুইয়ের মহিমা কি বুঝে ফেলত। আবার কোনো কোনো লোককে বলতেন, তুমি রেস খেল না বাবা, দুচারজন লোক তোমার কাছে করে খাচ্ছে, রেসে টাকা নষ্ট করলে লোকগুলোর অন্ন উঠে যাবে।

শনিবার দিন ভিড় হত খুব। জুয়াড়ীদের ভিড়। মাঝে মাঝে লাল কাচ ও সবুজ কাচ দু রকমের চুড়ি বার করে জুয়াড়ীদের দেখাতেন। এই চুড়ি দেখালেই হার। সবাই রেগে টং হয়ে যেত। তিনি চুড়ি দেখিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিতেন, আজ যেও না অনিবার্য হার।

সবাই রেগে উঠত টং হয়ে। কিন্তু তাঁর কথা অমান্য করার ক্ষমতা নেই কারো। দু একজন বাবুগোছের লোক বাবা আপনার কাছে আর আসব না বলে রেগে উঠে যেত। পরের দিন কিন্তু তারা ঠিক আবার এসে হাজির। বাবা তাদের ভালবেসে বলতেন, নাও বাবু এক কাপ চা খাও।

আহম্মদ হোসেনের চোখ দুটো জ্বলত জোরালো ইলেকট্রিক বাল্ব-এর মতো। কখনো তাঁর চোখ দুটো খুব স্নিগ্ধ হয়ে উঠত, সেই সঙ্গে ছোট মনে হত এ চোখ অন্য কারো বুঝি বা। হঠাৎ এক ভদ্রলোক হয়তো এসে বলতেন, বাবা, বিয়ে করেছি অনেকদিন হল, বাচ্চাকাচ্চা নেই, বলো বাবা সংসারে একটা সন্তান না থাকলে মন কি ভাল থাকে ? তুমি একটা ব্যবস্থা করো। শুনে হেসে বলতেন, এ আর এমন কথা কি ? তোমার ক ডজন বাচ্চা চাই ?

ডজন চাই না। একটাই আমার যথেষ্ট।

সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন কাউকে, যাও হে মল্লিক বাজার থেকে একটা পুতুল কিনে নিয়ে এস। ভক্তটি সত্যিই পুতুল কিনে আনল। আহম্মদ হোসেন তার ডাঁই করা জিনিসের মধ্যে থেকে একটা পুতুলের ছোট খাট বের করলেন। পুতুলটিকে আদর করে একটা

কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢেকে একটা সুতোর মালা পরিয়ে খাটে শুইয়ে দিলেন। চারপাশের সবাই হেসে বলে উঠল, বাবু, আপনার বাচ্চা খুব সুন্দর হবে—বাবা যে পুতুলের গলায় মালা দেন, সে পুতুল বাবুদের বাড়িতে খুব সুন্দর মানুষ হয়ে জন্ম নেয়।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে মিষ্টির ঠোঙা নিয়ে বাবু হাজির। মিষ্টি নামিয়ে প্রণাম জানিয়ে বললেন, বাবা, আপনার আশীর্বাদে আমার খুব সুন্দর একটা ছেলে হয়েছে। আহম্মদ হোসেন কোনো উত্তর দিলেন না। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নিজের মনে হাসলেন।

যেখানে আহম্মদ হোসেন বসে থাকতেন তাঁর সামনে থাকত যত ছেঁড়া ন্যাকড়া, খড়কুটো, পঁচা পুরনো যতসব ঠোঙা, কাগজ পাথর ইটের টুকরো এইসব। তাই দেখে একদিন একজন বাবু বললেন, বাবা আপনি এত বাজে জঞ্জাল নিয়ে বসে থাকেন কেন?

উত্তরে তিনি বললেন, তুমি বলছ কি? ওই তো আমার সংসার। তোমাদের সংসারে যেমন নানারকম আসবাব জিনিস আছে, এত তেমনি আমার সবকিছু।

লোকে বলত, যদি চিমটি কেটে এখান থেকে কেউ একটু মাটি নিয়ে যায় তো বাবা ঠিক বুঝতে পারছেন। কথাটা শুনে এর সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্য একদিন এক ভদ্রলোক একটা দেশলাইর কাঠি পকেটে পুরেছিলেন। বাবা সেদিন তাঁকে কিছুই বলেন নি। পরের দিন সে আসতেই বাবা বলে উঠলেন, বাবু, তুমি আমার লাখ টাকার মালমশলা কেন চুরি করে পকেটে পুরলে? ভদ্রলোক হেসে উত্তর দিল, একটা তো সামান্য দেশলাইর কাঠি, তাই আপনার কাছে লক্ষ টাকার মালমশলা।

তোমার কাছে ওটা সামান্য কাঠি কিন্তু আমার কাছে রত্ন।

সবার কাছে অপদস্থ হলেন ভদ্রলোক। যাঁরা প্রতিদিন আসে সবাই গোল হয়ে বসে আছে। হঠাৎ ফকীর বাবা বড় বড় চোখ দুটো আরো বড় করে একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, শালা, কোত্থেকে এসেছিস, পালা এখান থেকে নইলে মারব এক ডাণ্ডা।

যাকে কথাটা বললেন তার মুখ তো চুন। অথচ কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস নেই, তিনি নির্দোষী ভালমানুষ, সঙ্গে সঙ্গে পাশের একজনের ওপর প্রতিক্রিয়া শুরু হল। সে সুড়সুড় করে উঠে পড়ল। বাবা যাকে শাসন করবেন বা ধমকাবেন তার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতেন না—পাশ্ববর্তী মানুষকে উদ্দেশ্য করেই ক্ষেপে যেতেন। অনেক সময় তাঁকে সাধকের পরিবর্তে পাগল মনে হত। তিনি চোখে নিজের হাতে তৈরি অদ্ভুত গগলস লাগাতেন। তার একটার কাচ সবুজ, অপরটির কাচ নীল। ফ্রেমের গায়ে ছোট ছোট লোহার আংটির মতো রিঙ। মেয়েদের মাথায় চুলের পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহৃত টাসেলের সুতো ও তামার তার জড়িয়ে জড়িয়ে অসম্ভব ভারী হয়েছিল। ওটা নাকের ডগায় রেখে কখনো দেখতেন, কখনো ওর আড়ালে চোখ ঢাকতেন। কোমরে চওড়া মিলিটারী বেল্ট। তাঁর এইসব সাজসজ্জা মোটেই সাধক জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না তবু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি, আর সেই ক্ষমতা দিয়ে বহু লোকের জীবন রক্ষা করেছেন।

রাস্তা দিয়ে একদিন হনহন করে সুট পরা একজন লোক চলেছে। হঠাৎ ফকীর বাবা তাকে ডাকলেন, বাবু দাঁড়াও। বাবুটি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। শব্দ লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখলেন আধ পাগলা এক মানুষ দুনিয়ার আবর্জনা নিয়ে বসে আছে। বাবুটি বিরক্ত হয়ে কথা না বলেই আবার যাবার জন্য যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল, খবরদার।

এবার ভদ্রলোক ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি আবার ফিরে তাকান। ফকীর বাবার চোখ তখন লাল। তিনি একটা টিন দেখিয়ে লোকটিকে হুকুম করলেন, এই টিনটায় জল ভরে মাটির এই জায়গাটায় ঢাল। ভদ্রলোক মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আমার দেরি হয়ে যাবে যে, অফিস যাচ্ছি।

ওজর টিকল না। আরো উত্তপ্ত স্বর ধ্বনিত হল, যা বলছি তা করো। বাধ্য হয়ে ভদ্রলোক জল ঢেলে চলে গেলেন। কেন কি এসব জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই, জিজ্ঞেস করে লাভও নেই। প্রায় সময়ই

তাঁর উত্তরগুলো এমন মজার হত যে প্রশ্নকারী বেকায়দায় পড়ে যেত। ওর পাশে বসা মানুষগুলো নিজেদের ধন্য ভাবত। তারা জানত এই পবিত্র মানুষটির সান্নিধ্যে তারাও পবিত্র হয়ে উঠছে।

একবার এক ধনী ব্যক্তি তার পাড়ার সুশ্রী কোনো মেয়েকে লাভ করবার জন্য বাবার কাছে এসে ধরনা দিল। বাবা ওকে বললেন, টাকাকড়ি সঙ্গে আছে? লোকটা হ্যাঁ বলতেই তিনি বললেন, দশটা টাকা দাও—সোজা ধনী লোকটার সামনে হাত পাতলেন আহম্মদ হোসেন। লোকটা টাকা দিল। টাকাটা হাতে নিয়ে বাবা বসেই রইলেন। বেশ খানিকটা বাদে ধনী ব্যক্তিটি যেই কথা বলবার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আহম্মদ হোসেন বলে উঠলেন, কি বাবা, বিয়ে করেও শখ মেটেনি এখনো মেয়ে ফাঁসানোর ধান্দা—পকেট থেকে টাকাটা বার করে ফেরত দিয়ে দিলেন, এই নাও তোমার টাকা, আর খবরদার আমার কাছে আসবে না। লোকটি অপমানিত হয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল।

সাধারণ মানুষ অমিত শক্তিধারী এইসব অসাধারণ মানুষের কাছে ভুল কামনা নিয়ে অনেক সময় চলে আসে। এই লোকটাই যদি তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর কাছে বলতেন মনের আর চোখের একটা ব্যবস্থা করে দাও। এরকম আবেদন জানালে, হয়তো তাতে পরে সে কিছু পেতেও পারত। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাঁর প্রেরিত ব্যক্তির মারফত নানা ঘটনা ঘটাতে পারেন। লোকটির অসঙ্গত কামনা বা মনের পাপকে বাবা পান করে ফকীর বাবা কুমারী মেয়েটিকে অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা করলেন।

লোকটি যেরকম মোহগ্রস্ত হয়েছিল তাতে পয়সা খরচ করে সে দলবলসহ মেয়েটিকে হরণ করতে পারত। ফকীর ধনী ব্যক্তির অবৈধ শক্তিকে হরণ করে নিলেন ওই দশটা টাকার মধ্যে দিয়ে। হাত পেতে দশ টাকা নেওয়ার কারণ আর কিছুই না। ফিরিয়ে দেবার সময় নিজের বুক পকেটের বৈধ টাকা ফেরত দিলেন। এ এক অন্য ধরনের ভালবাসা। বোঝা যায় না এইসব সিদ্ধ পুরুষরা কোন্ কাজটা কেন

করে? কে বলতে পারবে ওই যে কাজটা বাবা করলেন, সেটা গ্রহণ না বর্জন?

একদিন এক কাবুলিওয়ালা এসে আদাব জানিয়ে আহম্মদ হোসেনকে প্রণামীস্বরূপ কিছু টাকা দিতে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নির্মোহ ফকীর বলে উঠলেন, খান সাহেব, টাকাটা তোমার পকেটেই থাক মরবার পর আমার কবরে গিয়ে তুমি সুদ চাইলে আমি কি করে তা দেব? আশপাশের মানুষরা আহম্মদ হোসেনের কথায় হেসে উঠল। তিনি কাবুলিকে কাছে বসিয়ে চা খাওয়ালেন। হয়তো ওর টাকা না নেওয়ায় সে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, ফকীর তা বুঝতে পেরে চা খাইয়ে সে ক্ষোভ দূর করে দিলেন।

মানুষের সুখ দুঃখের অনুভূতির মধ্যে মহাভাব লুকিয়ে থাকে। রাগ করে কাউকে ভীষণ বকাবকি করলেন কিন্তু তাকে তখনই উঠে যেতে দিলেন না। বস, যাচ্ছ কোথায়? বলে তাকে ধমকে বসিয়ে এটা-ওটা খাইয়ে দিলেন। অনেকের মতে ফকিরী রেওয়াজে গালি-গালাজ আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ে। আহম্মদ হোসেনও অনেককেই এভাবে আশীর্বাদ করেছেন। তাঁর হৃদয় ছিল কোমল, ভালবাসা কানায় কানায় পূর্ণ। বকাঝকা যা করতেন সে শুধু তাঁর বাইরের কাঠিন্যের খোলস।

একবার এক বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তি বিপদে পড়ে আহম্মদ শাহ্‌র শরণাপন্ন হলেন। তিনি ভক্ত ছিলেন। ফকীরের ব্যয়ভার নিঃসঙ্কোচে বহন করতেন। আহম্মদ শাহ্‌ সব শুনে তাঁকে বললেন, কোর্টে যাও, প্রয়োজন হলে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে ভ্রমর হয়ে আমি সেখানে যাব। কেসের দিন কবে তা জেনে নিলেন তিনি। নির্দিষ্ট দিনে ভক্তটি কোর্টে গিয়েছেন। কেস চলছে। বিশেষ সঙ্কট মুহূর্তে মুসলমান ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন একটি কালো ভ্রমর বার বার তাঁর মাথায় চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথা মনে পড়ায় তাঁর প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার হল। সেদিন কোর্টে শেষ পর্যন্ত সুফল দেখা গেল। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় এইসব অলৌকিক মানুষ কি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হন।

আরেকজন মুসলমান ভক্ত সাংসারিক দুরবস্থায় পড়ে ফকীরের কাছে এসেছেন শরণাপন্ন হয়ে। তিনি ছিলেন শহরের বিশিষ্ট ধনী। ওর বিপদের কথা শুনে আহম্মদ হোসেন বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। গভীর রাতে নিজের পরনের কালো লুঙ্গিটি খুলে এক ভক্তকে বললেন, এই কাচের টুকরোটি দিয়ে আমার লুঙ্গিটি ঢেকে দাও তো। ভক্ত তাঁর আদেশ পালন করল। সারাদিন ভক্তটির জন্য ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও কৃপা যারা পেয়েছে তাদের দোয়া কখনো মঞ্জুর না হয়ে পারে না। কিছুদিনের মধ্যেই সেই ধনী ভদ্রলোকের সাংসারিক দুর্যোগ কেটে গেল।

ফকীরের চরিত্রে এর বিপরীত ভাবও দেখা যেত। তিনি যে কখন কি করবেন তা বোঝা ভার। একদিন এক রাস্তার রিকশওয়ালাকে ডেকে বললেন, বেটা আমাকে দু চারটে পরোটা খাওয়াও। রিকশওয়ালা আপত্তি করল না। পরোটা কিনে এনে তাঁর সামনে রেখে বলল, বাবা, আশীর্বাদ করো, আজ যেন আমার অনেক টাকা রোজগার হয়। সে চলে গেল। কি আশ্চর্য সেদিন তার এক পয়সাও রোজগার হল না। সে ফিরতি পথে ফকীরকে জোচ্চোর বলে গালাগালি দিয়ে চলে গেল। বাবা রাগ করলেন না, ওর কথায় শুধু হাসলেন।

রিকশওয়ালা নিজেই ভুল করেছিল যার জন্য তার এই দুর্গতি। মহাপুরুষের কাছে কিছু চাইতে হলে ধৈর্য ধরতে হয়। দরিদ্র রিকশওয়ালা আগে চেয়েই ভুল করেছিল। তাছাড়াও বাবার মন্তব্যে এই ইঙ্গিত ছিল সেদিন সে বেশি রোজগার করলে তা চুরি হয়ে যেত। চাইতে হলে চাওয়ার মতো চাইতে হবে। উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ ও মহৎ। তবেই সুফল ফলবে, না হলেই ফল হবে উলটো।

আহম্মদ হোসেন হঠাৎ একদিন কিছুটা মাখন কলাপাতায় করে এনে তাঁর বিছানার ওপর রাখলেন। বিছানা অর্থে ঐ নোংরা চট। চটের নিচে কোনো ভক্তের দেওয়া এক তাড়া নোট প্রায় প্রকাশ্যেই রাখলেন। ভাবখানা এই, কেউ তোরা চুরি করে নিয়ে যাস। তিনি তারপর এমন ভাব করলেন যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। যা ভেবেছিলেন

তাই হল। ভিড়ের ভেতর বহুরকম মানুষ ছিল—চোর সাধু সন্ন্যাসী ধনী দরিদ্র ভদ্র অভদ্র। ভিড় একটু পাতলা হতেই বাবার একজন পরিচিত ভক্ত উঠে এল। সে মনে করল, আহম্মদ হোসেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। লোকটি চটের নিচে হাত গলিয়ে টাকা ও মাখন বার করে নিল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে চলে যেতেই ফকীর উঠে পড়লেন। চিৎকার গালিগালাজ শুরু করলেন, আমার টাকা কোথায় আমার টাকা কোথায় বলে। একটা সোরগোল হৈচৈ পড়ে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় এই চোর ভক্তটি আবার এসে বাবার কাছে ভিড়ের মধ্যে বসল। বাবা সবার আগে তার দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার? সব খবর ভাল তো? প্রশ্নের মধ্যে যেন এই ইঙ্গিত তুমি যে কাজ করেছ তা আমার ইচ্ছেতেই। আমি জানতাম, তাই তোমাকে চুরি করতে দিয়েছি। এর মধ্যে পরিশুদ্ধতার ব্যাপার ছিল নিশ্চয়। যে ভদ্রলোক নোটের তাড়া দিয়ে গেছে সে হয়তো বেআইনী কার্যকলাপে জড়িত হয়ে বিশেষ বিপদে পড়ে বাবার শরণাপন্ন হয়েছেন। ওই টাকা গ্রহণ মানেই তাঁর বিপদকে বরণ করা। কিন্তু আধার বিশেষে মানুষের কর্ম। যে পাকা চোর, চুরি করে করে চুরির পাপপুণ্যকে ধাতস্থ করে ফেলেছে, সেই চোরই আরেকজনের আপদ বিপদকে চুরি করে নিতে পারে। জাগতিক জীবনে বস্তুবাদের ভেতর দিয়ে সব করতে হয়। তাই লোভী ধনী মান বাঁচাতে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হয়েছেন, আল্লাহ্ দরিদ্র চোরের উপর দিয়ে তাকে রক্ষা করলেন। দরিদ্র অর্থ পেল, মানী তাঁর মান বাঁচাল, এখানে বিষে বিষক্ষয়। কোনো পবিত্র মানুষ যদি সঙ্গদোষে অথবা খেয়ালের ঝোঁকে অথবা গ্রহ দুর্বিপাকে পড়ে হঠাৎ দুটো পয়সাও আত্মসাৎ করে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শুদ্ধ চিত্তে অনুশোচনা ধ্বনিত হতে থাকবে। তার প্রতিক্রিয়ায় পবিত্র ব্যক্তি খুব শিগগিরই ফল পাবে।

শুদ্ধ মন শুদ্ধ প্রেমের অধিকারী। তাকে এক জীবনে দশ জীবনের ভোগ ভুগে নিতে হয়। ভোগ হচ্ছে সংস্কার কারণ, দিন কাটছে

মোটামুটি, ভোগ বাড়ছে। অর্থাৎ বহু জন্মের আনাগোনার পথ সে করে নেয়। আহম্মদ হোসেনের লীলাকাণ্ড নিয়ে ভাবলে সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনেক তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

তিনি কোনো কিছুর মধ্যেই আটকে থাকতেন না। কোনো স্তাবকতাতেই নিজেকে হারাতেন না। সবাই চারদিক থেকে যখন বাবা বাবা করত তিনি বলে উঠতেন, বাবা না থাবা, সাধু না হাদু! কোনো এক ভক্ত একদা গভীর নিশীথে দুঃখ করে বলছিল অল্প বয়সে মা মারা গেল, বাবা আবার বিয়ে করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। লেখাপড়া শিখিনি কাজকর্ম করতেও ভাল লাগে না। আমাকে এমন কিছু দিন যা নিয়ে থাকতে পারি।

ফকীরের হঠাৎ কি খেয়াল হল। ভক্তের সামনে হাতটা খুলে দিয়ে হাত মুঠো করে আবার মুঠোটা একটু আলগা করে বললেন, দেখ বেটা দেখ। ভক্তটি বসে থাকতে থাকতেই টাল খাওয়ার মতো ভঙ্গিতে বললেন, দেখ ছোট ছোট সাদা দুধের মতো চিনেমাটির পুতুল জ্যোতিয়া। মুহূর্ত মাত্র লক্ষ্য করা গেল। তারপর হাতখানা ভক্তর সারা দেহে বুলিয়ে দিলেন। মিনিট তিনেক বাদে ভক্তটি জ্ঞান ফিরে পেল। জোরে একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, কি ব্যাপার? এখন আর বাবাকে মারবার চেষ্টা করবি? দূর বোকা, নে জল খা। সাধুপুরুষ তাঁর ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কি না করতে পারেন?

অন্ধকে দৃষ্টিদান পাজীকে পরিত্রাণ পঙ্গুকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্যই এরা কারামত বা অলৌকিক শক্তিকে মাঝে মাঝে কাজে লাগান। জগৎ ভাবকে জাগ্রত চৈতন্যে যুক্ত করার জন্যই আল্লাহ্‌র এই বিচিত্র লীলাখেলা। ফকীর বাবার জীবন এই বিচিত্রতারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হাত পেতে কারো কাছে যদি পয়সা চাইতেন, সে যদি টাকা দিত তো বিরক্ত হতেন। বলতেন, টাকার গরম দেখাচ্ছ? তোমার কাছে কত টাকা আছে—পাঁচশ, ছশ। লোকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত। আহম্মদ হোসেনের সামনের একটা দাঁত ভাঙা ছিল অথবা পান খেতে

খেতে এমন দাগী হয়ে গিয়েছিল যে মনে হত দাঁত নেই। মাঝে মাঝে স্বগত কণ্ঠে বলতেন, মন যদি ঠিক থাকে হয়তো বাটিতেই গঙ্গা উঠে আসবে। সন্ধ্যার পর ওই ঘুরনি গাছের নিচে না বসলে মন খারাপ হয় এমন ভক্ত তাঁর অনেক ছিল। ভক্তরা এখানে এসে ভাবে অনুরক্ত হয়ে থাকত, দীক্ষিত শিষ্যরা ঘিরে ধরত। তিনি প্রায় সময়ই চুপচাপ সময় কাটাতেন। তাঁকে তখন মনে হত বসে থাকা পাষাণখণ্ড যেন।

হঠাৎ কি খেয়াল হল ভিড়ের ভেতর থেকে হয়তো কাউকে ডেকে বললেন, যা বাবা চা নিয়ে আয়। নিজের হাতে চা-টা এক পাত্র থেকে আরেক পাত্রে নিয়ে যে বাবুটি চা নিয়ে এল তাকেই খাইয়ে দিলেন। এই চা দেওয়া আহম্মদ হোসেনের নিজস্ব এক রেওয়াজ। এখানে শব্দ স্মরণের মধ্যে দিয়ে শুদ্ধতন্ত্রের কারণ পানের আশীর্বাদ অথবা ইঙ্গিত বিদ্যমান। যেসব ভাগ্যবান ব্যক্তি চা পেয়েছেন তাঁরা জীবনে ধন্য হয়েছেন। মাঝে মাঝে সমাগত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলতেন বাবু এমন কিছু চাও না যা আমি দিতে পারি। টাকা পয়সা রোগভোগের শান্তি এগুলোই চাও কেন, যা দেওয়া যায় তেমন কিছু চাও না।

একদিন রাত্রে ফকীর বাবা চেঁচামেচি করছেন। কাছেই থাকতেন এক বাঙালীবাবু, অসহ্য চিৎকার সহ্য করতে না পেরে তিনি এক মস্ত লাঠি এনে ফকীর বাবাকে দমাদম পেটালেন। মুখ গুঁজে তিনি মার খেলেন। কিন্তু অন্য ভক্তেরা রুখে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, চুপ করে থাক, মারতে দাও। ভদ্রলোকটি একতরফা মেরে হাঁপিয়ে পড়লেন। ফকীর তখন বললেন, মারো বাবু আরো মারো। মন ভরে মেরে যাও, ক্ষোভ যেন না থাকে যে ফকীরটাকে ভালভাবে মারতে পারিনি।

এবার ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। আহম্মদ হোসেন শান্ত স্বরে বলছেন, দেখ বাবু তুমি সংসারী মানুষ, আমি ফকীর—তুমি আমাকে মারলে কোনো ফকীরই তার প্রতিবাদ করবে না। কিন্তু বাবু, ফকীর যদি তোমাকে মারে তার ফকীরী তো বরবাদ হবেই, সেই সঙ্গে আর পাঁচজন সংসারী মানুষ তোমার পক্ষ নিয়ে ফকীরকে বলবে,

তুমি কেমন ফকীর হে, মারপিট কর। তা বাবু বেশ করেছ—আমার কেউ নেই, তাই আমাকে মেরেছ, নাও এখন আরাম করে একটু তামাক খাও।

তামাক খেয়ে খুশি হয়ে ভদ্রলোকটি চলে গেলেন। এই ঘটনার পর দু তিনদিন আহম্মদ হোসেন জল স্পর্শ করলেন না। কেউ হয়তো বলবে তিনি রেগে গিয়েছিলেন কিংবা দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু এসব ব্যাপার নয়, নিজের দেহকে কষ্ট দিয়ে তিনি ভদ্রলোকের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন। প্রেমিক সাধক এরা। এদের মধ্যে সামান্যতম হিংসা বা প্রতিহিংসা থাকে না। তিনি কষ্ট পেতেন, নানাবিধ কষ্ট সহ্য করতেন। এক ভদ্রলোক তাঁকে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাবা, তুমি এত কষ্ট পাও কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমরা ঠিক ঠিক পথে চললে আমাকে আর কোনো কষ্ট করতে হবে না।

তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজনে এমন একজন অপরাধী এসে দাঁড়াল যাকে ক্ষমা করা অনুচিত। তিনি তখন একটা নতুন বোতল কিনে আনলেন। বোতলটাকে ট্রাম লাইনে বসিয়ে দিলেন। ওটার ওপর দিয়ে ট্রাম চলে গেলে কাউকে বলতেন যা গিয়ে দেখে আয়, একদম গুঁড়ো হয়েছে কি না। সম্পূর্ণ গুঁড়ো হয়ে গেলে শান্ত হয়ে বলতেন, জড়োয়ার পাথরের মধ্যে হীরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ—হীরের মধ্যে একটা বিশেষত্ব রয়েছে, কাঁচ কাটতে তার প্রয়োজন। হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে এক আছাড়ে যা টুকরো হয়ে পড়ে তাকে কাটবার জন্য এত আয়োজন কিসের?

এই পৃথিবীর মধ্যে মানুষে মানুষে সমতা আনার জন্য, সমস্ত দুঃখ, অন্যায় ও অমঙ্গলের দমন করতে এ রকম হীরক জ্যোতি তেজ দরকার, যা সাধনার দ্বারা সাধকরাই লাভ করতে পারেন। গ্রহনক্ষত্রের রাজ্যে অর্থাৎ জ্যোতিষবিদ্যায় হীরক বিরূপ শুক্রগ্রহকে প্রসন্ন করে। শুক্র গ্রহের ক্ষেত্রে বীর্যাচার্য রূপে পরিচিত। এর অর্থ তিনি নিষ্কাম সত্তার অধিকারী। নিষ্কাম পুরুষই মহাকাশের ধারক অর্থাৎ প্রসন্ন সত্তার অধিকারী। আহম্মদ হোসেন এই রকম ধারণা করে বোতলটিকে

গুঁড়ো গুঁড়ো করলেন চলমান তেজ সংযুক্ত ট্রামের চাকায়। এখানে ট্রাম লাইন, বিদ্যুতের চাকা ও কাচের বোতল - তামা, তেজ ও কাচ, শুদ্ধ তন্ত্রে প্রণব চক্র ধরতে পারা যায়। ভাবশুদ্ধ পবিত্র পুরুষরা প্রণব ধারণা করে ইচ্ছাশক্তিকে হাতের মুঠোয় আনতে পারে। তাঁরা একজনের অমঙ্গলকে, প্রয়োজনে বিশ্বের অমঙ্গলকে মাপ করতে পারেন। এসব কাজ তাঁরা করেন খুব গভীরে গোপনে। একের অমঙ্গল সাধারণ দেখতে পায় না, কিন্তু মহাপুরুষরা সব কিছু দেখতে পান। তাঁরা প্রয়োজনে জগৎ কারণের সাহায্য নেন কোনো অশুভকে দমন করবার জন্য।

আহম্মদ হোসেন ইচ্ছাশক্তির এমন সব কাজ করেছেন যা আপাত অলৌকিক, কিন্তু অসীম ক্ষমতায় খুব সহজেই এই কাজ তিনি নিষ্পন্ন করেছেন। হয়তো কোনো এক ভক্তকে খুব জরুরী একটা খবর পাঠাতে হবে অথচ হাতে সময় নেই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতের কব্জিতে বিশেষ রঙের এক রুমাল বাঁধলেন কষে! বাঁধবার সময় যাকে প্রয়োজন তার নামটা খুব আস্তে উচ্চারণ করলেন। মাত্র দশ কি পনের মিনিট, ভক্তটি কাছে এসে হাজির। এখানে ভাববার কথা ওই রুমালের সম্পর্ক কি? কব্জিতে বাঁধবারই কি মানে? এর উত্তর একমাত্র তাঁরাই দিতে পারে। তাঁদের কার্য কারণের ব্যাখ্যা অন্যে দিতে অক্ষম।

ভক্তরা তাঁর কাছে মুখে কিছু বললে তিনি অখুশি হতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের এত বকবক করে বলবার কি আছে, মনে মনে বললেই তো সব বুঝে যাই। বরং মনে মনে বললে আমার কিছু করার থাকলে তা করতে সুবিধে হয়। ভাল করে বোঝানোর জন্য বিশদ করে বলতেন, আমার কারখানায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ হয়। তিনি নানা ভাষায় কথা বলতে পারতেন। তাঁর মুখে কখনো কথা আটকাত না। স্বয়ং আল্লাহ্ যেন জিবে ভর করতেন। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ল।

হঠাৎ একদিন এক ভক্তকে বললেন, যাও তো, চিৎপুরের অমুক

দোকান থেকে একশো বছরের পুরনো বাঘের চর্বি নিয়ে এসতো। বেচারী খবর রাখত না। তাই ফকীরের কথা বিশ্বাস না করতে পেরে সে বলল, বলছেন কি! একে বাঘের চর্বি তার উপর একশো বছরের পুরনো তা এত সস্তায় পাওয়া যাবে? ফকীর রেগে বললেন, বলছি যাও, বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করো না।

বেচারী বাধ্য হয়ে চিৎপুরের নির্দিষ্ট দোকানে গেল। এবং সত্যি সত্যি সেখান থেকে একশো বছরের পুরনো বাঘের চর্বি পাওয়া গেল। চর্বি নিয়ে এসে আহম্মদ হোসেনের হাতে দিতেই তিনি সেটা পাশে নীল একটা মলমের কৌটোয় ভরে সেটার খাপের কাছে কালো সুতো বেঁধে কানে আর মুখের কাছে রেখে ডাকলেন, হ্যালো দাদাবাবু সাঁ করে একটা কালো মোটর এসে দাঁড়াল। সে আসতেই ফকীর বললেন, এই দেখ তোমায় ফোন করছিলাম। তোমাদের আর আমার ফোনে কত তফাত।

তাঁর এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত কার্যকলাপ দেখে প্রতি মুহূর্তে বিস্মিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু থাকে না। তিনি চিন্তাকে নিমেষে কাজে পরিণত করে দেখালেন। বাচ্চাদের মতো খেলনা নিয়ে খেলতেন। যেন বোঝাতে চাইতেন আল্লাহ্‌ও এমনি এই বিশ্ব প্রকৃতি নিয়ে খেলছেন।

তাঁর কাছে কেউ মনের কথা লুকতে পারত না। লুকতে গেলেই তিনি তাকে বেকুব করে দিতেন। মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, ভিজে ন্যাকড়ার অটোমেটিক ক্যামেরায় তোমাদের সবার ছবি উঠেছে। মরবার পর নিজেদের ছবি নিজেদের দেখতে হবে। আকাশকে তিনি বলতেন ভিজে ন্যাকড়া। স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার মানে সূর্য ও চাঁদ। এক এক সময় চিৎকার করে উঠতেন, যেমন করবে তেমনি ভরবে। যাদের দৃষ্টি সাধনার ফলে স্বচ্ছ তাদের কাছে মাটি আয়নার মতো কাজ করে। আয়না কিন্তু এমনিতে প্রাথমিকভাবে সাধারণ কাচ. পেছনে পারদ লাগালেই তা অসাধারণ হয়ে ওঠে। কাচ কাচ আর থাকে না। তার চরিত্র ও নামের পরিবর্তন হয়, আমরা আয়না বলি। এদের

মনও সাধনাপারদ লেগে নিঃস্তব্ধ হয়ে গেছে। সব তিনি দেখতে পেতেন। সমস্ত কিছু যেন তাঁর কাছে বিচ্ছুরিত। এক ভদ্রলোক তার ছেলের ডিপথিরিয়া হয়েছে বলে এসেছেন। ফকীর তাঁকে বললেন, কি করবেন বলুন, বহু সাধু বহু ফকীর বহু শিশুকে তিনি হুকুম দিলে চলে যেতেই হবে।

কেঁদে ফেললেন ভদ্রলোক। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ফকীর মানুষের চোখের জল দেখতে পারতেন না। তাঁর কোমল প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত লাগল। তাঁর মন উথলে উঠল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু বাদে বললেন, আচ্ছা যাও, উপর থেকে আদেশ এসেছে তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে। তোমার স্ত্রীকে নিজের হাতে কিছু খাবার তৈরি করতে বল। রাত দুটো আড়াইটের সময় কালীঘাটের অমুক মোড়ে একটি মহিলা আসবে, যদি তাকে খাবারগুলো খাওয়াতে পার তাহলেই তোমার ছেলে সেরে যাবে। আর সে যদি না খায় তো আমার কাছে চলে এস। কথা বলেই আহম্মদ হোসেন একটা সাদা ধরনের পাথর ইটের তলায় চাপা দিলেন।

ভদ্রলোক ফকীরের কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় সেই মহিলাকে পেয়ে তাকে খাইয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। অমনি সেই ডিপথেরিয়া রোগ সেরে গেল।

আহম্মদ হোসেনের দাদার কাছে শোনা, শৈশব থেকেই তিনি ফকীর। সামান্য বয়সে গৃহত্যাগ করেছেন, কঠোর যোগী পুরুষ তিনি। নির্মোহ একটি সাধকের জীবন। আহম্মদ হোসেনের বাবা যখন মারা যান তখন তিনি বাড়ি ছাড়া। উঠানে মৃতদেহ। সবাই কান্নাকাটি করছে। এমন সময় দরজার ফাঁক দিয়ে আহম্মদ হোসেন মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার কি হয়েছে? পিতা দেহরক্ষার খবর কেউ তাঁকে দেন নি। ঘুবনিতলায় বসেই তিনি মনের ভেতর এই খবর পেয়ে গেছেন। তাই চলে এসেছেন পার্কসার্কাস থেকে গোবরায়।

আহম্মদ হোসেনের প্রশ্ন শুনে ভাইরা বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখতে

পাচ্ছ না কি হয়েছে? বাবা তো চলে গেলেন। উত্তর শুনে তিনি হঠাৎ হোহো করে হেসে উঠলেন। যেন এই ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। নেহাত বোকারা শোকে মরছে। সবাই আবার বিরক্ত হলে তাঁর বড় ভাই জমীল সবাইকে শান্ত করে বললেন, ও আধ পাগলা ফকীর, ওর কথা তোমরা ধরো না।

আহম্মদ হোসেন এরপর আরো কাণ্ড করলেন। যা আরো মারাত্মক। তিনি দাদাকে ডেকে বললেন, খুব খিদে পেয়েছে, আমাকে একটা গরম রুটি খাওয়াতে পার? এই অবস্থায় এমন অদ্ভুত আবদার শুনে সবাই হতভম্ব। কিন্তু জমীল আহম্মদ হোসেনের মনের অবস্থা টের পেয়ে দোকান থেকে একটা গরম আটার রুটি কিনে এনে ভাইকে দিতেই সে সেই রুটিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কাক চিলকে খাইয়ে শেষে একবিন্দু মুখে দিয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সে পথ দিয়েই চলে গেলেন। সবাই যখন পিতার মৃতদেহ নিয়ে শোকে মুহ্যমান তখন একটা গরম রুটি চাওয়ার অর্থ কি? আর এরকম প্রার্থনা কেই বা করতে পারে? সাফ কথায় আল্লাহ্‌কে ফল মিষ্টান্ন অথবা অন্ন নিবেদনকে সাধারণ লোক ভোগরাগ বলে থাকে। আহার বিহার দিয়ে এইসব প্রাণীর আচরণকে চট করে কেউ বুঝে উঠতে পারে না। এই উপলব্ধি অনুরাগের চরম উপলব্ধি।

আহম্মদ হোসেন ছিলেন দিব্য জ্ঞানী, মুক্ত পুরুষ। পিতার কর্মভোগকে ফকীর সন্তান সামান্য একখানা রুটির মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করে তাকে সংসার সাগর থেকে মুক্ত করে দিলেন। যথার্থ যোগ্য সন্তান সব সময়ই সব বাবাকে সংসার থেকে পরিত্রাণ করতে চায়। আল্লাহ্‌র নামে ভোগরাগ নিবেদন করলে তিনি তার কর্মভোগগুলো খণ্ডন করে দেন এইভাবেই। আহম্মদ হোসেন পাগলামি করতে আসেন নি। এই কাজটুকুই করতে এসেছিলেন। তাই চুপচাপ কর্তব্য করে চলে গেলেন।

অন্য একদিনের একটি ঘটনার কথা বলা যাক। পকেটে অনেক টাকা নিয়ে তিনি বসে বসে ঢুলছেন। শীতের অন্ধকার রাত। তবু

তখনো কয়েকটি ভক্ত বসে আছে। এমন সময় একজন দুর্ধর্ষ গুণ্ডা হঠাৎ এসে তার পকেট থেকে নোটের তাড়া তুলে নিয়ে চলে গেল। বড় ভাই ঘটনার কথা শুনে ছোট ভাইকে যা মুখে এল তাই বলে গালাগাল দিল। এমন অত্যাচার নির্বিবাদে সহ্য করবার কোনো মানে আছে!

আহম্মদ হোসেন ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, ছেড়ে দাও না। জান কেন আমি লোকটাকে কিছু বললাম না। এই টাকা না পেলে লোকটা তার দলবল নিয়ে আজ কোনো ধনী গৃহস্থের ঘরে খুনখারাপী করত। আমি ইচ্ছে করেই তাই ওদের টাকাটা দিয়ে দিলাম। আমার সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে হয়তো কয়েকটা প্রাণ রক্ষা পেল। ওই ধনী গৃহস্থের গ্রহ বিপাক দূর হল।

কত বড় উপলব্ধি অনুভূতি আর ক্ষমা! মানুষের প্রতি কি প্রগাঢ় ভালবাসা! এই ভালবাসা না থাকলে মানুষ এমন ক্ষমা করতে পারে। এমন ঘটনাও দেখা গেছে তার কোনো জিনিস চুরি করে চোর তার কাছেই তা আবার বিক্রি করেছে। তিনি তা জেনেও চুপ করে থেকেছেন। প্রচণ্ড দুঃখ পেলে একটা কথা বলতেন খুব কোমল শান্ত স্বরে, বাছারে আর কাঁহাতক!

বড় ভাই গল্প করতে করতে বলতেন, ফ্যাচ করে নাক ঝেড়ে ওই হাতেই একখানা রুটি খেতে দিলেন আহম্মদ। লুকিয়ে রুটিটাকে পকেটে পুরলাম। ভাবলাম, ও তো আর দেখতে পেল না। কিছুতেই উঠতে দেয় না। মাথার দিব্যি দিয়ে বসিয়ে রাখে। তারপর অনেক রাতে ছেড়ে দেয়। রাস্তা দিয়ে ফিরতি পথে একজন ভিখিরিকে দেখলাম কিছু পাওয়ার আশায় বসে আছে। পকেট থেকে রুটিটা বার করে তাকে খেতে দিলাম। পরের দিন যুবনিতলায় যেই গিয়েছি অমনি ওর বকাবকি শুরু হল। বলতে লাগল, কপালের জোর থাকলে ফকীরের হাতের এক আধখানা রুটি পাওয়া যায়। বড় ভাই বুঝতে পারলেন আহম্মদ হোসেনের দিব্য দৃষ্টিকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নি। অনুশোচনা হল মনে, ভাবলেন হাজার হোক ভাই তো! রুটিটা খেলেই হত।

আহম্মদ হোসেন বড় ভাইকে যা তা বলে প্রায়ই গালাগাল করতেন। আবার ভালওবাসতেন। একদিন বড় ভাই বললেন, তুমি যখন চলে যাবে, সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যেও। প্রতিবাদ করলেন এটা জন্ম ফকীর আহম্মদ হোসেন। তাই কি হয়। তোমার যে সংসার রয়েছে দেখতে হবে না। নাও, এই কম্বলটায় বসো তো, নিজের গায়ের কম্বল বিছিয়ে দিলেন ভাইয়ের বসবার জন্য। একদিন না একদিন তোমাকেও ফকীর হতে হবে, যাবে আর কোথায়! সবাই তো একই পথের যাত্রী।

সামান্য জীবের প্রতি তাঁর দয়া ছিল অসীম। একবার জনৈক পাবনার ভক্ত তার বাড়িতে প্রচণ্ড পিঁপড়ের উৎপাতে আর না পেরে বিষাক্ত ওষুধ এনে পিঁপড়ের গর্তে দিয়ে পিঁপড়ের দৌরাত্ম্য নিবারণ করেন। এই ঘটনার পর তিনি আহম্মদ হোসেনের কাছে যেতেই তিরস্কৃত হলেন। রেগে আহম্মদ হোসেন তাঁকে বললেন, তুমি কি ভাব এই দুনিয়াটা তোমার জন্যই তৈরি হয়েছে? পিঁপড়েদের জন্য নয়?

ভক্ত তো অবাক! তিনি উত্তর দিলেন, এ ব্যাপারটাও আপনি জেনে ফেললেন যে ঘরে বসে আমি পিঁপড়ে নিধন করেছি। অপরাধ ক্ষমা করুন। এমনটি আর হবে না। এই ভক্তের জীবনের আরো একটি ঘটনাও বিস্ময়কর। এঁর পূর্ব গুরু যিনি ছিলেন তিনি বিদায় নেবার আগে ওঁকে বলেছিলেন, আমার জন্য কেঁদ না। আজ থেকে সাত বছর পরে কলকাতার পার্কসার্কাস-এর রাস্তায় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। ভক্ত মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করে। গুরুর দেহরক্ষার ছ সাত বছর বাদে সে নতুন করে গুরুকে খুঁজতে কলকাতায় হাজির হয়। একদিন পার্কসার্কাস দিয়ে তিনি যাচ্ছেন, ঘুরনিগাছের নিচ থেকে আহম্মদ হোসেন তাঁকে ডাকলেন। ভক্তটি কাছে এসে দাঁড়াতেই তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলেন। তিনি নাম বলতে আহম্মদ হোসেন তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি পূর্ব জীবনের ঘটনাবলী বলতে লাগলেন এক এক করে। তাই শুনে ভক্ত প্রথমে

থ হয়ে গেলেন। তারপরে আহম্মদ হোসেনের পা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

একদিন গভীর রাতে ফকীর এক ভক্তকে ডেকে বললেন অমুক কবরখানায় গিয়ে এই মাটির গামলাতে কবরখানার কল খুলে জল নিয়ে এস। আদেশমতো ভক্ত যথারীতি সেখানে গেল। কিন্তু জল নিতে গিয়ে সে ফ্যাসাদে পড়ল। যতবার কল খোলা হচ্ছে ভকভক করে খানিকটা ফেনা বেরুচ্ছে কিন্তু জল কোথায়? দুবার সে সেই ফেনা ফেলে দিল। তিনবারের পর ফেনা দিয়েই গামলা ভর্তি করে পাত্রটি ফকীর বাবার সামনে এনে হাজির করল। মুখ বলল, কই বাবা, ওখানে জল নেই, শুধু ফেনা।

শুনে খুশি হলেন আহম্মদ হোসেন। উত্তর দিলেন, বহুত আচ্ছা। ভাল জিনিসই তো পেয়েছ তুমি। দাও বেটা দাও। ফেনা ভর্তি পাত্রটা বুকে ঠেকিয়ে তিনি সেগুলো বিশেষ কতকগুলো জায়গায় ছড়িয়ে দিলেন। মুখে শুধু বললেন, পৃথিবীতে এখন কিছু শুভ আত্মার প্রয়োজন। পাপে গোটা পৃথিবী ভরে গেছে। এর ভেতর অন্তর্নিহিত রহস্য লুকনো ছিল। ফেনা থেকেই বিশ্ব রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বুদবুদ আগম নিগমের কাহিনীকে অবিরত রূপ দিচ্ছে।

কলকাতার বিশিষ্ট এক সম্ভ্রান্ত ধনী মাড়োয়ারী পরিবারের শাশুড়ী ও ছেলের বউ একদিন ফকীর বাবাকে দেখতে এসেছে। তাদের কথা শুনে প্রথমে তিনি কিছুতেই দেখা করতে রাজী হচ্ছিলেন না। ফকীর বাবার বিশেষ এক ভক্ত বারবার অনুরোধ করায় বললেন, ওদের অপেক্ষা করতে বলো, আমি যাচ্ছি ওদের গাড়ির কাছে।

গাড়ির কাছে গিয়ে দরজা খুলেই বড় বড় চোখ করে ভদ্রমহিলাদের বললেন, কি চাও বলো? রেসের টিপ না ছেলের জীবন? আশ্চর্য! ওদের ছেলের একটি পা একেবারে খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। একদম চলতে ফিরতে পারত না। তা ছাড়া ইনি জানলেন কিভাবে যে এঁরা রেসের টিপ চাইতে এসেছে। আহম্মদ হোসেনের মূর্তি দেখে ওরা ভয়ে বলল, ছেলের জীবন।

এবার তিনি ওদের এক দেবস্থানে নিয়ে গিয়ে একটি ঘড়া ভরত্তি জল নিলেন। সেখানে গিয়ে ওদের ধূপধুনো জ্বালাতে বললেন ও ছেলেকে ওই জল একটু একটু খাওয়াতে আদেশ দিলেন। রাত তখন নটা-দশটা। শাশুড়ী ছেলের বউ তো ভয়ে অস্থির। কর্তা জানে না তাদের এই অভিসার। শুনলে কি প্রচণ্ড রাগ করবে এই ভাবে মুখ শুকিয়ে গেছে। তাদের মানসিক অবস্থা বুঝে ফকীর বাবা বললেন, ভয় পাচ্ছ কেন বাড়িতে তোমাদের কেউ কিছু বলবে না।

দুই মহিলার মধ্যে যিনি বয়স্কা অর্থাৎ শাশুড়ী তিনি আহম্মদ হোসেনের উদার ব্যবহার দেখে ভয়শূন্য হৃদয়ে প্রশ্ন করলেন, বাবা, আপনাকে লোকে পাগল বলে কেন? প্রশ্ন শুনে হেসে উত্তর দিলেন, মানুষকে চিনতে হলে সাধনার প্রয়োজন, সবাইর কি সবাইকে চেনার ক্ষমতা আছে।

আহম্মদ হোসেনের জীবনে এত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ যা ভাবলে অবাক হতে হয়। পৌষ মাসের কোনো এক রাত। শীতার্ত কলকাতা এমনিতেই কাতর, তার ওপর ঝমঝম করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে। আহম্মদ হোসেনের চট কম্বল ভিজে একশা। অত্যন্ত পুরনো একটা ছাতা মাথায় দিয়ে তিনি কোনো রকমে ভিজছেন বসে বসে। এমনিই ছিল তাঁর স্বভাব। ভক্তরা যদি কেউ বলত, বাবা, এদিকটায় উঠে বসুন। উত্তরে তিনি বলতেন, না, এই তো বেশ, ননীর পুতুল তো নই যে গলে যাব। মেঘ দেখলে বহু সময় তিনি গান গেয়ে উঠতেন। কখনো কখনো কোমরে হাত দিয়ে নাচতে শুরু করতেন ইতর প্রাণীর মতো।

গান তাঁর খুব প্রিয় ছিল। একবার কাওয়ালী গান শুনবার বাসনা হল। ভক্তদের বললেন, ডেকে আনত কাওয়ালী গায়কদের ওঁর ডাকে আশপাশের বহু কাওয়াল এসে গান শুরু করল। গান শুরু হতেই ভিড় শুরু হয়ে গেল। তখন উনি চট করে উঠে ছাতা খুলে পয়সা আদায় শুরু করলেন। কাওয়ালদের বললেন, গান করো না তোমরা, বাবুরা পয়সা দিচ্ছে না। গান বন্ধ হয়ে গেল। দুএকজন

ওর মধ্যেই বলল, বাবা, ওরা পয়সা চাইছে না। পয়সা দেবে কেন লোকে? আহম্মদ হোসেনই বলে উঠলেন। গান শুনে প্রাণ না ভরলে কি করে পয়সা দেবে। ওঁর বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল।

তিনি রসিক ছিলেন। এমন মজার খেলা হামেশাই খেলতেন। আহম্মদ হোসেনের গুলি খেলার ব্যাপারটা ছিল খুব মজার। বাবা গুলি খেলছেন। প্রচণ্ড ভিড় জমেছে। হাট হাট করেও কেউ তাদের হঠাতে পারছে না। আহম্মদ হোসেন তখন চোখ বড় বড় করে বলে উঠলেন, দেখবে তোমরা এখনই পুলিশ ডাকব। অভিভাবকরা বাচ্চাদের যেমন পুলিশের ভয় দেখায়। এও খানিকটা তেমনি। বাবার কাছে আগত সবাই বাচ্চা। সত্যি সত্যি খেলা দেখতে পুলিশও এসে দাঁড়াত। তারা বাবাকে সেলাম জানাত। বাবা চোখের ইশারা করতেন তাদের দিকে তাকিয়ে। তারা ডাণ্ডা নিয়ে সবাইকে ভয় দেখাতেই পলকে ভিড় সাফ। তাই দেখে তিনি মুচকি হাসতেন খুব মজা পেতেন লোকগুলোর পালানোর ভঙ্গি দেখে।

একবার এক বৃদ্ধ মুসলমানের খুব বিয়ে করবার শখ হয়েছে। তিনি এই বাসনায় বাবার কাছে এসেছেন। বাবা তাকে বসে বসে নানান রকম কথা বলে ওখান থেকে তাড়ালেন। বুড়োকে তিনি বলেছিলেন, ওহে বুড়ো, ভাবছি ফুটফুটে একটা কচি মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। নিশ্চয়ই তুমি খুব খুশি হবে। আহম্মদ হোসেনের কথায় বুড়ো আনন্দে গদ্‌গদ করে উঠলেন। ফকীর বাবা তাঁকে চা খাওয়ালেন। তারপর তার গলা ধরে গুনগুন করে গান শুরু করলেন। গলা জড়িয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন. আচ্ছা তুমি একটা সত্যি কথা বলবে? খুশি মনে বুড়ো বলল, নিশ্চয়ই বলব। আচ্ছা তোমার এই চুলগুলো কি বয়সে পেকেছে? অন্যান্য সবাই তাঁর প্রশ্নের ধরনে হেসে উঠল। ফকীর বাবা তাদের কপট ধমক দিলেন, এই তোমরা হাসছ যে বড়। কি জন্য হাসছ? বুড়ো এবার বুঝে ফেলল। আহম্মদ হোসেন তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন। তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল আপনা থেকে। আহম্মদ হোসেন তখন ওর

পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, লজ্জার কি সব ঠিক হয়ে যাবে। মুসলমান ভদ্রলোক তখন উঠে পালালেন।

আহম্মদ হোসেনের ফকিরী ঝোলা বোঝাই ক্ষমা আর ভালবাসায়। তাঁদের জীবন ধন্য যাঁরা ওঁর সান্নিধ্য লাভ করেছে। চোর ছ্যাঁচোড় ভাল-মন্দ জাত বেজাত তাঁর বিচার ছিল না। নির্বিকার ভাবে আপন মহত্ত্ব দিয়ে তিনি সবাইকে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। সংসারী লোকের সম্বন্ধে কোনো খারাপ মন্তব্য তিনি সহ্য করতেন না। ভক্তরা কেউ কিছু বললে উত্তরে তিনি বলতেন, সংসারীদের কত কষ্ট। তবু সব ঝামেলা মিটিয়ে ওরা এখানে আসে। কেউ তাঁর কাছে বসে আপন মনে বিপদ আপদের কথা ভাবলে তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারতেন। স্নেহের সুরে বলতেন, এত কি ভাবছ, ভাববার দরকার নেই। সব ভাবনা ছেড়ে তাঁর চিন্তা করো, তিনি হুকুম জারি করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

একবার এক গরিব বিধবার ছোট একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে। বহু খোঁজ করেও তার খবর পাওয়া যায় নি। তদবির তদারক করেও ফল হয় নি তখন লোকমুখে শুনে ভদ্রমহিলা ফকীর বাবার শরণাপন্ন হল। বিধবার মলিন দুঃখভরা কাতর মুখ দেখে বাবা তাকে কাছে বসতে বললেন। সামান্য দু এক কথার পরই বললেন, মেয়ে তোমার ঠিক আছে। দু একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। এখন এই সন্দেশটা খাও। ভদ্রমহিলা খেতে চাইল না। আহম্মদ হোসেনও ছাড়লেন না, তাকে জোর করে খাওয়ালেন। সেই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল মা তার সন্তানের হাতে খাবার তুলে দিচ্ছে। মেয়েটি কিছুদিন বাদেই ফিরে এল।

আহম্মদ হোসেনের বহু আচরণ দেখলে সাধারণ মানুষের মন দ্বিধায় দুলে উঠত। একটা সন্দেহের মেঘ ভেসে মনের আকাশে ছেয়ে ফেলত। উচ্চ মার্গে ওঠার পর কোনো সাধক কি এমন কাজ করে? আল্লাহ্ নিজেই এই সৃষ্টির আঁধার এবং আধেয়ও। অনেকটা উর্ণনাভের মতো। সে যেমন নিজের দেহসৃষ্ট জালের মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে

রাখে, আল্লাহ্ তেমন করে বিশ্বসৃষ্টির পর বিশ্বের মধ্যেই নিয়ত রয়েছেন। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি নিয়ে খেলতে ভালবাসেন। বিশ্বই তাঁর খেলাঘর। কিন্তু তাঁর খেলা নকল করে যিনি তাঁর সমপর্যায়ে নিজেকে দেখাতে ব্যস্ত তিনি যোগজীবন থেকে পতিত হন। অবতার পুরুষের ইচ্ছা আর কিছু নয়, তাঁর সংহত শক্তির রূপমাত্র। ক্রিয়াহীন মনে যখন কোনো ইচ্ছার ভাব জাগে তখনই তিনি স্বরূপে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। এমন ইচ্ছা তিনি রাস্তায় বসে বসে দেখিয়েছেন। প্রত্যক্ষ করিয়েছেন তাঁর ভাব সমাধিকে। কিন্তু সামান্য সংখ্যক ব্যক্তিই তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আবার অবাক হয়ে ভাবতে হয় তাঁর লীলাকে যাঁরা বুঝতে চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সংসারী মানুষ। আহম্মদ হোসেন যেন নিজ ফকিরীতে সংসার ও সন্ন্যাস বিচার করবার জন্য ধরেছিলেন দাঁড়িপাল্লা। ওঁর সাধনার প্রকার পদ্ধতি ও সামগ্রীর ভেতর তা প্রকটভাবে সক্রিয় ছিল। পৃথিবী বৃহৎ ধ্বংসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাই দেখে আহম্মদ হোসেন বিশ্ববীজের বাক্সটি সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে গিয়েছেন নিপুণ হাতে। যিনি বিশ্ববীজের মালিক তিনি প্রলয় ও স্থিতির ইঙ্গিত করে দিয়েছেন বস্তুতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। তাই বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেই আহম্মদ হোসেনকে বুঝতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট ভ্রমণ কাহিনী এখানে স্মর্তব্য।

পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে কোনো এক বাঙালী পরিবার কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ফিরবার সময় তারা লাহোর পৌঁছে দেখেন সারা লাহোর স্টেশন অন্ধকার, কোথাও কোনো মানুষজনের সাড়া নেই। এদের ইচ্ছে ছিল, লাহোরে খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি সেরে নেবেন। কিন্তু স্টেশনের অবস্থা দেখে তারা বেশ ভীত হয়ে পড়লেন। ভদ্রলোক মহিলাটিকে গাড়ির কামরায় রেখে ব্যাপারটা কি তা জানতে নিচে নেমে পড়লেন। তখন উভয়েই ক্ষুধার্ত ছিলেন। লাহোরে গাড়ি আসার পর গাড়িটি যাত্রীহীন হয়ে পড়ল। দু'চারজন করে দূরের যাত্রী ফাঁকা জায়গায় বসেছিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

ভদ্রমহিলা নিতান্ত একা। তিনি কামরার দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ ইংরেজিতে এক্সকিউজ মি প্লিজ, বলে স্যুট পরা লম্বা চওড়া এক ব্যক্তি কামরায় উঠল। সঙ্গে আর্দালীর হাতে মালপত্র। ভদ্রলোক টর্চ জ্বেলে আর্দালীকে দিয়ে মালপত্র গুছিয়ে নিলেন। ভদ্রলোকই কথা বললেন, আপনি কি একা যাচ্ছেন ? না সঙ্গে কেউ আছেন ? মহিলা উত্তর দিতে বিদেশী ভদ্রলোক আবার বললেন, তা আপনার কর্তা কোথায় গেছেন মহিলাটি পুনরায় সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, খাবার কিনতে। শুনে ভদ্রলোক জানালেন এখানে আজ তো খাবার পাবেন না ; বিশিষ্ট এক ব্যক্তি নিহত হওয়ায় তাই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে। বিরাট মারামারি চলছে। ভদ্রমহিলা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি ভদ্রলোককে বললেন, উনি তো এসব কিছুই জানেন না, কোথায় যে গেলেন ? ভদ্রলোক তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এক কাজ করুন, আপনি দরজা লক করে বসে থাকুন, আপনার কর্তার চেহারাটার মোটামুটি একটা আন্দাজ দিন, নেমে দেখি ওঁকে খুঁজে পাই কিনা। হ্যাঁ, নামটাও বলুন।

সব জেনে ভদ্রলোক নেমে গেলেন। পনের কুড়ি মিনিট বাদে একাই ফিরে এলেন কোনো খোঁজ না পেয়ে। ভদ্রমহিলা তাই দেখে কেঁদে ফেললেন। এবার কি হবে ? বিদেশী ব্যক্তি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, শান্ত হয়ে অপেক্ষা করুন, ভয়ের তেমন কোন কারণ নেই। কাউকেই স্টেশনের বাইরে যেতে দিচ্ছে না। হয়তো এদিক ওদিক কোথাও আছেন। ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে উল্টো দিকের সীটে বসে জুতো খুলতে খুলতে বললেন, কোথায় গিয়েছিলেন বেড়াতে ? কাশ্মীর ? হ্যাঁ, ভারী সুন্দর লেগেছে। বলেই ভদ্রমহিলা বললেন, আমি না হয় নেমে একবার দেখে আসি। না না, খবরদার ওকাজ করবেন না। ভয় পাচ্ছেন কেন ? উনি এখুনি এসে পড়বেন।

কামরায় আলো জ্বলে উঠল। ধড়ে তবু খানিকটা প্রাণ এল। কিন্তু ভদ্রমহিলা অন্য এক ব্যাপারে ভীত হলেন। সহযাত্রী ভদ্রলোক

মুসলমান। তার সুটকেশে বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা। কি ঘাবড়ে গেছেন তো? ভদ্রলোক হেসে বললেন, ভয় নেই। আমি বাথরুমে যাচ্ছি। আপনি শান্ত হয়ে বসে থাকুন। না দেখে হঠাৎ দরজা খুলবেন না। আবার একা আকাশ পাতাল ভাবছেন ভদ্রমহিলা, কি কুক্ষণে বেড়াতে বেরিয়েছি। এমন সময় ওঁর স্বামী কোথা থেকে কচুরী তরকারী কিনে ফিরে এলেন। কোথায় গিয়েছিলে তুমি? ভদ্রমহিলা ওকে দেখে বলে উঠলেন, একটা ভয়ভাবনাও নেই! এর মধ্যে মুসলমান সহযাত্রী স্নান সেরে ফিরে এলেন। তিনিও ওদের সঙ্গে গল্পে যোগ দিলেন। নিতান্ত পরিচিত জনের মতোই আলাপ শুরু করলেন। নিজের ঘরে তৈরি খাবার ওদের ভাগ করে দিলেন। ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢেলেও খাওয়ালেন। কথায় কথায় তিনি নিজের পরিচয় জানালেন, আমার বাড়ি ডেরা ইসমাইল গ্রামে। পাণিপথেও একটা ডেরা আছে। হিন্দু মুসলমানের মারামারি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন।

চমৎকার আলাপী ও রসিকজন। দিল্লী পর্যন্ত সুখসঙ্গ দান করে তিনি ওদের সঙ্গে এলেন। দিল্লীর কবরখানায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বললেন। ভদ্রমহিলার বয়স অল্প, তিনি এইসব কথা তেমন বুঝতে পারলেন না। শুধু বুঝলেন সহযাত্রী বন্ধু বেশ উচ্চশিক্ষিত। বিদায়ের সময় ভদ্রমহিলা বললেন, আমাদের জন্য আপনি যা করলেন তা ভাষায় বলার ক্ষমতা আমার নেই—যদি কখনো কলকাতা যান তো আমাদের এখানে উঠবেন। ভদ্রলোক হেসে জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই যাব, কিন্তু তখন আপনি আমায় চিনতে পারবেন কি?

না চেনবার কি আছে? ভদ্রমহিলা অবাক হলেন। বললেন, বাঙালীরা এত অকৃতজ্ঞ নয়।

ব্যাপারটা তা নয়, ভদ্রলোক বললেন, আমি বিভিন্ন রূপ ধরতে পারি, যখন যাব তখন হয়তো এই চেহারাই থাকবে না তো চিনবেন কি করে? হাসলেন ভদ্রমহিলা, আপনি সি. আই. ডি নাকি? হতেও তো পারি। সে যাই হোক আপনি কথা দিন একবার যাবেন

আমাদের ওখানে। বেশ কথা দিলাম কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর বাদে কলকাতার এক ফুটপাতে কোনো এক গাছের নীচে আমাদের দেখা হবে। আমি আপনাকে চিনে নেব কিন্তু আপনি আমায় চিনতে পারবেন না। সে কি! ভদ্রমহিলা অবিশ্বাসের চোখে তাকালেন, আপনি চিনবেন, আমি পারব না। বাজী রইল। ঠিক আছে। ভদ্রলোক বললেন, যেখানেই থাকি. যতদূরেই থাকি, দেখা করব। নমস্কার। হাঁসফাঁস আওয়াজ করতে করতে ট্রেন ছেড়ে দিল।

বছরখানেক বাদে ভদ্রলোকের এক চিঠি এল। খুব অসুখে ভুগছি, হাসপাতালে আছি। আপনাদের দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। ওদের যাওয়া হল না। কুড়ি পঁচিশ দিন বাদে আবার একটা চিঠি এল। বাঁচব না বলেই মনে হচ্ছে, অন্ততঃ আপনাদের দুজনের হাতের চিঠি পেলে খুশি হব। ভদ্রলোক চিঠি লিখলেন। ভদ্রমহিলাও দু ছত্র লিখলেন। এরপর আর ওঁদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই।

কলকাতায় থাকতেন এই দম্পতি। ভদ্রমহিলার সাধুসজ্জনের উপর ভক্তি ছিল। তাঁদের কাছে যাতায়াত করতেন। শৈশবে বহু অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতেন। যেদিনের কথা বলছি সেদিন ছিল অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যদিন। ভদ্রমহিলার উঠোনে এক সাধু এসে হাঁক দিলেন, কই আমার নন্দরাণী মা কই? সাধুর পরনে গেরুয়া, মাথায় চুলের মুঠি, হাতে চিমটে, কাঁধে ঝুলছে এক থলে। ভিক্ষে দিতে অন্য লোক যেতেই সাধু তাদের ফিরিয়ে দিল। সে বলল, মার হাত থেকেই এই পুণ্য দিনে ভিক্ষে নেব। খবর পেয়ে ভদ্রমহিলা নিজে এলেন। তাঁকে দেখেই সাধু উঠোনে তাঁর কাছে বসতে বলল। কোনো দ্বিধা না করে ভদ্রমহিলা যন্ত্রচালিতের মতো বসে পড়ল। সাধুকে দেখে তাঁর বারবার মনে হতে লাগল, বহুদিনের যেন দেখা। কোথায় দেখেছি। চার-পাশে ভিড় জমে গেল। তারা নানা রকম দ্বিধা সন্দেহে ভুগছে। সাধু ভদ্রমহিলাকে তুকাতক করবে নাত? সাধু কি একটা ওঁর হাতে দিয়ে বলল, নাও এটা খেয়ে নাও। ভদ্রমহিলা আপত্তি সত্ত্বেও সাধুর অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম করে সাধুর দেওয়া বস্তু খেয়ে নিলেন।

এরপর একটা মাদুলি দিল সাধু। বলল, এটা হাতে পর। আমি ওসব পরতে টরতে পারব না। তবে রেখে দিও যত্ন করে। এবার কিছু পয়সা দাও। আসল কথা বল, কত দেব মাদুলির জন্যে। পাঁচ টাকা। সাধু উত্তর দিল।

পাঁচ টাকা! মাসের শেষ, পাঁচ টাকা কোথায় পাব?

তা জানি না। তোমার পায়ে পড়ি—টাকাটা ভীষণ দরকার।

দরকারটা বল আগে। ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন। সাধু বলল, ভীষণ প্রয়োজন। ভদ্রমহিলা বললেন, এইসব বুজরুকি করে মেয়েদের ঠকিয়ে তোমার লাভ! কেন একাজ করো। সাধু না হয়ে তুমি তো ভ্রষ্ট হয়ে গেছ। এমন কাজ করো না। ভদ্রমহিলা পাঁচটা টাকা এনে দিয়ে বললেন, নেহাত আজ অক্ষয় তৃতীয়া, তাই দিয়ে দিলাম।

বেশ কিছুদিন বাদে ভদ্রমহিলার হাঁপানী রোগটা আবার মাথাচাড়া দিল। কন্‌কনে শীত পড়েছে সেবার কলকাতায়। সংসারে নানা ঝঞ্ঝাট। মনটা বিক্ষুব্ধ। এমন সময় সেই সাধু আবার এসে উপস্থিত। এসেই সে হাঁক দিল আগের মতো। ওকে দেখেই ভদ্রমহিলা রেগে গেলেন। তুমি আবার এসেছ। যাও চলে যাও। না, তোমার জন্যে দুটো জিনিস এনেছি। বলে সে থলি থেকে একটা গাছ বের করে দিল। বলল, এটা মজার গাছ, ওপরে নীচে পয়সা দিলে ঘোরে। ঘুরনি মা ঘুরনি। শ্বাসকষ্ট হলে এটা ধুয়ে একটু জল খেও। অন্য জিনিসটা কি? ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন। দেখে মনে হচ্ছে সাদা শেকড়।

তোমার জেনে লাভ নেই। যত্ন করে রেখে দিও। আজ যাই, আবার আসব। ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, কই আজ তো পয়সা চাইলে না? সে তোমার ইচ্ছে হলে দেবে। এই নাও। ভদ্রমহিলা দুটো টাকা দিলেন। দিলেই যখন তখন আর দুটো দাও, গঙ্গাসাগর যাব। ভীষণ যেতে ইচ্ছা করে। তাই নাকি? ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমারও খুব ইচ্ছে গঙ্গাসাগর যাবার। বাড়ির লোক কেউ

যেতে চায় না। তুমি বুড়ো মানুষ, তোমার সঙ্গে গেলে কেউ কিছু বলবে না। যাবে আমাকে নিয়ে? তোমার সব খরচ আমার।

তা বুঝলাম। সাধু হেসে বললে, তুমি কি করে আমাদের সঙ্গে যাবে। আমরা বড্ড কষ্ট করে যাই। তবে বলে গেলাম সাগর তীর্থে তুমি নিশ্চয়ই যাবে। বাড়ির লোকই তোমাকে নিয়ে যাবে। বৃদ্ধ সাধু চলে গেল।

আরো কিছুদিন কেটে গেল। একদিন আবার পাশের বাড়িতে কে যেন নন্দরাণী মা বলে ডাকছে ওই ভদ্রমহিলা শুনতে গেলেন। সাধু বাবাজী সে বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে এবাড়ি এল। ভদ্রমহিলা রেগে অস্থির। কি ব্যাপার? আবার কি মতলবে? মতলব কিছু নেই। সাধু উত্তর দিল। সব বাড়ি ঘুরে বেড়ানোই আমার কাজ। ভদ্রমহিলা আগেই বলে দিলেন, আজ আমার হাত খালি কিছু দেবার উপায় নেই। ঠিক আছে, একটু চিনিজল দাও। ভদ্রমহিলা দিলেন। চিনি দিয়ে জল খেয়ে চাঙা হল সাধু। বলল, মায়ের বুঝি ছেলে নেই? দুটোই মেয়ে। তা মা তোমার একটা খোকা হোক।

যাক আর আশীর্বাদ করতে হবে না। খোকা হোক—ভদ্রমহিলা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। খোকা হলে খাবে কি? আল্লাহ্ তোমাকে দেবে। তুমি আমার কাছে কিছু চাও না?

কি আর চাইব বলো, ভদ্রমহিলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মাথা গোঁজবার মতো একটা বাড়ি দিতে পার? ভাড়া বাড়িতে বাড়িওলার অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে। হবে মা, বাড়ি হবে। ভবানীপুরে তোমার জমি হবে। দেখে নিয়ো আমার কথা। আর তা খুব শিগগিরই, আজ তাহলে যাই মা।

এই ঘটনার পর মাসখানেক বাদে ওঁরা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলেন। বাড়ি ছাড়বার সময় বুড়ো সাধুর কথা ভদ্রমহিলার মনে এসেছিল। নতুন বাড়িতে যাবার কিছুদিন বাদে তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন এবং সত্যি-সত্যি জমি কিনলেন ভবানীপুরে। ওই সাধুর কথা ফলে গেল। লোকে হয়তো অবিশ্বাস করবে কিন্তু এমন ঘটনা

আজও তো হয়। সাধুর ইচ্ছাশক্তি এখানে পরিপূর্ণতা পেয়েছে ভালবাসায়। আল্লাহ্ রসূলের দয়ায় এমন কাণ্ড ঘটে গেল। কিন্তু সেই সাধু হারিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলে।

আহম্মদ হোসেনের ওখানে সেদিন খুব ভিড় জমেছে। এক ভদ্রলোক এসে চুপচাপ বসলেন। তিনি নমস্কার বা আদাব কিছুই করলেন না। তাই দেখে বয়স্ক এক ভদ্রলোক তাকে তিরস্কার করলেন, আপনি বেশ লোক তো মশাই, এলেন আর বসে পড়লেন! ভদ্রতা করে একটা নমস্কার .তা করতে হয়। একথায় আহম্মদ হোসেন খুশি হলেন না। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, লোক দেখানো নমস্কার করে কি লাভ? উনি ঘর থেকে বেরোনোর সময়ই প্রণাম করে বেরিয়েছেন।

ফকীরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ভদ্রলোক আহম্মদ হোসেনকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। বাড়ির দরজা দিয়ে বেরনোর সময়ই তিনি আহম্মদ হোসেদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করেছিলেন। কোথায় কোন ভক্ত বসে কি ভাবছে তাও তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারতেন। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা তার করতলগত ছিল। মঠ-মন্দিরে কে কি নিবেদন করছেন এটাও তাঁর মনেব চোখে এড়াত না। এমন দেখা গেছে হয়তো কোনো অপরাধী বা খুনী অপরাধ করে বা খুন সম্পন্ন করে কোনো মসজিদ বা মন্দিরে কিছু দেয় ঠিক তখন ফকীর বাবা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে চীৎকার করে বলতেন বাবারে জান গেল। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বমি করতেন সাংঘাতিক ভাবে।

এর কারণ কী? প্রশ্নটা বাড়িয়ে ধরলে বোঝা যাবে পাপী অপরাধীদের হয়ে তিনি প্রায়ই প্রায়শ্চিত্ত করতেন। সবার ঝামেলা নিয়ে বসে থাকতেন গাছতলায়। একেই বলে মানুষকে ভালবাসা।

একবার বিখ্যাত পরিবারের একজন মহিলা মার কঠিন অসুখের মুক্তির উপায় জানবার জন্য একটু বেশি রাত্রি করে ফকীর বাবার কাছে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁকে আদর যত্ন করে বসিয়ে তিনি কিছু বলার আগেই আহম্মদ হোসেন বললেন, আপনি যে কাজের জন্য

এসেছেন তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আপনার মায়ের আয়ু শেষ। তাঁর চলে যাবার হুকুম হয়েছে। এখন আল্লাহ্‌র কাছে জোর খাটান সম্ভব নয়।

তিনি যা হবে বলতেন তা অবশ্যই হত। কোনো ব্যাপারে না বললে কেউ তাঁকে টলাতে পারত না। যদিও ভক্তের মনরক্ষার জন্য অনেক সময় হ্যাঁ করতেন। একবার এক দরিদ্র মুসলমান বৃদ্ধার স্বামীর খুব অসুখ। তিনি ফকীর বাবার কাছে এসেছেন। অসুখের কথা শুনেই বললেন, পঞ্চাশ টাকা দাও, অসুখ ভাল করে দেব। বুড়ির তো কপালে হাত। সে কোথায় পাবে এত টাকা। তাই শুনে বললেন, তবে যাও তোমার বুড়ো বাঁচবে না। বুড়ি মনে খুব দুঃখ পেল। বলল, লোকের কথা শুনে বেশ ভাল লোকের কাছেই এলাম। টাকা চাইল এক কাঁড়ি। আবার বলল, না দিলে বুড়ো মরে যাবে। বুড়ি স্বামীর মৃত্যুভয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। ফকীর বাবা সেই কান্না চোখ পিটপিট করে দেখছেন আর হাসছেন। একটু বাদেই বললেন, ঠিক আছে ঘরে যা, তোকে আর কাঁদতে হবে না। তোর কাছ থেকে তোর স্বামীকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। টাকা তোর নাই থাক। চোখের জল দিয়েই আল্লাহ্‌ রসূলের পুজো হয়ে গেল।

যে ফুটে আহম্মদ হোসেন বসতেন একদিন সেই ফুট ধরে একজন আধুনিক রুচিসম্পন্ন মহিলা যাচ্ছিলেন। তিনি খুব চটকদারী সাজ সেজেছেন। বাবা তার মধ্যে কি দেখলেন কে জানে। বার বার তাঁকে দেখে বলতে লাগলেন, আজ আবার এত সাজলি কেন। তা সেজেছিস বেশ করেছিস। দেখ এবার পুরুষদের মাথায় ঘোল ঢালতে পারিস কিনা! কথাটা বার বার বলছেন আর হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। অর্থাৎ তিনি ওর ভেতরের সব পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন ওর সাজবার উদ্দেশ্য।

এক মেম সাহেব এসেছেন। তিনি বসে আহম্মদ হোসেনকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশ্নটা ইংরাজীতে। শুনে বাবা বললেন, কিছু জানতে চান তো হিন্দী বাংলা বা উর্দু বলুন, মুর্খ

লোকের কাছে ইংরেজী বলে কি লাভ? মেম সাহেব হয়তো তাঁর পোশাক-আসাক দেখে নাক সিঁটকে থাকবেন। মেম সাহেবের এই মনের ঘৃণা তিনি টের পেয়েছিলেন। তাই উল্টে প্রশ্ন করলেন, তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? তোমার পোশাক-আসাক আর চাল-চলনের সঙ্গে আমার পোশাক-আসাক চালচলনের অনেক তফাত। আমি জঞ্জাল নিয়ে কারবার করি, তোমার সঙ্গে আমার প্রেম জমবে কি করে? মেমসাহেবের কেবল কোলে একটা কুকুর। আর সঙ্গে আয়ার কোলে নিজের বাচ্চা। হয়তো বাচ্চার কোনো অসুখ বিসুখের কথা বলতেই মেমসাহেব আহম্মদ হোসেনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সবকিছু লক্ষ্য করে তিনি পুনরায় বললেন, পেয়ার করা খুব শিখেছ মেমসাহেব, ভাবছি এখন তোমার কাছেই পেয়ার কেমন করে করতে হয় আমাকে শিখতে হবে। মেমসাহেব একথা শুনে প্রশ্ন করলেন, আপনি তা বলছেন কেন? আহম্মদ হোসেন বলে উঠলেন, নিজের কোলে কুকুরটাকে রেখেছ, আর অসুস্থ বাচ্চাটাকে দিয়েছ আয়ার কোলে। জান মেমসাহেব, মায়ের ভালবাসার নিশ্বাসে বাচ্চাদের কুড়ি ভাগ অসুখ ভাল হয়ে যায়। মেমসাহেব ওঁর কথা ধরতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন।

দাদাভাই জামীল বসে আছেন। সঙ্গে অন্য দুচারটি ভক্তও। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এল ইয়া লম্বা এক বিদেশিনী। তাকে দেখে মনে হল সে খুবই বিপদে পড়েছে। এসেই সে আহম্মদ হোসেনের পায়ের কাছে ছ-সাতশো টাকার নোট রাখল। তাই দেখে আহম্মদ হোসেন তাঁকে যাতা বলে গালাগাল দিলেন। অনেকে বলত, তাঁর এমন রাগ সচরাচর হত না। গালাগাল দিয়ে সেই নোটের তাড়ায় আগুন লাগালেন। মেয়েটি কিছু বলতে না পেরে ফিরে গেল হতাশ হয়ে। মহিলাটির ওপর অত কেন রেগে উঠলেন তা কেউ বুঝতে পারল না। তবে এটুকু সবাই বুঝল মেয়েটি এমন এক অপরাধ করেছে, যার ক্ষমা নেই।

আহম্মদ হোসেনের এক প্রিয় ভক্তর সঙ্গে তার স্ত্রীর বাড়িতে

প্রায়ই কথা কাটাকাটি হত। ভদ্রলোক নিজের কাজকর্ম ছেড়ে প্রায় সময়ই ওই গাছতলায় কাটিয়ে দিতেন। এর জন্য আহম্মদ হোসেনও তাঁকে বকতেন। বলতেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশির ভাগ সময় এখানে বসে কাটালে তোমার সংসার যে অচল হয়ে যাবে। তুমি একা নও, চার পাঁচ ছেলেপুলের বাপ, তুমি না দেখলে তাদের কে দেখবে? দোকানটা লোকের অভাবে ঠিকমতো চলছে না। যাও, এখানে আর আসবে না, এলেও আমি বসতে দেব না। একদিন এই ভক্তকেই কর্পোরেশনের বকেয়া ট্যাক্সের তাগাদায় পেয়াদা এসেছিল। সে তখন ফকীরের আস্তানায় বসে। সামনেই বাড়ি। আহম্মদ হোসেন দেখতে পেয়ে পেয়াদা ও অফিসারকে বাবু বাড়ি নেই বলে হাঁকিয়ে দিলেন। ওরা চলে গেলে ভদ্রলোককে বললেন, বাপ দাদারা যা দিয়ে গিয়েছেন, তা রক্ষা করতে হয়। বাড়িঘর জমি গরু এসব ভাল করে দেখাশোনা করতে হয়। এগুলোর মর্যাদা আছে। আহম্মদ হোসেন ধমক খেয়ে উপদেশ শুনে এই ভদ্রলোক ভক্ত বলে উঠলেন, আহম্মদ হোসেন বড় জবরদস্ত ফকীর।

আহম্মদ হোসেন সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতে পারতেন বলে তাঁর ভক্তদের ধারণা ছিল। তিনি প্রয়োজনে ভক্তদের মুশকিল আসানের জন্য তাদের বাড়ি চলে যেতেন। যুক্তিবাদী মানুষ ওগুলো স্বীকার করবেন না। এর উত্তর, ঈশ্বরের রাজত্বে কি যে অসম্ভব কি যে সম্ভব তা বলা কঠিন। আহম্মদ হোসেনের ওই গাছতলা যেন একটা শান্তি-ধাম হয়ে উঠেছিল তাপিত মানুষের কাছে।

তাঁর বসার জায়গার কাছেই একটা টিউবওয়েল ছিল। জল নেবার জন্য এখানে ভিড় লেগেই থাকত। এক ভদ্রলোক আহম্মদ হোসেনকে বলছেন, ওদের এখান থেকে জল নিতে দাও কেন? অনেক তো টিউবওয়েল আছে, ওখান থেকে নিলেই পারে। আহম্মদ হোসেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ছিঃ, এমন কথা বলো না, এ রকম বলতে নেই। ওরা জল খেলে আমিও যে তৃপ্তি পাই। এমন একটা কোমল প্রাণ মানুষ আজকের পৃথিবীতে খুব কম দেখা যায়। সাধন

ভজন করে মনকে ঊর্ধ্বগামী করা যায় ঠিকই, কিন্তু আহম্মদ হোসেনের মন স্বভাবজ এরকম ছিল। ঘষেমেজে পরিশীলিত করতে হয় নি। তাই মাঝে মাঝে নিজেই চীৎকার করে বলে উঠতেন, আমি হচ্ছি সাধুর সাধু, ফকীরা ফকীরের ব্যাটা। আমি গুরুর গুরু তবু ভক্ত নিয়ে ফুটপাতে সংসার পেতে বেশ দিন কাটাচ্ছি।

সেই কাশ্মীর বেড়াতে যাওয়া ভদ্রমহিলার কাহিনীটি মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। ডেরা ইসমাইল খাঁর মুসলমান ভদ্রলোক তাঁকে দেখা করবার যে কথা দিয়েছিল তা বলা হয় নি। ওরা বাসা পাল্টে অন্যত্র গেছেন, মহিলার একটি পুত্র হয়েছিল এ পর্যন্ত বলা হয়েছে। এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। পুরনো পরিচয় নাম হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির আড়ালে। এমন সময় সেই ভদ্রমহিলা অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন। বিরাট এক মুসলমান ফকীর, জটাজুটধারী, কালো পোশাক পরিহিত, গলায় নানাবিধ মালা, হাতে বিরাট একটা মশাল নিয়ে মহিলাটিকে ইশারায় কাছে ডাকছেন।

স্বপ্ন ভাঙতে ভদ্রমহিলা ভাবলেন, একি স্বপ্ন দেখলাম! যাই হোক ঈশ্বরের নাম করে স্বপ্নের ঘোর তিনি কাটিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। পরদিন নানা জনের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, এমন ফকীর কেউ দেখেছে নাকি! তাঁর কথা শুনে সবাই অবাক। মুসলমান ফকীর, মাথায় জটা—এ আবার হয় নাকি। তবু তিনি বহু খোঁজ নিলেন। শেষ পর্যন্ত খুঁজে না পেয়ে হতাশ হলেন।

অথচ এই ফকীর যে খুব কাছেই রয়েছে তা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। হঠাৎ পরিচয় করিয়ে দেবার মাধ্যম পাওয়া গেল। আহম্মদ হোসেনের আস্তানার কাছেই ওঁদের এক আত্মীয় থাকতেন। কথায় কথায় তিনি একদিন বললেন, আমাদের ওখানে এক ফকীর বাবা আছেন, তিনি ভারী অদ্ভুত মানুষ। বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। মুখ দিয়ে যা বলেন তাই হয়। ওঁর কাছে বসে আমি রাতের পর রাত কাটাই। বসলে সহজে উঠতে দেন না। একটা দিনের গল্প শোনাই আপনাকে।

ভদ্রলোক তার অভিজ্ঞতায় কথা শোনাতে লাগলেন। আমরা কয়েকজন বসে আছি, গল্পগুজব হচ্ছে। ফকীর মিষ্টি খাওয়ালেন। মাঝে মাঝে সাইকেলে করে আমি যেতাম। আহম্মদ হোসেন আমাকে বলতেন সাইকেলের দিকে নজর রেখো, এখানে বহু ধরনের লোক আসে। সাইকেলের দিকে নজর দিয়ে বসতাম। সেদিন পায়ে হেঁটেই গেছি। কথায় কথায় যখন উঠলাম তখন রাত দুটো। তাই দেখে বললাম, কি করে ফিরব, দেখি ট্যাক্সি পাওয়া যায় কিনা। নাহলে হেঁটেই যেতে হবে। আহম্মদ হোসেন বললেন, রওনা দাও, আল্লাহ্ একটা ব্যবস্থা করবেনই।

রওনা দিয়ে কড়েয়ার মোড়ে এলাম। ট্যাক্সির জন্য দাঁড়ালাম এমন সময় একটা বড় গাড়ি এসে আমার সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াল গাড়ির মালিক উপযাচক হয়ে প্রশ্ন করলেন, কোন দিকে যাবেন? উত্তর দিলাম বালিগঞ্জ। তিনি বললেন, উঠুন উঠুন, আমিও ঐদিকেই থাকি। গাড়িতে উঠে ভাবলাম, ফকীর বাবা ঠিকই বলেছেন, ভগবান ব্যবস্থা করে দিলেন। ভগবানের আশীর্বাদ বা অভিশাপ মানুষের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে থাকে।

মহিলাটি ফকীর বাবার গল্প শুনে প্রশ্ন করলেন, ফকীরের মাথায় কি জটা আছে? উনি কি কাল কাপড় পরেন? চোখ দুটো খুব টানাটানা, গলায় অনেক পাথরের মালাটালা আছে কি?

হ্যাঁ, ভদ্রলোক অবাক হলেন। আপনি ঠিক বলেছেন, কিন্তু জানলেন কি করে? ওখানে কোনোদিন গিয়েছিলেন কি কারো সঙ্গে?

না, আমি কোনোদিন যাই নি। মহিলাটি উত্তর দিলেন, অনেক-দিন আগে স্বপ্নে দেখেছিলাম ওই চেহারা, আপনার সঙ্গে ওই ফকীরের কাছে অবশ্যই আমি যাব। চলুন যাই, এক্ষুনি যাব।

এত রাত্রে! ওখানে চোর সাধু জোচ্চোর সব রকম লোকই তো অহরহ যায়। তাছাড়া খোলা রাস্তা, সেখানে আপনি বসবেন কোথায়? ভদ্রলোক তাঁকে বাধা দিলেন।

ভদ্রমহিলা ওঁর কথা মানতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, আপনি এতসব বাছবিচার করছেন কেন? মহাপুরুষের কাছে যাব এর আবার এত রকম চিন্তা কিসের? উঠুন আর দেরি করব না। এর পর হলে আরো রাত হয়ে যাবে। ভদ্রমহিলা জোর করে তক্ষুনি তাঁর সঙ্গে রওনা দিলেন। তখন ঘড়িতে রাত দশটা।

রাস্তায় বেরিয়ে ওরা ধূপকাঠি মোমবাতি কিনলেন। ফকীর আহম্মদ হোসেন ধূপকাঠি আর মোমবাতি খুব ভালবাসতেন। দূর থেকে অনেক লোকের ভিড় দেখা গেল। ধীরে ধীরে দুজনে গিয়ে দাঁড়ালেন নিরহঙ্কারী আধপাগলা সেই সাধকের সামনে। অনড় পাষাণের মতো তিনি বসে আছেন। মিনিট তিনেক অপেক্ষা করে সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন, বাবা আমার ভাবী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বার তিন চার এই একই কথা বললেন।

মিনিট ছয় সাত বাদে আহম্মদ হোসেন তাকালেন। চোখ দুটো লাল। মনে হচ্ছে অদ্ভুত এক জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই চোখ থেকে। দু তিনবার দেখবার পর আহম্মদ হোসেন ভদ্রমহিলাকে বললেন, বসুন এখানে। তাঁর নির্দেশিত জায়গায় ভদ্রমহিলা বসলেন একটা খবরের কাগজের ওপর। আসবার সময় ওঁরা সঙ্গে করে কাগজ নিয়ে এসেছিলেন।

মহিলাটি বসতেই অনুভব করলেন যেন তার শরীর শূন্য হয়ে গেছে। কি রকম ভারহীন। সারা অঙ্গে একটুও জোর নেই। তাঁর চোখদুটো যেন ফকীরের চোখের সঙ্গে গেঁথে গেছে। চোখ ফেরাতে তিনি পারছেন না। একটু পরে ফকীর আবার নির্দেশ দিলেন। একটা কাঠের বাক্স দেখিয়ে ঘুরে তিনি ভদ্রমহিলাকে তার ওপর বসতে বললেন। ভদ্রমহিলা তখন দম দেওয়া পুতুল যেন। তিনি আহম্মদ হোসেনের কথামতো কাজ করলেন। আহম্মদ হোসেন এবার একজনকে ডেকে বললেন, এই ধোবী, তোমার মাথার পাগড়িটা দাও তো। দ্বিরুক্তি না করে বাক্সের কাছে দাঁড়ানো ধোবী তার পাগড়িটা বাক্সের ওপর পেতে দিল। ফকীর বাবা এবার গম্ভীর গলায় বললেন, এবার

আপনি বসুন। তিনি বসতেই আহম্মদ হোসেন একটা খবরের কাগজ দলা পাকিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতির ওপর ধরতেই সেটা মশালের মতো জ্বলে উঠল। ভদ্রমহিলার তাই দেখে মনে হল কোনো জ্যোতির্ময় পুরুষ আগুন হাতে নিয়ে মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হলেন। তাঁর মাথার জটাগুলো মুখের দুপাশে ছড়ানো। যেন কৌপীনের মত কিছু একটা পরা রয়েছে। মহিলাটির সর্বঅঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভূতি আর এক স্বর্গীয় আনন্দ খেলে গেল। অদ্ভুত শিহরণ। তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ফকীর বাবার সেই অলৌকিক রূপের দিকে। অনেকক্ষণ চাহনি বিনিময়ের পর ফকীর বাবা বললেন, যখন মজা পেয়েই গেছ, একে ছেড় না। একটু বাদেই চাঁদা তুলে তাই দিয়ে চা আর কয়েকটা ভাঁড় কিনিয়ে আনলেন। ভদ্রমহিলাকে এক ভাঁড় চা পানের জন্য এগিয়ে দিলেন। একে চার রাস্তার মোড়, তার ওপর এতগুলো পুরুষের দৃষ্টি—এদের সামনে বসে চা খেতে গেরস্থ মেয়েরা অভ্যস্ত নন। তাই তাড়াতাড়ি চায়ের ভাঁড় শেষ করে ভদ্রমহিলা খালি ভাঁড়টি সাবধানে ফেলে দিলেন বেশ একটু দূরে। এবার ফকীর বাবা তাকালেন তার দিকে। সেই দৃষ্টিতে শাসনের ইঙ্গিত প্রসারিত। অর্থাৎ ওই ভাবে চা খাওয়াটা বেমানান। অভদ্রতা। ভদ্রমহিলা এই শাসন বুঝতে পেরে মুখ কাঁচুমাচু করলেন। যেন তিনি ক্ষমা চাইছেন। আরো এক ভাঁড় চা তাকে গলাধঃকরণ করতে হল শাস্তিস্বরূপ।

চা খেতে খেতে তিনি আহম্মদ হোসেনকে দেখছেন। তিনি যেন ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদল করছেন। এই দেখছেন কী সুন্দর দিব্যকান্তি পুরুষ—পরমুহূর্তে কাল কঙ্কালসার জরাজীর্ণ চেহারা। খুনখুনে বুড়ো। এ কোনো মায়া নয় তো? ভোজবাজি! ভদ্রমহিলা ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে চিন্তার স্রোত। তিনি শুনেছেন যাঁরা ভূতপ্রেত পিশাচ-সিদ্ধ তাঁরা নাকি বহুরকম খেলা খেলতে পারেন। ইনি কি তাঁদেরই গোত্রীয় কেউ! যেই মুহূর্তে মহিলাটি এই কথাটা ভেবেছেন সঙ্গে সঙ্গে আহম্মদ হোসেন বাবা গো গেলাম গো বলে ককিয়ে উঠলেন। ভক্তরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সবাই কি হল বাবা, কি হয়েছে

বলে তাঁর কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তিনি বললেন, বেটা ভীষণ ব্যথা শিগগিরই আমার বুকটায় জল দাও। একটি ভক্ত তাড়াতাড়ি ওর বুকে পিঠে হাত বোলাতে লাগল।

মহিলাটির মনে অশান্তির হাওয়া বয়ে গেল। একটা অপরাধবোধ—হয়তো আমি আসাতেই এমন কাণ্ড ঘটল। মনে মনে লজ্জা পেয়ে তিনি ক্ষমা চাইলেন। সংসারী মানুষ সব সময় অন্যায় করছি—না বুঝে না চিনে হয়তো তোমাকে আঘাত দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করো।

একটু বাদেই তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। ভাব করলেন যেন তাঁর কিছুই হয় নি। মনের মধ্যে বোধহয় কোথাও সামান্য অভিমান কাজ করছিল। চুপচাপ বসে রইলেন। সবাই চুপ। রাতের কলকাতার শব্দ কানে আসছে। ভদ্রমহিলা এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ম্রিয়মাণ। তিনি ভাবছেন এই আসাটা কি ভাল হয়েছে! হঠাৎ আহম্মদ হোসেন ভদ্রমহিলার খুলে রাখা একপাটি চটি হাতে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। দেখতে লাগলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। খেয়াল হতেই শব্দ করে ভদ্রমহিলা আপত্তি জানালেন। তাঁর মন যেন বলে উঠল, জুতোয় হাত দিয়ে আমার পাপ বাড়াচ্ছেন কেন? এই কথা বুঝে ফেললেন ফকীর, তিনি হেসে বললেন, তাতে কি হয়েছে? ভদ্রমহিলা বললেন, না না, জুতোয় হাত দেবেন না। কি বিশ্রী ব্যাপার। ফকীর বাবা আরো বেশি করে জুতোটায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আহা তাতে কি হয়েছে? কথার সঙ্গে সঙ্গে চোখ পিটপিট করে ভদ্রমহিলাকে কিছু বোঝাতে চাইলেন।

রাত এগারোটা প্রায়। রাস্তা ফাঁকা হয়ে এসেছে। তখন কি খেয়াল হল আহম্মদ হোসেন ডালপুরী মুগের বরফি একগাদা খাবার আনালেন। খেতে দিলেন ভদ্রমহিলাকে। ভদ্রমহিলা আপত্তি করলেন, এত খাবার কি করে খাব? খাও বলছি, সব খাও। এতক্ষণে কথার মধ্যে নিকটত্ব নেমে এল। আপনির দূরত্ব নেই।

পেট ফেটে যাবে, হেসে বললেন ভদ্রমহিলা। তাছাড়া আমায় সব দিয়ে দিলে তুমি খাবে কি? তুমি তো কিছুই খেলে না। এই

খাচ্ছি। বলে একটা ডালপুরী নিয়ে সবাইকে টুকরো করে দিয়ে এক টুকরো মুখে দিলেন। একটু বাদেই ভদ্রমহিলার সঙ্গী বললেন, বাবা, এবার আমরা উঠি, রাত অনেক হল। বৌদিকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি ফিরব।

ওঁরা উঠে পড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় কড়েয়ার মোড় পর্যন্ত গিয়েছেন দুজনে। এমন সময় কে যেন পেছন থেকে ডাকল, বাবু। ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। পেছন ফিরে দেখে বললেন, ফকীর বাবা ডাকছেন। ওঁরা দুজনে আবার আহম্মদ হোসেনের দিকেই ফিরে এলেন। ভদ্রমহিলা যেন চোখের সামনে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলেন। এ যেন ভোজবাজি। সামনের লাইট পোস্টের কাছে বল্কলের মতো কিছু একটা পরে দীর্ঘকায় এক পুরুষ! ইনিই কি সেই ফকীর!

তপঃক্লিষ্ট বনবাসীর মতো চেহারা। জটাজূটধারী। জ্যোতির্ময় রূপ। সূর্যবংশ উজ্জ্বলকারী রাম। ভদ্রমহিলার মনে বিস্ময় আর প্রশ্নের ঢেউ। কিন্তু কথা বলবার উপায় নেই। জিব আড়ষ্ট হয়ে গেছে ঘটনার অলৌকিকতায়। কাছে যেতেই ভদ্রমহিলার হাতের মুঠি নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে কি যেন দিলেন তিনি। মুখে বললেন, নাও নাও। যত্ন করে রেখে দিও। দম দেওয়া কলের মানুষের মতো ঘাড় নাড়িয়ে ভদ্রমহিলা সম্মতি জানালেন। কিন্তু বিমূঢ় হয়ে প্রণাম বা শ্রদ্ধা জানাতে ভুলে গেলেন। বিহ্বল দৃষ্টি, ঘোর কাটতে চাইছে না। কাকে দেখছি? নীরব প্রশ্ন গলা পর্যন্ত উঠে এসে আটকে যাচ্ছে। সাহসে কুলোচ্ছে না মুখে কিছু বলবার।

ফকীরের দিকেই তিনি তাকিয়ে আছেন। তিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে যেন তাঁকে বোঝাতে চাইছেন মানুষের জীবনের বহু ইতিহাস। তবু নিজেকে সংহৃত করে রেখেছেন, মুখে কিছু বলছেন না। এখন যাই, শুধু এইটুকু ভদ্রমহিলা বললেন। এস। ফকীর অনুমতি দিলেন যাবার। ওরা দুজন আবার ফিরে চললেন। মুঠি খুলে দেখলেন, চার আনা পয়সা। মাথায় ছুঁইয়ে রুমালে বেঁধে বুকের মধ্যে রেখে

দিলেন। হাঁটতে হাঁটতে সামান্য এগোতেই আবার ডাক এল, বাবু। এবার গলা গম্ভীর। আবার ওরা ফিরে এলেন।

এবার কাছে গিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, বাবা, তুমি তো মনের কথা বুঝতে পার। হঠাৎ কি ভেবে কথাটা জানালেন। সব বুঝি। তোমাকে মুখ কিছু বলতে হবে না। যে খবরের কাগজটার ওপর ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, সেটা ভাঁজ করে ওর হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও।

কাগজ দিয়ে কি করব? আড়ষ্টতা কেটে গেছে। হেসে ভদ্রমহিলা বললেন। এটাও যত্ন করে রেখে দেবে। আহম্মদ হোসেন উত্তর দিলেন। এবার ফকীরের পা ছুঁয়ে ভদ্রমহিলা প্রণাম করলেন। আগের মতোই ওঁর হাতের মুঠি চেপে আহম্মদ হোসেন বললেন, ঠিক আছে। এবার ওরা ফিরে গেল। যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় ফকীর বাবা তাকিয়ে রইলেন। ওই ঘটনার কিছুদিন পর পূর্ব নির্দিষ্ট দিন অনুযায়ী ভদ্রমহিলা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে রওনা দেবেন।

ডিসেম্বর মাস। তীব্র শীত। হঠাৎ সেই রাতে বৃষ্টি নামল। লেপ আর কম্বলের মধ্যেও ভদ্রমহিলা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন ম্যালেরিয়া রোগীর মতো। মনে হল অন্য কারো শীত যেন তাঁর শরীরে ভর করেছে। হঠাৎ ঘুরনি গাছতলায় আহম্মদ হোসেনের কথা মনে হল। আহা! বহুদিনের চেনা কেও! এই বৃষ্টিতে আর প্রচণ্ড শীতে ফকীর বাবা ওখানেই বসে আছেন। এক পাও নড়বেন না, নিজের ডেরা ছেড়ে। হয়তো তাঁর শীতের অনুভব আমাকে চেপে ধরেছে। মনে পড়তেই ভাবলেন, যাই ওয়াটার প্রুফটা গায়ে দিয়ে দেখে আসি তিনি কি করছেন। অন্য মন বাধা দিয়ে বলল, ছিঃ, এই অসঙ্গত আচরণ করলে মানুষ কি বলবে? ঝমঝমে বৃষ্টি। রাত গভীর। এমন সময়ে যাওয়া। নিজেকেই শাসন করলেন তিনি, না যাব না। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তার কথা শুনে ফকীর হাসছেন আর বলছেন, কি এখানে আসতে পারলে না তো? এবার ভদ্রমহিলার বোধ হল তিনি ফকীরের সামনে বসে তাঁর সঙ্গেই কথা বলছেন। ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমার কথা বোঝা দায়। একবার বলছ এস; আবার বলছ এস না। খুলেই

বল না আমি কি করব ? উঠব উঠব করে এবার বিছানা ছেড়ে উঠেই পড়লেন। স্থির নিশ্চয় করে নিজেকে বললেন, আমি যাবই। যত রাত, যত বর্ষা হোক। সঙ্গে সঙ্গে কার যেন নিষেধ বাণী ঝরে পড়ল। না না, তুমি এখন আসবে না, এই অবস্থায় একা একা এলে আমি রেগে যাব। যাও লেপের নীচে ঢুকে পড়। আমি শুধু শীত হয়ে তোমায় ছুঁয়ে গেলাম। মনে পড়ে গেল সেই মুসলমান সহযাত্রীকে। যে বলেছিল নিশ্চয়ই দেখা হবে। কিন্তু তুমি আমায় চিনবে না।

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা ভেঙে গেল। অবাক হয়ে ভদ্রমহিলা দেখলেন, তাঁর প্রবল কান্নায় বালিশ ভিজে একাকার। কে কাঁদল এত কান্না ! নিজেকে শুধোলেন, আমি না আর কোনো জন। সে রাত্রির মতো তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। যাবার দুদিন আগে একদিন বসে বসে ভাবছিলেন, একবার ঘুরনিতলায় গেলেই হত। কিন্তু সেই আত্মীয় ভদ্রলোকটি একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন হঠাৎ যেন একা একা ওখানে চলে যাবেন না। ওখানে নানা ধরনের লোকের আনাগোনা।

দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। আত্মীয় ভদ্রলোকটি এসে পড়লেন। রাত নটার পর দুজনে আহম্মদ হোসেনের ডেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। ভদ্রমহিলা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ফকীর বাবা বললেন, বসুন দিদিমা। ভদ্রমহিলা ভাবলেন, এ আবার কি ধরনের সম্বন্ধ। মুখে তিনি বললেন, আমি কারো দিদিমা নই। তারপর একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে বসলেন। মেছুয়া থেকে আসা একটি মুসলমান যুবককে যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিয়ে ভাগিয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলা এবার সাহসে ভর করে বললেন, দেখ, জপে আমার মন বসে না, বাইরের কথা কানে আসে। আমায় এমন করে দাও যাতে ভগবান ছাড়া আর যেন কিছু বোধ থাকে না। চট করে ঘুরে বসলেন ফকীর। ভদ্রমহিলার আসনের সঙ্গে ইঞ্চিখানেক ব্যবধান।

বললেন, হরিণের আসন বোঝ, হরিণের আসন ? হ্যাঁ, বুঝি। সেই হরিণের আসনে বসবে। কথা শেষ করেই মহিলার মাথায় হাত

বুলিয়ে প্রকাশ্যে তিনটি নিশ্বাস টেনে একটু হাসলেন। কালো কুচকুচে অঙ্গারের মতো রঙ। আদর ক'রে চিবুকে হাত দিয়ে তার সমস্ত হাতটা মুখে বুলিয়ে দিয়ে ঘুরে বসলেন। বললেন, আমায় এমন একটা কিছু দাও যার দাম দেওয়া যায় না। এমন এক জায়গা দাও যেখানে বসে ভগবানের নাম করা যায়।

ভদ্রমহিলা ফাঁপরে পড়লেন ; বললেন, এতসব বুঝিনা সোজা বলো তুমি কি চাও।

তোমার সাথে মুখেই যদি কথা বলব তবে মনের মজা মিলবে কি করে। তাই বুঝি ? মহিলা আবার হাসলেন। হ্যাঁ, উত্তর দিলেন ফকীর বাবা। হঠাৎ আহম্মদ হোসেনের শরীরের তন্ত্রীতে একটা নতুন চেতনা জেগে উঠল। তিনি বললেন, আমাকে দড়ি দিয়ে কি কেউ বাঁধতে পারে ? পারে না ? প্রশ্ন করলেন ফকীর বাবা। যায় তবে সে অন্য দড়ি। তুমি পারবে আমাকে বেঁধে রাখতে ? পারব। মহিলা এখন সাহস পেয়ে গেছে। তাঁর উত্তর নিশ্চিত। অনেকদিন আগে স্বপ্নে তোমায় দেখেছি। কত ডেকেছি। এতদিন বাদে দেখা পেলাম। স্বপ্নে কি দেখেছ ? দেখেছি বিরাট মশাল নিয়ে তুমি আমায় ডাকছ। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আমি তোমার অনুগামিনী হয়েছি। স্বপ্নের শেষটুকু আমি বলব না। ওটুকু বলতে হবে। ভদ্রমহিলার ফকীরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছে।

আহম্মদ হোসেন মুখভর্তি হাসলেন। যেন তিনি এটাই আশা করেছিলেন। কেউ তাঁকে পরীক্ষা করুক এতে তিনি ভারী খুশি হতেন। ফকীর বাবা অনায়াসে তার স্বপ্নশেষ বলতে শুরু করলেন। ভদ্রমহিলা ওকে বাধা দিলেন, বুঝেছি বুঝেছি আর বলতে হবে না। এবার তিনি প্রশ্ন করলেন, হরিণের আসনে বসে জপ করতে বললে ? কি নাম জপ করি বলো তো ? এখানেও পুনরায় পরীক্ষা। আবার হাসলেন আহম্মদ হোসেন। কি নাম জপ করবে তাও বলতে হবে ?

হরিণের আসন আহম্মদ হোসেনের আশীর্বাদ। তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ হল। দেহ হারাবার দিন সাতেক আগে থেকেই শুয়ে থাকতেন।

খাট থেকে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে জপ করতেন। আর আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত দুটো তুলে উঁচু করতেন। তখন হাতের ভেতর দিয়ে ঠিকরে আলো বের হত। দেহরক্ষায় কিছুদিন আগে গলা ভেঙে গেল। একজন ভক্ত বলছেন, সেদিন রাস্তা দিয়ে বিরাট এক বরযাত্রীর শোভাযাত্রা যাচ্ছে। নববিবাহিত দম্পতিকে দেখে কি মনে হওয়ায় উঠে হাঁটুগেড়ে সুন্দর করে আজান দিলেন। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে বেরিয়ে এল অশ্রু। বললেন, বেটা কাল সন্ধ্যায় এর চেয়েও বড় শোভাযাত্রা বার করতে হবে।

ফকীরের এই কথার ইঙ্গিত কেউ বুঝতে পারে নি। এঁদের কথা সাধারণের বোঝাই মুশকিল। কদিন আগেই অন্য এক ফকীর বাবার কাছে এসেছিল। দুজনে এমনি ভাবে কাথাবার্তা হল, মানে কেউ বুঝল না। সেই ফকীর চলে গেলেন। পর দিন বাইশ বছর বাদে নিয়মভঙ্গ করে বাথটবে স্নান করলেন। শরীর থেকে শুধু হলুদ গোলা জল বেরল। স্নান করতে করতে এক ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করলেন, মা আমি শুদ্ধ হলাম তো? এরপর আরশিতে মুখ দেখলেন। ফকীর বাবার কথার মানে ধরতে গেলে তাঁর সাধনার আকরটি ধরতে হবে। যে ফকীরটি এসেছিলেন, তার সঙ্গে কথা বলার ধরন দেখে মনে হয়েছিল, তিনি কোথাও যাবেন। কিন্তু আসলে তা নয়, সকলের সামনে তৃতীয় ব্যক্তির মুখ দিয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, মঙ্গলবার দেহরক্ষা করবেন। কিন্তু অন্ধ অসৎ ভক্তরা এর অর্থ বুঝতে পারে নি।

মৃত্যুর দিন-ক্ষণ তারিখ তিনিই বলতে পারেন যিনি পরমপুরুষ। সাধারণ যোগী বা ত্যাগীরাও এই শেষ দিনটির খোঁজ জানেন না। যাবার আগের দিন সেবক ভক্তকে ডেকে বললেন, যাও বেটা, ফকীরের জন্য সমস্ত রকম জিনিস কিনে নিয়ে এস। সব জিনিস আনা হলে চাটাইয়ে আঙুল দিয়ে কিসব আঁকিবুকি কাটলেন গায়ে মাখা সাবান দিয়ে লুঙ্গি কাচলেন, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না তবু আলাপ আলোচনার বিরাম নেই।

গভীর রাত্রে বুকে ঘড়ঘড় শব্দ উঠল। দু-তিনজন ভক্ত তাঁকে

ঘিরে রয়েছে। এক ভক্ত অন্যজনকে বলল, আমার কিন্তু এই লক্ষণ ভাল লাগছে না। আপনি একটু দেখুন, আমি এক দৌড়ে মাকে ডেকে আনি। অপর ভক্ত তার কথার গুরুত্ব দিলে না। একটু বেশি রাতে সবাই চলে গেল। মাত্র দুজন রইল। একজন বুড়ো মানুষ অপরজন ছোকরা। ফকীর আহম্মদ হোসেন সেই অল্পবয়সী ভক্তকে ডেকে বললেন, আরে বেটা, তুমি এখনো শোও নি। তিনি তাকে জোর করে শুইয়ে দিলেন।

ছেলেটির চোখে ঘুম নেই। আবার বুকের মধ্যে সেই শব্দ। সে ভাবল হয়তো ফকীরের তেষ্টা পেয়েছে। খিদে তেষ্টার বোধ নেই বাবার। তাড়াতাড়ি সে কমলালেবুর রস করে আস্তে আস্তে সব রসটুকু খাইয়ে দিল। আহম্মদ হোসেনের চোখ দিয়ে তখন জল ঝরছে অজস্র ধারায়। ছেলেটি পর পর রাত জেগে ওঁর সেবা করছে। ভোরের দিকে ঝিরঝিরে হাওয়া পেতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল বাবার খাটের পাশে। ঘুমে অচেতন হয়ে রইল।

খুব ভোরে একটি ছেলে কল থেকে জল নিতে এসেছিল। হঠাৎ ওইদিকে তাকিয়ে তার কেমন মনে হল। সে সেই ছোকরাটিকে জাগিয়ে বলল, উঠে শিগগির দেখ, কি হয়েছে। কি হয়েছে কাউকে বলতে হল না। আহম্মদ হোসেন বহু আগেই দেহ খাঁচার বন্দীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। তাঁর সেই সাধনক্লিষ্ট শরীরটা পড়ে আছে।

প্রচুর ভিড় দেখতে দেখতে ভেঙে পড়ল। রাস্তার ভগবান সবাইকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন। বাবার দেহ তখন গোবরায় প্রথিত করা হল। মৃত্যুর সপ্তাহ দুয়েক আগে নিজেই তিনি গোবরায় গিয়ে সেখানে দু.টা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

কলকাতার বুক থেকে এক সাধু আশ্চর্যজনকভাবে উধাও হলেন। যাঁর কাছে ধর্মাধর্ম ছিল না। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন শুধু মানবসেবা। সারা জীবন নিজেকে আড়াল করে সাধারণ মানুষের মতো কাটিয়েছিলেন এই আহম্মদ হোসেন।